প্রথম প্রকাশ ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

মুদ্রক ঃ
গীতা প্রিন্টার্স
২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীজহর ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদের ছবি শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

নিবেদন

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে শচীন্দ্রনাথের অবদান এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। তিনি ছিলেন একাধারে স্বদেশী বিপ্লবী সাংবাদিক ও নাট্যকার। সারা জীবনে লিখেছেন প্রচুর। বিবিধ বিষয়ে তাঁর মৌলিক ভাবনা ও জীবন-দর্শন প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে নাট্যবিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে আশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

দুঃখের বিষয় নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বর্তমান দিনের কোন কোন সমালোচক বিস্ময়করভাবে উদাসীন। তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় দেখি বিশদ অবহিত না হয়েই যখন কেউ শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। 'গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়' গ্রন্থে অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী লিখেছেন যে গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শিশিরকুমার ছাড়া 'ওই সময়কার অন্য নাট্য-কারেরা (ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র, অয়স্কান্ত বক্সী, শচীন সেনগুপ্ত, রবীন মৈত্র প্রমুখ) ভাবজগতের এই পরিবর্তনকে ধরতে পারেননি বা পারলেও সঙ্গোপনে তা থেকে সরে গিয়ে গতানুগতিক নাট্যধারায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।...'

অধ্যাপক চৌধুরীর এই মন্তব্য বিশেষভাবে শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুরন্ত নয়। কারণ, গণনাট্যসৃষ্টির আগেই তিনি শ্রমিক কৃষক ও ব্রাত্য—শোষিত শ্রেণীকে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু করেছেন। এছাড়া, পেশাদারী মঞ্চের সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় নাট্যকার হয়েও সেই সময় (১৯৪৪-৪৫) গণনাট্য সংঘের পক্ষাবলম্বন করে তিনি কলম ধরেছিলেন বলে অনেকের বিরুদ্ধ-সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যদিও এতে তাঁর মত প্রকাশের দৃঢ়তা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। কল্লোল-যুগে কল্লোল-সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়েও ঠিক এমনি দৃঢ়তা তিনি দেখিয়ে-ছিলেন, সে কথা জানা যায়। সুতরাং 'ভাবজগতের পরিবর্তন' ধরার দূরদৃষ্টির অভাব তাঁর কোনদিনই হয়নি, বরং তার চেয়ে বেশি কিছু তাঁর প্রতিভায় ছিল একথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রগতিশীলতা ও কাপুরুষতা তাঁর

জীবনে পাশাপাশি ছিল না। তিনি নিজে যা বিশ্বাস করেছেন তা রেখে ঢেকে বলেননি। 'সংগোপনে' কিছু করার অভ্যাসও তাই তাঁর ছিল না।

তিনি নিজেকে কখনও কম্যুনিস্ট বলেন নি, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যও ছিলেন না, কিন্তু কম্যুনিস্ট মতাদর্শের বড় কাছাকাছি ছিলেন। ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগেই তাঁকে দেখা গিয়েছে কম্যুনিস্টদের পক্ষে কলম ধরতে। উপান্ত্য জীবনে তিনি পরিপূর্ণ মানবতাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য কোন ছলচাতুরি বা কৌশলের আশ্রয় নেননি।

এমনি স্বাধীন অনপেক্ষ ও দৃঢ়চিত্তের মানুষ বলেই তিনি অনায়াসে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় অধিবেশনের (১৯৫২) জন্য লিখিত এক সুদীর্ঘ নিবন্ধে গণনাট্যসংঘের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। জানিনা সেকারণেই কিনা, দেশের প্রগতিশীল শিবির শচীন্দ্রনাথকে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভুলে গেলেন! তাহলে ত বলতে হয় আমাদের প্রগতিশীলতা কোন বস্তুধর্মী সচেতনতার পথে চলছে না। কেননা ইতিহাসকে অস্বীকার করলেও ইতিহাস স্বমহিমায় বিরাজ করে, তার কষ্টিপাথরে যথার্থ মূল্যায়ন নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে যে ব্যক্তি অতি বাল্যকালেই রাজপথে নেমেছিলেন, যাঁর সারাজীবন কেটেছে প্রগতিশীল আন্দোলনের শরিক হয়ে দারিদ্র্য ও সংগ্রামের মধ্যে; তিনি এককথায় একালের কোন কোন সমালোচকের কলমে নাকচ হয়ে গেলেন, কুত্রাপি নামোল্লেখ পর্যন্ত হয়না এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।

১৯৫৪ সালে সারা কলকাতায় ৪টি রংগমঞ্চ ছিল। সেই সময় শচীন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা নাট্য-আন্দোলন ও নাট্যশালার প্রসার ও উন্নতিবিধানের জন্য তৎকালীন রাজ্য সরকারের কাছে যুগান্তকারী যে দাবি তাঁর 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখে গেছেন তা-থেকে তাঁকে বুঝতে পারার কোন অসুবিধে হবার কথা নয়!

বর্তমান গ্রন্থে তাঁর নাটকের মূল্যায়নেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শচীন্দ্রনাথের মোট নাটকের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। অনেক নাটকই আজ আর পাওয়া যায় না। কোন গ্রন্থাগারে এমনকি জাতীয় গ্রন্থাগারেও তাঁর সব নাটক পাওয়া যায়নি। ফলে কিছু নাটক বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা থেকে বাদ গেছে। তবে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব নাটকই এতে স্থান পেয়েছে। নাটকের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রগুলিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, নাটকের আঙ্গিক মঞ্চরূপ

এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয়রীতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর জীবনী ও ব্যক্তিত্বও এর অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ে তৎসময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সাহায্য নিয়েছি। গবেষণাপত্রের বিষয়কে আরো একটু সম্প্রসারিত করে শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সকল দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। জানিনা কতটা সফল হতে পেরেছি।

পত্রপত্রিকা ছাড়া শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ও বিভিন্ন নাট্যসমালোচকের লেখা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সেইসঙ্গে সহায়ক অন্যান্য গ্রন্থও আছে। গ্রন্থ সূচিতে তা উল্লিখিত হয়েছে। শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জীবিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। যদিও নির্বিচারে তাঁদের বক্তব্য গ্রহণ করিনি যতক্ষণ তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত তথ্য অনুসন্ধান করে মেলাতে না পেরেছি।

পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের (অবসরপ্রাপ্ত) প্রধান ডঃ অজিতকুমার ঘোষের অধীনে বর্তমান বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করি। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া এ কাজ সমাধা হত না। তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে এর মর্যাদাকে বহুগুণ বর্ধিত করেছেন, তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী সুধী প্রধান, 'স্বদেশ' সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, নাট্যকার ও পরিচালক শ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, 'রূপমঞ্চ' সম্পাদক প্রয়াত কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শচীন্দ্রনাথ-সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন সময়ে এঁদের প্রেরণাকে আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। বন্ধু ড. অজয়েন্দ্রনাথ সরকার রাজ্য সরকারের লেখ্যাগার থেকে সংগৃহীত শচীন্দ্রনাথের নিষিদ্ধ রাজনৈতিক নাটক নরদেবতা সম্পর্কে তৎকালীন বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশের প্রতিক্রিয়া এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক কিছু তথ্য আমাকে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি অনুগৃহীত। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অনিতা মুখোপাধ্যায় (সাংবাদিক ও 'রূপমঞ্চ' সম্পাদক প্রয়াত কালীশ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী) একসময় আমার এই গবেষণা কাজে নিঃস্বার্থ সহযোগিতা করেছেন, এই অবসরে তাঁকেও আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশে আংশিক অনুদানের (৩১০০৲) জন্য। আর এ ব্যাপারে যাঁর আগ্রহ ছিল আন্তরিক সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রী নেপাল মজুমদার মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই বিশিষ্ট লোকবিদ শ্রী দিব্যজ্যোতি

মজুমদারকে যিনি আমার মত অনেক তরুণ লেখকের বন্ধু ও উৎসাহদাতা। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য। সাময়িক বিপদে বন্ধু ড. নরেশচন্দ্র খানের সাহায্যও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

প্রায় এক বছর ধরে গ্রন্থ প্রকাশের কাজ চলেছে। অর্থসংকটই এর কারণ। রচনায় নানা ত্রুটি রয়ে গেছে, শুদ্ধিপত্র দিয়ে গ্রন্থের দৈন্যকে আরও প্রকট করতে ইচ্ছে হল না। অনিবিষ্ট চিত্ত ও সময়াভাবের দরুন গ্রন্থটি হয়ত সুচারু হয়ে ওঠেনি। তবু আশা, সংস্কৃতিবান চিন্তাশীল পাঠকের কাছে বিপ্লবী সাংবাদিক ও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কে এই গ্রন্থ যদি কিছু-মাত্র আগ্রহ সৃষ্টি করে তবেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বিনীত

অজিত মন্ডল

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫
'দেবনাথ স্মৃতি ভবন'
১৩/১০, আরিফ রোড
কলিকাতা-৭০০০৬৭

মা-কে

কিশোর বয়সে যাঁর অনেক বই লুকিয়ে পড়েছি
যাঁর দেখাদেখি বইকে ভালবেসেছি

সূচি

প্রফেসর অজিতকুমার ঘোষ

এম. এ, পি. এইচ. ডি, ডি. লিট

ভূমিকা

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং নাট্য সংগঠনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। আমরা তাঁর নাটক নিয়ে গোড়ায় সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক নাট্যকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান অজিত মন্ডল যখন আমার কাছে গবেষণার উদ্দেশ্যে এসেছিল, তখন আমি তাঁকে শচীন্দ্রনাথের উপর গবেষণা করতে বলেছিলাম। আমার তত্ত্বাবধানে বেশ কিছুকাল গবেষণা চালিয়ে সে গবেষণা-নিবন্ধটি প্রস্তুত করে এবং ওই নিবন্ধের জন্য পি. এইচ. ডি উপাধি প্রাপ্ত হয়। গবেষণার সময় শ্রীমান মন্ডলের আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম, অনুসন্ধিৎসা এবং মৌলিক চিন্তা আমাকে সন্তুষ্ট করেছিল। এতদিন পরে সেই গবেষণা-নিবন্ধটি প্রকাশিত হল, খুবই আনন্দের বিষয়।

ডঃ মন্ডল শচীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য প্রবাহ ধারাবাহিক ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর জীবনঅভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন তাঁর নাটকে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তাও ডঃ মন্ডল দেখিয়েছেন। শচীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। দর্শকদের রুচি ও চাহিদা তিনি জানতেন। তাঁর নাটক মঞ্চ-আঙ্গিকের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত ছিল। ডঃ মন্ডলের গ্রন্থে এই সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শচীন্দ্রনাথের নাটকগুলি মঞ্চে কিভাবে অভিনীত হয়েছে, কোন্ শিল্পী কোন্ ভূমিকায় কিরূপ দক্ষতা দেখিয়েছেন তা-ও এই গ্রন্থে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকের আঙ্গিক, সংলাপ ও চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কেও ডঃ মন্ডল অনেক কথা বলেছেন।

শচীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার অনেকগুলি দিক ছিল। তিনি ছিলেন দেশকর্মী, সাংবাদিক, নাট্যকার, নাট্যসংগঠক। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যদিকগুলিও প্রতিফলিত হয়েছে। সেজন্য সেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ রূপটি

উপলব্ধি করতে পারলেই তাঁর নাটকগুলি যথার্থ বিচার করা সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা, আবেগের প্রাবল্য এবং গতিবেগের প্রচণ্ডতা দেখা যায় সেসব গুণ শচীন্দ্রনাথের নাটকেও বর্তমান। দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবাদ স্বদেশপ্রীতি ও মানবতাবোধও শচীন্দ্রনাথের মধ্যে সমভাবে বর্তমান। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাবকল্পনা অনেক স্থলেই শচীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছে। 'রাষ্ট্রবিপ্লব' 'সাজাহানের' প্রত্যক্ষ প্রভাবে লিখিত।

স্বাধীনতা লাভের আগে লিখিত শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় ভাবাবেগের উদ্দীপিত প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরবর্তী নাটকগুলিতে তাঁর সংশয়, প্রতিবাদ ও তাত্ত্বিক চিন্তারই প্রাধান্য দেখা যায়। সমসাময়িক নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর প্রখর সচেতনতা এবং নিজস্ব মতবাদও এই নাটকগুলিতে পরিস্ফুট। তবে উদার মহামানবতার এক চিরকালীন সত্য প্রকাশ পেয়েছে 'সবার উপর মানুষ সত্য' নাটকে। একটি মূল ভাব পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপনার যে রীতি বর্তমানে বহু নাটকে দেখা যাচ্ছে তার সূচনা লক্ষ্য করা যায় এই নাটকে। সুতরাং অভিনব আঙ্গিক প্রয়োগের দিক দিয়েও এই নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শচীন্দ্রনাথের নাটকে অতিনাটকীয়তা, কারণ ও কার্যের অসঙ্গতি, বক্তৃতাধর্মী, উচ্ছ্বাসময় সংলাপ প্রভৃতি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এগুলি হল তৎকালীন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী দর্শকপ্রিয় নাট্যলক্ষণ। দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'গৈরিক পতাকা' ও 'সিরাজদ্দৌলা' আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে প্রেরণা জুগিয়েছিল তা অবিস্মরণীয়। ডঃ মন্ডল নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের এই বহু বর্ণময় ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিকর্ম ব্যাখ্যা ও বিচার করেছেন, সেজন্য তিনি সকল নাট্যপ্রেমিকের ধন্যবাদভাজন।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

এ ই ৫১০

সল্টলেক

কলিকাতা-৬৪

অজিতকুমার ঘোষ

এক

ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাংবাদিক-ব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার জীবনের সূচনা

১২৯৯ সালে (১৮৯৩ খ্রীঃ) ৪ শ্রাবণ অবিভক্ত বাঙলার খুলনা জেলায় সেনহাটি গ্রামে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন। শচীন্দ্রনাথের মায়ের নাম চপলাদেবী। পিতা সত্যচরণ সেনগুপ্ত রংপুরের জজকোর্টে চাকরি করতেন। বাঙলাদেশের বিদগ্ধ সমাজে খুলনা জেলার সেনহাটি অজ্ঞাত পল্লী নয়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিনাথ বেদান্তবাগীশ, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু এবং বাঙলার প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত কিশোরদের মাসিকপত্র 'সখা ও সাথী' কাগজের প্রবর্তক প্রমদাচরণ সেন এই সেনহাটিরই সন্তান।

কুড়িগ্রামে শচীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত। এখানে মুনসেফী আদালতে তাঁর পিতার কর্মস্থল ছিল। পরে রংপুরে বদলী হন। কাকা ধ্রুবচরণ সেনগুপ্তের ইচ্ছায় শচীন্দ্রনাথ এবার রংপুর জেলা স্কুলে ফোর্থ ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯০৫ সালে ছাত্রদের স্বদেশীসভায় যোগদান নিষিদ্ধ করে যে সরকারি আদেশ জারি হয়েছিল, তার প্রতিবাদে তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারে অবিভক্ত বাংলাদেশ তখন উত্তাল উদ্দীপ্ত। সে সময় রংপুর ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। ছোটবেলাতেই শচীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। তাঁর কাকার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও জেলা স্কুলে পড়াশুনো না করে ন্যাশানাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এবং এখান থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর কাকার ইচ্ছা ছিল তিনি ভবিষ্যতে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হন, কিন্তু তীব্র স্বাদেশিকতাবোধের প্রেরণায় তিনি সে চিন্তা আদৌ মনে স্থান দিতেন না। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সময়ই তিনি নতুন করে স্বদেশী চেতনা লাভ করেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফুল্ল চক্রবর্তী, অতুল গুপ্ত, সুরেশ দাশগুপ্ত আর বিপ্লবী ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে শচীন্দ্রনাথ জাতীয় মুক্তির স্বপ্নে মেতে ওঠেন। সুরেশ দাশগুপ্ত ছিলেন তাঁর প্রথম রাজনৈতিক দীক্ষাদাতা। এই সময়ের অনুভূতি তিনি আত্মস্মৃতির

পাণ্ডুলিপিতে সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ '…মনের একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। আনন্দমঠকে আর উপন্যাস বলে মনে হয় না। মেঘনাদ বধ কাব্যের রাবণ, মেঘনাদ নতুন রূপে নিয়ে মনের পটে ভেসে ওঠে।…দেশকে জানবার, দেশকে বোঝবার, দেশের লোকের পরিচয় পাবার আগ্রহ আমাদের মনে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল।'

রংপুরের পাঠ শেষ করে ১৯০৯ সালে শচীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর ভাষায় ঃ 'বাবা কাকার ইচ্ছা অর্থকরী শিক্ষা গ্রহণ করি। তাঁরা বল্লেন ডাক্তার শরৎ মল্লিকের ন্যাশানাল মেডিকেলে ভর্তি হই। কিন্তু দেখেশুনে আমার ভর্তি হতে ইচ্ছে হল না।'[১] কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত কলেজে বি.এ. অবধি পড়েন। পরে জাতীয় কলেজের অধ্যাপক ও হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। দেশপ্রেমিক মনীষী মহারাষ্ট্রীয় সখারাম গণেশ দেউস্করের (১৮৬৯-১৯১২) নিকট তিনি হাতে কলমে সাংবাদিকতা শিক্ষা লাভ করেন।

এই সময় অনুশীলন সমিতির অন্যতম বিপ্লবী নায়ক শ্রীমাখনলাল সেনের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে তাঁরই নির্দেশে তিনি বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলা পর্যটন করেন। স্বদেশী প্রচার ও কর্মকাণ্ডের সূত্রে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে অবহেলিত গ্রাম ও তার অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা স্বচক্ষে দেখতে পেলেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন ঃ 'ক্রমাগত দু' তিন মাস প্রতি সপ্তাহে এইভাবে ঘুরে ঘুরে দুঃখের নানান বাস্তব কাহিনী শুনে শুনে আমাদের মন তেতো হয়ে উঠল। যা জানতে চেয়েছিলাম তা জানা হয়েছে। প্রত্যক্ষ করেচি পরশাসন মানুষকে পশু করে রেখেচে।' এইভাবে দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসায় এবং বিদেশী শাসকের প্রতি ঘৃণায় পরবর্তীকালে তিনি ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত হন। এক সময় তাঁকে দীর্ঘকাল বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় আত্মগোপন করে থাকতে হয়। সেই সময় তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতা।

এরপর কলকাতায় ফিরে এসে আর.জি. কর মেডিক্যাল স্কুলে ২/৩ বছর

---

১. শচীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত অপ্রকাশিত আত্মজীবনী। বর্তমানে কলকাতার সেনহাটি কলোনীতে নাট্যকারের পুত্রদের কাছে রক্ষিত।

শিক্ষালাভের পর কটক মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে যান। কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্টে তাঁর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। অতঃপর তাঁর এক আত্মীয় কবিরাজ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষালাভ করেন, পরে কলকাতায় ফিরে এসে কবিরাজী ব্যবসায় শুরু করবার চেষ্টা করেন। এই সময়ের একটি ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়; ফলে কবিরাজ শচীন্দ্রনাথ সাংবাদিক শচীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত হলেন।

তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় নারায়ণ পত্রিকার[১] খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। শচীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। স্বয়ং দেশবন্ধু প্রবন্ধটির বিষয় ও ভাষার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হন। তাঁরই উৎসাহে শচীন্দ্রনাথ কবিরাজী ব্যবসার আশা ত্যাগ করে সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেন। নারায়ণ পত্রিকায় (১৩২৮-২৯ সালে) তখন শচীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক 'চিঠির গুচ্ছ' বের হচ্ছে। এই সময় তাঁর বলিষ্ঠ রচনারীতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বৈকালী (সান্ধ্য দৈনিক) কাগজের সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। বৌবাজারের চেরী প্রেসের একটা ঘরে বৈকালী সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বসতেন। দৈনিক বিকালের দিকে বেরুতো বলে কাগজখানার নাম বৈকালী। চেরী প্রেস তখন বাঙলাদেশের বিপ্লবী ও স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের যাতায়াতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল। বোমারু বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষ চন্দ্র, কাজী নজরুল, খ্যাত প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, কলাবিদ, কবি প্রভৃতি মিলে চেরী প্রেসকে করে তুলেছিলেন এক মহনীয় স্থান। শচীন্দ্রনাথের ছিল এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ। অনেকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ 'আড্ডাও' জমে উঠত প্রতিদিন। আর্য পাবলিশিং-এর পরিচালক এবং 'বারবেলা ক্লাবে'র কেন্দ্রবিন্দু শচীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

---

১. '১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বাংলা মাসিকপত্র "নারায়ণ" প্রকাশ করেন। "নারায়ণ"-এর লেখক-তালিকা যেন রাত্রির নির্মল আকাশে অজস্র উজ্জ্বল তারকার মত। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ······প্রমুখ।'
(শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা—পুলকেশ দে সরকার, পৃঃ ৬)

'শচীন সেনগুপ্ত কোমল মধুর আড্ডাবাজ হলেও কর্তব্যে ছিলেন কঠোর, দায়িত্বহীনের প্রতি নির্মম।'[১]

বিপ্লবী সাংবাদিক শচীন্দ্রনাথের লেখনী তখন স্বদেশ ও সমাজের বহুমুখী ভাবনাকে প্রকাশ করেছে। বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্যে, নিরপেক্ষ ক্ষুরধার যুক্তি বিস্তারে দক্ষ এই সাংবাদিক সেদিন বাংলাদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী ও মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। রচনাশৈলীতে সাংবাদিক-গুরু সখারাম গণেশ দেউস্করের সাহিত্যরসসমৃদ্ধ গদ্যশৈলীর প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল বলেই মনে হয়।[২] সখারামের সংগ্রামী চেতনা, গভীর দেশপ্রেম ও সাংবাদিকের সত্যনিষ্ঠা শচীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। সখারামের মত তিনিও সাংবাদিক জীবনে কোন মিথ্যা ও কর্তৃপক্ষের অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি। পরবর্তীকালে, নাট্যকার জীবনেও এই চারিত্রিক দৃঢ়তা শেষপর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। বিজলী, আত্মশক্তি, নবশক্তি, বৈকালী, নটরাজ, ঘরে বাইরে, কৃষক, ভারত প্রভৃতির সম্পাদক হিসাবে শচীন্দ্রনাথের সাংবাদিক জীবনের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বদেশ, রূপমঞ্চ, বঙ্গবাণী, বাতায়ন, বাঙালী, ভগ্নদূত, দীপালি, ভারতবর্ষ, খেয়ালী, মডার্ন রিভিয়ু, গল্পভারতী প্রভৃতি এবং আনন্দবাজার, যুগান্তর ছাড়াও অসংখ্য ছোটবড় পত্র-পত্রিকায় তাঁর সুচিন্তিত ও পান্ডিত্যপূর্ণ রচনা ছড়িয়ে আছে, যেগুলি খুঁজে পাওয়া গেলে শচীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

সাংবাদিকতায় শচীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃশর্ত সত্যসন্ধ। বিজলী ইত্যাদি সংবাদপত্রে তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ পেত মৌলিক চিন্তা ও সত্য ভাষণের নির্ভীকতা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'বিজলী'তে (১৯২৩) তাঁর অনেক

---

১. শচীন সেনগুপ্তের ত্রিধারা (রূপমঞ্চ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৮)।

২. 'জার্নালিস্ট হইয়াও যাঁহারা গদ্য রচনায় সাহিত্য রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য— সখারাম গণেশ দেউস্কর (?-১৩১৯) ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭)।' বাংলা সাহিত্যে গদ্য— সুকুমার সেন, (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

মন্তব্য তর্কের বিষয়ীভূত হলেও শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদনলাভ করেছিল।[১] এই সময় আর একজন বিপ্লবী-সাংবাদিক কবি কাজী নজরুল ইসলামের নির্ভীক সাংবাদিকতা ও বলিষ্ঠ লেখনী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নজরুল সম্পাদিত ধূমকেতু পত্রিকা একদিকে যেমন ইংরেজ শাসককে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল অন্যদিকে বিশ্বকবির আশীর্বাণী ও দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার শুভেচ্ছা তাঁকে আরও অনুপ্রাণিত করে তোলে। শচীন সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বিজলী' পত্রিকা লিখলেনঃ 'কবির 'ধূমকেতু' 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতা যেন নিদ্রা ব্যাধিগ্রস্ত জাতির অঙ্গে জাগরণীর ইন্‌জেকশন। এছাড়া প্রবন্ধ-গুলোও নির্ভীক সতেজ। দেশের ও বিদেশের খবর সুন্দর ও সরস করে দেওয়াতে 'ধূমকেতু'র জ্বালা বেশ উপভোগ্য হয়েছে। আমরা আশা করি এই জ্বালায় জ্বলে দেশবাসী যত অসত্য ও যত আবর্জনা পুড়িয়ে দেবে।'[২]

নজরুলের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। নজরুলের বিপ্লবী মনের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের মনের সাধর্ম্য দেখা যায়। আর সে কারণে একজন অন্য জনের প্রতি চিরদিন আকৃষ্ট ছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সাংবাদিক হিসাবে ছিলেন নিরপেক্ষ। সত্যকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে নিজে বিপ্লবী হয়েও বিপ্লবীদের ভুলভ্রান্তিকে কঠোর সমালোচনা করতে দ্বিধা করতেন না। এই কারণে পরবর্তীকালে সুভাষ বসুর সঙ্গেও তাঁর মতান্তর ঘটে যায়।

সাংবাদিক জীবনেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা জন্মে, নজরুলকে অনুজের ভালবাসায় তিনি অভিষিক্ত করেছিলেন। তাঁর বিপদের দিনেও শচীন্দ্রনাথ সজাগ থাকতেন। একটি ঘটনা—ইংরাজী ১৯২২ সালে 'বিজলী'-সম্পাদক[৩] শচীন্দ্রনাথ বোমারু বারীন ঘোষের কাছ থেকে নজরুলের নামে

১. শচীন সেনগুপ্তের ত্রিধারা—শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী, রূপমঞ্চ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৮ (একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা)।

২. সাংবাদিক নজরুল। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

৩. ১৯২০ সালে আন্দামান থেকে মানিকতলা বোমার আসামীরা, বারীন ঘোষ প্রভৃতি মুক্ত হন। ১৯২১ সালে বারীন ঘোষ 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবের সন্ধানে')

দ্রঃ 'পন্ডিচেরী থেকে শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশ পাঠান শচীন্দ্রনাথকে 'বিজলী'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে।' বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীন্দ্রনাথ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ। দৈনিক বসুমতী ১০ মার্চ ১৯৬১।

দ্রঃ স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র (রামানন্দ-বক্তৃতা ১৯৪৯)—শ্রীমাখনলাল সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৫৬। পৃঃ ৪৮।

গ্রেপ্তারী পরোয়ানার গোপন খবর পেয়ে তিনি ধূমকেতুর ম্যানেজার শান্তি সিংহকে দিয়ে নজরুলকে কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। শান্তিবাবু একথা নজরুলকে জানালে বিদ্রোহী কবি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ত্যাগ করে আত্মগোপন করেন।[১]

নজরুলের প্রতিভাকে শচীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর বিশিষ্ট শিল্পচর্চাকে বিরোধীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করারও চেষ্টা করতেন। 'লাঙলের গান' প্রকাশিত হবার পর 'তারারা' ছদ্মনামে 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় তাঁকে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করা হল। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তার জবাব দেন নজরুলকে সমর্থন করে।[২]

এই সময়ের স্বদেশী আন্দোলনে শচীন্দ্রনাথ সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ কর্মী হিসাবে যোগদান না করলেও সাংবাদিক হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। আন্দোলনের সপক্ষে, স্বদেশী চেতনার বিকাশে তাঁর লেখনী ছিল সদা সক্রিয়। 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রিকাতে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হবার পরই বাংলা সাহিত্যে নজরুলের জনপ্রিয়তা গগনস্পর্শী হয়ে ওঠে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক নজরুল সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা সাংবাদিক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কেও প্রযোজ্য ঃ 'তাঁর সাংবাদিকতার ভিত্তি বা উৎস ছিল দেশপ্রেম। পরাধীন ভারতবর্ষের গ্লানি এবং তৎকালীন শাসকশ্রেণীর ঘৃণ্য অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সাংবাদিক হিসাবে সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ দেশপ্রেম এবং তাঁর অন্তঃস্থ বৈপ্লবিক চেতনা স্ফুরণের মাধ্যম হিসাবে এই বৃত্তিটি অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল।'[৩]

বিপ্লবী নজরুল বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথকে চিরদিন অগ্রজের সম্মান দিয়ে এসেছেন। তিরিশের দশকে নজরুলকে নাটকের জগতে নিয়ে আসার কৃতিত্বও অনেকাংশে শচীন্দ্রনাথের। তাঁর অনেকগুলি নাটকে নজরুল গান লিখে সুরারোপ পর্যন্ত করেছেন। শচীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'রক্তকমলে'র গানগুলি নজরুলের রচনা, তাঁকে নাটকখানি উৎসর্গও করেছেন। এ ছাড়া শচীন্দ্রনাথের

---

১. সাংবাদিক নজরুল। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

২. সাংবাদিকতায় নজরুল। প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ (পঃ বঃ সরকারের মুখপত্র) নজরুল সংখ্যা ১৯৭৮।

৩. সাংবাদিক নজরুল। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

সর্বাধিক জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক সিরাজদ্দৌলার গান ও সুর রচনাও বিদ্রোহী কবির। এই সময় তাঁর হাতিবাগান বাজারের বাসায় সুপরিচিত 'ক্রাঙ্কার্স কর্ণারে'র সাংস্কৃতিক আড্ডায় নজরুল ছিলেন নিয়মিত সদস্য। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নাট্যকার ও সাংবাদিক-সমালোচক শচীন্দ্রনাথের ছিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিজের স্বার্থ পরিপন্থী হলেও যে কোন অবস্থাতে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। সেখানে পুরনোকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকেননি, জাগতিক পরিবর্তনের নিয়মকে মেনে তাকে মর্যাদা দিয়েছেন।

শচীন্দ্রনাথ যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সফল সম্পাদকরূপে সর্বত্র সম্মানিত, তখন সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে ফরোয়ার্ড সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক 'আত্ম-শক্তি'র (প্রথম সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সম্পাদক হয়ে এলেন একশত টাকা মাসিক বেতনের বিনিময়ে। 'আত্মশক্তি'তে শচীন্দ্রনাথের সাংবাদিকতার ও সম্পাদকীয় প্রতিভার চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরীর কথায়ঃ 'আত্মশক্তি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের হাতে ধীরে ধীরে হয়ে উঠলো স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্র। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মনীতি কোন বিষয়েই কারো বাধা ছিল না স্বাধীন মতামত প্রকাশে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যেসব ত্রুটি পুঞ্জীভূত হয়ে যে সম্ভাব্য সমাজকে ডেকে আনছিল তার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তিনি। আত্মশক্তিতে শিবরাম চক্রবর্তীর একাঙ্ক বর্তমান দিনের গণসাহিত্যের নির্ভুল পূর্বগামী 'যখন তারা কথা বলবে' নাটিকা ছাপাতে তাঁর একটুও দ্বিধা হয়নি। বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটিকার পরীক্ষাও চলছিল তাঁর কাগজে কিছুকাল ধরে।'[১]

এই সময় থেকে তিনি যে সমাজতন্ত্রের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার প্রমাণ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিরানব্বুয়ের ধাক্কা' নামক প্রবন্ধটি তাঁরই সম্পাদিত 'আত্মশক্তি' তে সাগ্রহে ছাপিয়েছিলেন। সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা' কাগজে প্রকাশিত জনৈক দুর্গাপ্রসাদের 'সোস্যালিজম-কম্যুনিজমবাদীদের বিরুদ্ধে অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে লেখা 'শতকরা নিরানব্বুই জন' নামক একটি প্রবন্ধের প্রতি-উত্তর ছিল এটি। প্রবন্ধটির 'প্রথম অংশে থাকলো গালাগালের জবাবে পাল্টা গালাগাল, দ্বিতীয় অংশে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আদর্শ ও

১. শচীন সেনগুপ্তের ত্রিধারা (রূপমঞ্চ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৮)। দ্রঃ—'যখন তারা কথা বলবে' (চলন্তিকা পাবলিশার্স কর্তৃক পুনর্মুদ্রণ)—শিবরাম চক্রবর্তী।

কর্মপন্থার বিশ্লেষণ আর তৃতীয় অংশে গণবিপ্লবের আদর্শ কর্মপন্থা ও যৌক্তিকতা।'[১] লেখাটি সে সময় বেশ বড় রকম বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ তাতে দমলেনই না বরং নিয়মিত লেখক হিসাবে প্রতি লেখা পিছু দশ টাকা হিসাবে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'আত্মশক্তি'র লেখক হিসাবে নির্বাচিত করলেন। ব্যাপারটা একারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে 'আত্মশক্তি' তখন ফরোয়ার্ড কোম্পানিরই সাপ্তাহিক কাগজ, স্বয়ং স্বরাজ্য পার্টির সমর্থক ছিলেন এর কর্তৃপক্ষদ্বয়—শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র। পরবর্তীকালে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের জাতীয়তা নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সম্পাদনা-পদ্ধতি তাঁদের বিরাগভাজন করে তুলেছিল।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সংস্কারমুক্ত শিল্পী-দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশেছিল অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামী মননশীলতা। আর সেকারণেই দ্বিধাহীন চিত্তে অংকুরিত প্রতিভা ও সম্ভাবনাময় যুগসন্ধিক্ষণকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন নিজের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাকে তুচ্ছ করেও, সর্বজনবিমুখ পরিবর্তিত শিল্প চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন।

কালটা হল কল্লোল যুগের। কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ ও জীবনকে দেখলেন তাতে পুরনো-পন্থীরা হলেন শংকিত। গতানুগতিক জীর্ণ আচারসর্বস্ব সমাজকে একটা বড় ধাক্কা দিল। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা হল আতংকিত, ফলে কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা বাস্তবিকপক্ষে একঘরে হয়ে পড়লেন। তাঁদের মুখপত্র তখন একমাত্র 'কল্লোল' ছাড়া বিদ্রোহ প্রকাশের কোন স্থানই ছিল না। শচীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে 'নবশক্তি' তে প্রচুর লিখছিলেন। এর আগে 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পৃষ্ঠাও তাদের কাছে অবারিত করে দিয়েছিলেন। 'তারপর ধীরে ধীরে জাতে উঠে তাঁরা যে আজ অভিজাত হয়ে উঠেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শচীন সেনগুপ্ত ছিলেন কষ্ঠিপাথর —তাতে সোনা যাচাই হত।'[২] শশাংকমোহন চৌধুরীর এই মন্তব্যের যাথার্থ্য অনুধাবন করতে মোটেই অসুবিধা হয়না। কেননা সংস্কারমুক্ত শচীন্দ্রনাথ কল্লোল যুগের বিদ্রোহকে বুঝতে পেরেছিলেন, বুঝেছিলেন যুগপরিবর্তনের ইংগিতকে। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল আগামী দিনের রূপরেখা। তাই আন্তরিক

১. দ্রঃ বিপ্লবের সন্ধানে। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬১।

২. শচীন সেনগুপ্তের ত্রিধারা—রূপমঞ্চ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৮।

সমর্থন ও সহানুভূতির ডালি নিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন নতুনদের বরণ করে নিতে। 'নবশক্তি' ও পরে 'কালি ও কলম' পত্রিকার বিরুদ্ধে সাহিত্যে অশ্লীলতার অভিযোগে এক মামলাকে কেন্দ্র করে স্বসম্পাদিত 'আত্মশক্তিতে' শচীন্দ্রনাথ লিখলেন, সুনিপুণ সম্পাদকীয় বিশ্লেষণে তাঁদের পক্ষে রায় দিলেন।

তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও পান্ডিত্যের প্রতি সে সময়ের শিক্ষিত তরুণ সমাজ খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত দ্বিধাহীন মন তাঁকে কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করেছিল। কল্লোলীয় কবি সাহিত্যিকদের একজন প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন তিনি। সারাদেশে যখন কল্লোলগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীরা প্রতিবাদের খড়্গ তুলে ধরেছিলেন, সেই সময় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত শচীন্দ্রনাথও এই নব্য কবি সাহিত্যিকদের শিল্পক্ষমতাকে অভিনন্দিত করেছিলেন সর্বান্তঃকরণে। এই সময় সনাতনবাদীদের একনিষ্ঠ প্রতিনিধি সজনীকান্ত দাসের 'শনিবারের চিঠি'তে 'প্রগতি-কল্লোল-কালিকলম' সমর্থক পত্র-পত্রিকা 'উত্তরা-ধূপছায়া-আত্মশক্তি'কে লক্ষ্য করে তীব্র ব্যঙ্গ কবিতাও রচিত হয়েছিল।[১] এই প্রতিকূলতার মধ্যেও 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ ছিলেন স্থির।

'সাহিত্য-সমাজে' অপাংক্তেয় সেই সমস্ত বিদ্রোহী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতি শচীন্দ্রনাথের দরিদ্র জীর্ণ ঘরে একটি সাংস্কৃতিক আড্ডা গড়ে তুলে-ছিলেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'ক্র্যাঙ্কার্স কর্ণার' নামকরণে একদা যেটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। শচীন্দ্রনাথের দারিদ্র্য, মনীষা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল 'ক্র্যাঙ্কার্স

---

১. জয় নবসাহিত্য জয় হে
জয় শাশ্বত ; জয় নিত্য সাহিত্য জয় হে
জয়, অধুনা-প্রবর্তিত বঙ্গে
রহ, চিরপ্রচলিত রঙ্গে
শ্রমিকের ধনিকের, গনিকার বণিকের
সাম্যের কাম্যের, ভস্ম ও শ্মশানের
আস্তাকুড়ে যাহা ফেলি উদ্বৃত্ত হে
সকল অভিনব-সাহিত্য জয় হে

প্রগতি-কল্লোল-কালিকলম
অন্তর ক্ষতেতে লেপিল মলম
রসের নব নব অভিব্যক্তি
উত্তরা ধূপছায়া আত্মশক্তি
প্রেম পীরিতির নিত্য গদ্‌গদ সলিলে অভিষিক্ত
জয় নব সাহিত্য জয় হে
জয় হে জয় হে জয় হে
প্রাচীন হইল রসাতলগত তরুণ হল নির্ভয় হে
জয় হে জয় হে জয় হে।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবার চিঠি'-তে প্রকাশিত।

কর্ণারে'র অন্যতম সম্পদ। 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ 'শচীন সেনগুপ্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে একঘরে বাস করতেন, এক ছিন্ন শয্যায় অনুচর বলতে নৈরাশ্য বা নিরাশ্বাস। তবু সমস্ত শ্রীহীনতার ঊর্ধ্বে একটা মহান স্বপ্ন ছিল—কষ্টের উত্তরে নিষ্ঠা, উপবাসের উত্তরে উপাসনা। এমন লোকের সঙ্গে কল্লোলের আত্মীয়তা হবে না তো কার হবে ?'[১]

'বৈকালী' পত্রিকায় সম্পাদক থাকাকালীন শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছেন নাটক দেখার চেয়ে বিদেশী সিনেমা দেখায় তাঁর বরাবর ঝোঁক ছিল। তবে এই সময় থেকেই তিনি মাঝে মাঝে থিয়েটারে যাতায়াত শুরু করেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে তা পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর কথা থেকেই জানা যায় তিনি 'রক্তকমল' নাটক লিখবার আগে তিন বছর ধরে (১৯২৫-২৮) আর্ট থিয়েটার আর শিশির কুমারের থিয়েটারে যত অভিনয় ও রিহার্শাল হতো তাতে উপস্থিত থেকে 'ছাত্রের নিষ্ঠা' নিয়ে লক্ষ্য করে যেতেন। এর মধ্যে তিনি নাটক লিখবার জন্য কলম ধরেননি। এই সময় আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সান্ধ্য দৈনিকের (বৈকালী) তিনি সম্পাদক ছিলেন। তথাপি আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে শিশির কুমারের থিয়েটারের প্রতিযোগিতায় যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল তাঁকে তা স্পর্শ করেনি।[২] তিনি কেবল অভিনয় ও রিহার্শালই দেখতেন তা নয়—বহু বিদেশী নাটক ও নাট্য সমালোচনা অধ্যয়ন করতেন। এই সময় অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। আর তখন থেকেই তাঁর মনে নাট্যরচনার ইচ্ছা, মঞ্চ ও নাটকের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চকে 'আধুনিক' করে গড়ে তুলবার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। শচীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর একটা সুন্দর বর্ণনা এখানে তুলে ধরা যায় ঃ 'আজ আমার সেই শচীন্দ্রনাথকেই বারবার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সাঁইত্রিশ বছর আগেকার সেই দিনটি, যেদিন বৈকালী অফিসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটল। আমি তখন আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করি। আর তিনি পুরোমাত্রায় সাংবাদিক। থিয়েটার অল্পই দেখেছেন, কিন্তু অভিনেতাদের জীবন সম্বন্ধে

১ কল্লোল যুগ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৬৯

২ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও বাংলার সংস্কৃতি—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শারদীয়া রূপমঞ্চ, অষ্টম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৫৯।

জিজ্ঞাসু, অভিনয়কলা বিষয়েও। অল্পদিন পরেই বুঝলাম তাঁর এই জ্ঞান আহরণ করবার ইচ্ছার মধ্যে ফাঁকি নেই এতটুকু। বৈকালীর সেই দিনটির পরেই তিনি নিয়মিত থিয়েটার দেখতে আরম্ভ করলেন। বাড়ীতে প্রচুর বিদেশী নাটক আর ওদেশের নাট্যসংবাদ পড়তেন, এখানকার রঙ্গালয়ে দেখতেন আমাদের অভিনয়। তাঁর চিন্তারাজ্যে তখনই বুঝি আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। এ কথা আমার মনে হত, যখনই তাঁকে দেখতাম।'[১]

'আত্মশক্তি'তে সম্পাদক থাকাকালেই শচীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময় তাঁর জীবনে আবার একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল অথবা বলা চলে এই ঘটনাই শচীন সেনগুপ্তের নাট্যকার জীবনের সূত্রপাতে সাহায্য করল। ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানি ছিল রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠান। 'আত্মশক্তি'র (পরিবর্তিত নাম 'নবশক্তি') কর্ণধার ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। দলগত কারণে অনেক কিছুকে চাপা দিয়ে রাখতে হয়। রাজনৈতিক কারণেই তা প্রকাশ করা যায় না। শচীন্দ্রনাথ সেই বিপদে পড়লেন। সাংবাদিকতার আদর্শ রক্ষা করতে গিয়েই বিপদ ঘটল।

তিনি 'নবশক্তি'কে স্বাধীনভাবে পরিচালনার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর দাদা শরৎ বসুর ঘোরতর আপত্তির সম্মুখীন হলেন। সুভাষচন্দ্র শচীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ চিঠিতে অভিযোগের আভাষ দেন। সম্পাদক সে চিঠির জবাবও দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু মিথ্যাকে কোনভাবেই সত্যের আবরণে ঢেকে রাখতে রাজি হলেন না। বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা সম্ভবত তখন অন্য খাতে বইছিল। কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে তাঁর সম্পাদনা সমান তালে চলছিল না। সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ তাঁর মনে কংগ্রেসের জাতীয় নীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে স্পষ্ট করে তুলছিল বলেই মনে হয়। এই সময়ের একটি ঘটনায় তাঁর সাংবাদিক জীবনে যবনিকাপাত হয়।

১৯৩০ সালে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়। কলকাতার সমস্ত কাগজ তাতে সাম্প্রদায়িকতার রং চড়িয়ে প্রচার করে। কিন্তু সেটা আদৌ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না। হিন্দু মহাজনদের কাছ থেকে মুসলমান চাষীরা পুরুষানুক্রমে কর্জ করত। সুদ দিতে দিতে নিঃস্ব হয়ে গেলেও তাদের কর্জ

১ বন্ধুবর শচীন্দ্রনাথ—অহীন্দ্র চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ই মার্চ, ১৯৬১

শোধ হত না। বাস্তবে দেখা যায় আসল অতিক্রম করে গেছে পরিশোধিত সুদের অঙ্ক। এই সময় সেখানে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ ও কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছে। তাদেরই প্রেরণায় এই সমস্ত চাষী এক হিন্দু মহাজনের বাড়ি চড়াও হয়ে মারমুখি হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য পুরোনো ঋণের খত ফেরত পাওয়া। এইভাবে চাষী ও মহাজনদের মধ্যে এই লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং সারাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে।

আক্রমণকারী কৃষক খাতকদের মধ্যে কিছু যেমন হিন্দু ছিল তেমনি মহাজনদের মধ্যেও ছিল কিছু কিছু মুসলমান। সুতরাং সারা দেশের সংবাদপত্র একে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলেও দৃঢ়চেতা শচীন্দ্রনাথ এর নেপথ্য-সত্য উদ্ঘাটন করে 'গণদেবতার জাগরণ' নামে এক প্রবন্ধ লিখলেন। ফলে ফরোয়ার্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বসু কৈফিয়ৎ তলব করলে শচীন্দ্রনাথ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনকার খবর সাজিয়ে দেখিয়ে দিলেন, ব্যাপারটার উৎপত্তি মহাজন খাতক বিরোধ থেকে।[১]

কেউ কেউ শরৎ বসুকে দাম্ভিক মনে করতেন, প্রকৃত সংঘর্ষ বাধলো এঁরই সঙ্গে কেননা শচীন্দ্রনাথেরও দম্ভ কম ছিল না। 'দুই দম্ভের সংঘর্ষে একদিন আনবিক বোমার আওয়াজ পাওয়া গেল অকস্মাৎ। শরৎ বোসের চিঠি এল শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাছে—কাল থেকে আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই।'[২]

শচীন্দ্রনাথের জীবনদর্শে কোন আপস ছিল না। যাকে সত্য বলে জানতেন বুঝতেন, কোনমতেই কোন স্বার্থের খাতিরে ও অনুরোধে তার পরিবর্তন হোত না। কারো অন্যায় নির্দেশকেও তিনি ক্ষমা করেননি। তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা পরিণত বয়সে জীবনের অনেক স্বাচ্ছন্দ্যকে হরণ করেছিল। অনেকে তাঁকে দুর্বিনীত, রূঢ়ভাষী-আত্মাভিমানী বলে তাঁর কাছ থেকে দূরে থেকেছেন। আবার তাঁর অন্তরের কোমল স্থানটির খবর যাঁরা রাখতেন তাঁরা শচীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়ে উঠেছেন, বিপদের দিনে পরম নির্ভয়রূপে তাঁকে আশ্রয়

১. বিপ্লবের সন্ধানে। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩।

২. শচীন সেনগুপ্তের ত্রিধারা—শ্রী শশাঙ্কমোহন চৌধুরী। রূপমঞ্চ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৮।

করেছেন। শ্রীঅখিল নিয়োগী তাই তাঁকে বলেছেনঃ 'একদিকে বজ্রের মতো কঠোর, আর একদিকে কুসুমের মতো কোমল।'[১]

সেদিনের অভিনয় জগতে নবাগত ও বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা কমল মিত্রের আন্তরিক দৃষ্টিতেও শচীন্দ্রনাথের স্বরূপটি ধরা পড়ে। তিনি বলেন: 'শচীনদার সঙ্গে নারকেলের তুলনা দেওয়া যায়…বাহিরে ভয়ানক শক্ত কিন্তু ভিতরে নরম মিষ্টি শাঁস ও জল। বাইরে থেকে তা মোটে বোঝা যায় না। শচীনদা ঠিক তাই।'[২] শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমনি অজস্র স্তুতি ও প্রশংসার বাণী ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায়। ব্যক্তিত্বের বর্ম ভেদ করে যাঁরা তাঁকে বুঝতেন, কোনদিনই এই ব্যক্তিটির আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারতেন না। আর সেই কারণেই নাট্যকার জীবনে তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা আসর। সাহিত্য ও নাট্যজগতের খ্যাত অখ্যাত অসংখ্য মানুষের মাঝখানে অত্যন্ত আর্থিক দুর্গতির দিনেও তাঁর আসনটি ছিল পাকা।

শচীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি পত্রিকা ছেড়ে এসে চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লেন। এই সময় তাঁর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা প্রত্যক্ষ করেছেন আর এক শচীন্দ্রনাথকে। গ্রে স্ট্রীটের ওপর এক বাড়িতে তাঁর বাসা ছিল তখন। সে সময় অর্ধাহারেও তাঁর দিন কেটেছে; কিন্তু কারো দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সাহায্য পর্যন্ত কামনা করেননি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ এমনই প্রখর ছিল যে, কোন সহৃদয় ব্যক্তিও সেদিন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সঙ্কোচবোধ করেছেন।

শচীন সেনগুপ্তের কৃচ্ছ্রময় জীবন শুরু হল। হাতিবাগান বাজারের কাছে গ্রে স্ট্রীটের উপর একফালি বারান্দাযুক্ত ঘর ভাড়া নিলেন। এমন দিন গেছে যখন ক্রমান্বয়ে সাত আট মাসের শুধু ঘরভাড়া নয়, আহার্যবস্তুরও মূল্য দেবার সামর্থ্য ছিলনা। রূপমঞ্চ পত্রিকায় শ্রী অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) স্মৃতিচারণায় এর এক উজ্জ্বল বর্ণনা তুলে ধরেছেনঃ 'মনে পড়ে, হাতিবাগান বাজারের কাছে একটা বাড়ীর দোতলায় একখানি অনাদৃত কামরা। কতকাল ঘরের কলি ফেরেনি হয়তো। কোনো কোনো কোণে চুনবালি খসে পড়ছে। মাথার ওপর পুরু ঝুল চাঁদোয়ার কাজ করছে। সেই ঘরটিতে বাস করেন সে যুগের তরুণ প্রতিভাশালী নাট্যকার

১. নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত— শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) রূপমঞ্চ, শারদীয়া ১৩৭১।

২. আমাদের শচীনদা—কমল মিত্র। রূপমঞ্চ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৮।

শচীন সেনগুপ্ত। নীচের চায়ের দোকান থেকে চা আসে, আর ক্ষিদের সময় পাইস হোটেল থেকে আসে দুবেলা খাবার। দিনের পর দিন অক্লান্ত অভুক্ত নাট্যকার বাঙলাদেশের নাট্যমঞ্চকে ভালবেসে এই ছোট ঘরখানিতে নাট্যরচনার কঠিন তপস্যা করে গেছেন।'

এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর সেই এলোমেলো জরাজীর্ণ দো-তলা ঘরটিতে দেশের জ্ঞানীগুণী মানুষেরা সর্বদাই যাতায়াত করতেন। এর মধ্যে ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম এবং কল্লোলগোষ্ঠীর আরো বহু লেখক।

শচীন্দ্রনাথ আধুনিক মঞ্চ-সফল নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর নাট্যজীবন ছিল মঞ্চ ও নাটকের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নাট্য-ভাবনায় উজ্জ্বল। বিদেশের নাট্যচিন্তাই তাকে বেশি অনুপ্রাণিত করে। বিদেশী নাটক ও নাটকের সমালোচনা পড়াশুনো করে এবং বিদেশের মঞ্চ মায়ায় প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হয়ে মূলত তিনি সেদিন অধিকাংশ মঞ্চ সফল নাটকগুলি রচনা করেছিলেন।

দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের ঠিক প্রথমপর্বে বাংলার নাট্যমঞ্চে একটা শূন্য অবস্থা বিরাজ করছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও আর্ট থিয়েটার (১৯২৩) তখন বাংলার নাট্যদর্শকের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তথাপি তাদের অভিনীত নাটকগুলি ছিল পূর্ববর্তী নাট্যকারের রচনা, কিছু রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ। সত্যি কথা বলতে গেলে সে সময়ে বাংলা নাট্যমঞ্চের যতটুকু গৌরব ছিল তার বেশির ভাগ শিশিরকুমারকে ঘিরে। তাঁর অভিনয়ের প্রতিভা, পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞা তৎকালীন মঞ্চজগৎকে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া আর্ট থিয়েটারে দানী বাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি অভিনেতাদের অভিনয়-প্রতিভাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে সমকালীন মঞ্চে মৌলিক নাটকেরও ভীষণ অভাব দেখা গিয়েছিল। ঠিক এই সময়ে বাংলা নাটকের অভাবে কলকাতার থিয়েটার হলগুলি প্রায় রুদ্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের মত মঞ্চসফল মৌলিক নাটক রচয়িতা সেদিন ছিলেন না। নাট্যরসিক দর্শকেরা তাঁদের পুরনো নাটকগুলি মাঝে মাঝে দেখছিলেন।

১৯২৮ সালের ১১ই মে 'নাচঘর' মন্তব্য করেছে ঃ 'নাট্যমন্দিরে এখন একমাত্র ষোড়শী ছাড়া প্রতিরাত্রেই পুরাতন নাটকের স্রোত—এটা যে নবযুগের নূতনত্বের পরিচয় নয়, আশাকরি শিশিরবাবু নিজেই সেটা না মেনে পারবেন না। দুঃখের বিষয়, তাঁকে বারংবার এই সহজ সত্য কথাটা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। নাট্য-মন্দিরে আবার আমরা তরুণ সজীবতা দেখতে চাই, নূতন নাটক, নূতন ভাব, নূতন পরিকল্পনা।'[১] সন ১৩৩৯ (ইং ১৯৩২) সালের বাতায়ন পত্রিকায় 'রঙ্গালয়ের দুর্গতি' নামক প্রবন্ধে তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের এই রূপটির আর একটি যথাযথ চিত্র ফুটে উঠেছে। জনৈক ছদ্মনামধারী লেখক লিখেছেন ঃ '……… বাংলার রঙ্গালয়গুলির মধ্যে যেন হাহাকার রোদন রোল উঠেছে। সেই পুরাতনের চর্বিত চর্বন করে কোনোরকমে সপ্তাহের দুটো দিন রঙ্গালয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে। তারপর সব চুপচাপ—অর্থ নেই-নাটক নেই-শিল্পী নেই। যেন বিগত যুগের কতকগুলি গলিত কংকাল তারা। তাদের দিকে দেখলে ভয় হয়—তাদের কথা মনে হলে শরীর শিউরে ওঠে………'।

এমনি এক 'নাটকশূন্য মঞ্চে'র যুগে শচীন্দ্রনাথের আগমন। নাট্য জগতে শচীন্দ্রনাথের উপস্থিতি আকস্মিক ঘটনা বলা যেতে পারে। সাংবাদিকতার জগতে শচীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই সময় থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর ধারণাও ছিল অন্যরকম। তাঁর সহপাঠী বন্ধু পন্ডিচেরীর সুরেশ চক্রবর্তী থিয়েটারের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যার বেগম' (আর্ট থিয়েটার) দেখান। এই নাটকে উচ্চ-শীর্ষখ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর অভিনয় ছিল দারুণ আকর্ষণের বস্তু। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের কাছে সে অভিনয় লেগেছিল অস্বাভাবিক। এরপর সুরেশবাবু তাঁকে দেখান বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশরকুমারী'। নাচগান প্রধান নাটকখানি তখন বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। শচীন্দ্রনাথকে এ নাটকখানিও মুগ্ধ করতে পারেনি।[২] আসলে সে সময়ে তিনি বিদেশী নাটক ও তার সমালোচনা পাঠ করে নিজের এমন একটি মানসিকতা গড়ে তুলেছিলেন যে, এ ধরনের গতানুগতিক নাটক তাঁকে মোটেই আকৃষ্ট করেনি।

১. সাজঘর। ইন্দ্রমিত্র, পৃঃ ৩৪২

২. বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—শ্রীমনোমোহন ঘোষ। দৈনিক বসুমতী ১০ মার্চ ১৯৬১।

তবে এ ধারণা তাঁর বেশিদিন ছিলনা। যেদিন শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটক (৬ অগাষ্ট, ১৯২৪ প্রথম অভিনয় মনোমোহন নাট্যমন্দির) দেখলেন তিনি বিচলিত হলেন। অভিনয় ও নাটকের ঐশ্বর্য তাকে মুগ্ধ করলো। সেইদিনই অবগুন্ঠিতা সালংকারা নাট্যলক্ষ্মী তার শ্রী-সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যমন্ডিত রূপখানি উন্মোচিত করে নবীন নাট্যকারকে আকৃষ্ট করলো। শচীন্দ্রনাথ বুঝলেন নাট্যমঞ্চ অবহেলার বস্তু নয়, নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে গেলেন ভাবী নাট্যকাররূপে।

এই সময় 'বৈকালী' কাগজের সূত্রে কর্মকর্তা প্রবোধ গুহ মশায়ের সংগে তিনি মাঝে মাঝে থিয়েটারে যাতায়াত শুরু করেন। উপলব্ধি করলেন নতুন ধরনের নাটক রচিত না হলে বাঙলা রংগমঞ্চ ক্রমশ তার পুরনো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলবে। শচীন্দ্রনাথ বাঙলা নাটকের দুর্দশা বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন। এই সময় বৃটিশ শাসকেরা সংবাদপত্র ও জনমতের কন্ঠরুদ্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। জাতীয়তাবাদী কাগজ ও প্রচারমূলক সাহিত্যগ্রন্থকে বাজেয়াপ্ত করে বিদেশী শাসকেরা ক্রমাগত বর্ধিত গণরোষকে চাপা দেওয়ার এক নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ স্বদেশী চেতনাকে বিকশিত করে দেশের জনগণকে তাতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যম হিসাবে নাট্যমঞ্চকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জনশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে থিয়েটারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। শচীন্দ্রনাথও জাতীয় চেতনাকে প্রচার করার এক নিপুণ হাতিয়ার হিসাবে রংগমঞ্চের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন।

বাঙলা রংগমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সংগে সংগে তিনি এই অবহেলিত শিল্প-জগতের সুখ দুঃখ, রংগালয় সত্ত্বাধিকারীর যথেচ্ছাচার ও শিল্পীদের অভাব বেদনার প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। এই সময় ১৩৩৩ সালে রংগালয় বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক 'নটরাজ' পত্রিকায় সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাতেই শচীন্দ্রনাথ স্বকলমে সমসাময়িক কালের নাট্যপ্রযোজনা পরিচালনা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জীবন পরিচয় তুলে ধরতেন। এ ছাড়া বিশ্বরংগমঞ্চ, 'বংগরংগালয়ের ইতিহাস' প্রাচীন নাটক ও নাট্যসাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাস ও আলোচনা সম্পাদক নিজেই লিখতেন। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর আর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, সেখানে তিনি বংগরংগশালার পরম হিতৈষীরূপে চিহ্নিত। রংগমঞ্চের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করেছেন তিনি, কিন্তু রংগমঞ্চের প্রতি কারো অহেতুক সমালোচনা সহ্য করেননি, মঞ্চ-সত্ত্বাধিকারীর

অন্যায় অবিচারকে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তৎকালীন রংগমঞ্চের উপেক্ষিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে তাঁর মমত্ব ও মর্যাদাবোধ কত গভীর ছিল নটরাজ পত্রিকায় এই সময়ের এক বিতর্কমূলক আলোচনা থেকে তা জানা যায়ঃ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' দেখে জনৈক সমালোচক ভারত বসু ঠাকুরবাড়ির অপেশাদারী অভিনয়ের সংগে পেশাদারী সাধারণ রংগমঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় তুলনা করে মন্তব্য করেনঃ 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর শিক্ষিত সুরুচি সুচারু শিল্পানুরাগী নরনারী যে নিঃস্বার্থ অপেশাদারী অভিনয়ের দ্বারা রবিবাবুর নটীর পূজাকে দর্শকচিত্তে অনাবিল আনন্দদান করেছিলেন, পেশাদারী সাধারণ রংগমঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, কেননা অভিনেতাদের বহুলাংশে অর্থনৈতিক চাপে রংগশালাকে ভালবাসতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা তাদের অধিকাংশের উপযুক্ত নয়, যে কারণে অভিনয়ের সার্থকতা দেখা যায় না।'[১]

সাধারণ রংগমঞ্চের অভিনেত্রীদের সম্পর্কে ভারত বসুর মন্তব্য আরো রূঢ়ঃ '......অংগরাগের স্পর্শ বিনা যাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও মঞ্চে আবির্ভূত হতে পারেন না, "অংগবৈশিষ্ট্য" যাঁদের আছে প্রচুর আর যাঁদের মুখে অলখ্-তুলিকায় ফুটে আছে অভিশপ্ত তাঁদের জীবনের পাণ্ডুর ছবিখানি স্ফূর্তির অভিনয়, প্রাণের অভিনয়, "সুন্দরের" অভিনয় তাঁরা করবেন কি করে?......জোড়াসাঁকোর আদর্শ পেতে তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে অনেক যুগ এবং রসগ্রাহী দর্শক পাওয়ার সৌভাগ্য তখনই।'[২]

বাঙলা রংগালয়ের 'একান্নবর্তী পরিবারের শেষ কর্ণধার' শচীন্দ্রনাথ ভারত বসুর মন্তব্যের সুচিন্তিত ও সুস্থির প্রতিবাদ জানালেন। ভারত বসু প্রমুখ তথাকথিত নীতিবাগীশদের অবৈজ্ঞানিক আক্রমণকে প্রতিহত করলেন শাণিত যুক্তির পর যুক্তি বিস্তারে। তিনি লিখলেন, নাট্যপ্রতিভা ছাড়া সংস্কৃতজ্ঞ সুশিক্ষিত ব্যক্তিও মঞ্চের উপযুক্ত নন। আবার অশিক্ষিতা পতিতা নারী অধ্যবসায়ের জোরে এবং মৌলিক নাট্যপ্রতিভার জোরে মঞ্চপাদপীঠকে উজ্জ্বলতর করতে সক্ষম।[৩]

---

১. নটরাজ (সম্পাদক-শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) ১ম বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা ১৩৩৩।

২. দ্রঃ ঐ

৩. দ্রঃ ঐ

নাট্যজগতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগের আগে শচীন্দ্রনাথের প্রস্তুতিটি ছিল দীর্ঘসময়ের। নাট্যজগতের প্রতি অনুরাগ আকস্মিক হলেও রঙ্গালয়ের অন্তঃপুরে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল অনেক সাধনার ফল।

তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সাংবাদিকতার সত্যানুসরণ শিল্পী-সুলভ রসানুরক্তি ও জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক স্পৃহার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। ফলে জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে তৃতীয় পর্বটির বৈসাদৃশ্য দেখা গেলেও প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণ প্রতিটি পর্বেই সার্থকতা লাভ করেছিল। স্বদেশী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার (১ম পর্ব) সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক জীবনের প্রস্তুতি (২য় পর্ব) তৎসহ নাট্যকার জীবনের ক্রমপরিণতি (৩য় পর্ব) আপাত আকস্মিকতায় উদ্ভাসিত হলেও তা অনেক চিন্তা ভাবনারই ফলশ্রুতি। নাটকের জগতে প্রবেশলাভের আগেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সেই সূত্রেরই সন্ধান দেয়।

সে সময় স্বদেশী যুগে শচীন্দ্রনাথের উপর যাত্রা-নাটকের প্রভাবও পড়েছিল এর রাজনৈতিক স্বরূপটির জন্য। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত গায়ক ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা' যাত্রা-নাটকখানি ঐতিহাসিক কলকাতা কংগ্রেসের একঅধিবেশন প্যাণ্ডেলে একাদিক্রমে আঠারো রাত্রি অভিনীত হয়। নাটকখানি শহর পল্লী মফঃস্বলে সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পুরাণের ছদ্মবেশে 'মাতৃপূজা' ছিল 'খাঁটি পোলিটিক্যাল নাটক, সিম্বলিক্যাল নয় দ্ব্যর্থবাহক নাটক।......নাটকের সংঘাতকে দেবদানবের দ্বন্দ্ব বলেও গ্রহণ করা যেত, আবার দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গমাতার অখণ্ড রূপারোপের তখনকার সংগ্রামও কল্পনা করা যেত।'[১] 'মাতৃপূজা' নাটক সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের উপরোক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁকে নাট্যরচনায় উৎসাহী করে তুলতে পারে। ভূষণ দাসের এই যাত্রা-নাটক আর একজন আধুনিক নাট্যকার মন্মথ রায়কে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি 'দেবাসুর' ও 'কারাগার'।

অবশ্য বাঙলা নাটকে স্বদেশী চেতনার বীজ উপ্ত হয়েছে বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের আদি পর্ব থেকে এবং ডি. এল. রায় পর্যন্ত এর অব্যাহত জয়যাত্রা।

১. কেন গিরিশকে নাট্যশালার জনক বলা হয়—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। রূপমঞ্চ, ১৬ বর্ষ, ১৩৬৩।

শচীন্দ্রনাথ তাকে নতুন করে উপলব্ধি করে মঞ্চ নাটকের চাহিদাকে পূরণ করেছিলেন। সে সময় বাঙলা রঙ্গমঞ্চের দরিদ্র অবস্থা তাঁকে অনুভূতিশীল করে তুলেছিল। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের গৌরবময় ইতিহাস চর্চা করে বর্তমান রঙ্গমঞ্চের দুর্গতি উপলব্ধি করলেন। যদিও বিদেশী সাহিত্য ও নাটক পড়াশুনা করে তিনি সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট নাটকের একটা আদর্শ ইতিমধ্যে খাড়া করেছিলেন। এর ফলে মঞ্চসফল নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তিনি দেশ ও জাতিকে অন্ধতা ও মূঢ়তার মধ্যে আশার আলোকে সর্বোপরি বিশ্বমানবতাবোধের সঠিক লক্ষ্যসীমায় পৌঁছে দেবার ব্রত গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আসলে বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে 'বৈপ্লবিক চেতনার' যে পথ খুঁজছিলেন, তা তাঁর পূর্বসূরী নাট্যকারদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

বাল্যকালে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তাঁর জীবনের শুরু। এরপর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে বস্তুটির সাধনা তিনি করে গেছেন, তা হল সর্ব-প্রকারের দাসত্ব থেকে মুক্তির সাধনা। এই বাঙময় রূপ পেল নাট্যকার জীবনের সৃষ্টি তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকগুলিতে।

সমসাময়িক নাট্যকার মঞ্চসফল সার্থক একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা মন্মথ রায় তাঁর সম্পর্কে যথার্থ লিখেছেন: 'মানুষের মুক্তিই চেয়েছিলেন তিনি সারা জীবন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে কী অপূর্ব উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত করেছিলেন তিনি 'গৈরিক পতাকা' ও 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের মাধ্যমে, দেশ তা কোনদিনই ভুলবে না। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও যেমন লড়াই করেছেন তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে, দুঃখ দারিদ্র্যর নাগপাশ ছিন্ন করতেও তিনি জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন বহু নাটকের মাধ্যমে।'[১]

বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের ভূমিকা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা নাটকের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তাঁর মত এককভাবে বঙ্গরঙ্গালয়ের সমস্যা, নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমস্যা, নাটক লেখকের দায়িত্ব, নাট্যশালার আয় ব্যয় ও উন্নয়ন, সরকারের ভূমিকা, জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা, নাটকের সমালোচনা ইত্যাদি নাট্যবিষয় সংক্রান্ত এত বেশি প্রবন্ধ অপর কোন নাট্যকার রচনা করেন নি।

১. শচীন্দ্রনাথ স্মরণে—নাট্যকার মন্মথ রায়; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই মার্চ ১৯৬১।

১৯৬১ সালের ৫ মার্চ রবিবারে (বাংলা ২২ ফাল্গুন, সন ১৩৬৭) বেলা দুইটায় ২৮/এ, ভূপেন বোস এভিনিউস্থিত বাসাবাড়িতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'তাঁর মৃত্যুর পর কম্যুনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমেদ, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসরোজ দত্ত প্রভৃতি বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুজন ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নবনাট্য ও গণনাট্য আন্দোলনের শিল্পী, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মিবৃন্দ তাঁর বাসভবনে যান। শচীন সেনগুপ্তের শবানুগমনে ও নিমতলা শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, নিলীমা দাস ও লিট্ল থিয়েটারের শিল্পীরা, কালীপদ বসু, চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব কমিটি এবং শান্তি সংসদের নেতৃবৃন্দ, হেমাংগ বিশ্বাস, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা নাট্যকার মন্মথ রায়, নীতীশ মুখার্জি, জীবন গোস্বামী, জহর গাঙ্গুলী, কালীশ মুখার্জি, শান্তি গুপ্ত, গীতিকার শৈলেন রায় ও অন্যান্য বহু সংস্কৃতি-কর্মী, নাট্য ও মঞ্চ শিল্পীরা, নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, মোহিত মৈত্র, উৎপল সেন প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকে এবং বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন।'[১]

শচীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরদিন প্রত্যেকটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বড় আকারে শোকসংবাদ ছাপা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একাধিক নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শেষ সফল নাট্যকারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেদিন বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা যুগের অবসান ঘটল।

---

১. স্বাধীনতা ৬ মার্চ, ১৯৬১

দুই

জীবনবোধ ও জীবনদর্শন, নাটকের ক্ষেত্রে প্রতিফলন

প্রকাশের জন্য আবেগ এবং তজ্জনিত অস্থিরতা প্রতিভার প্রধান লক্ষণ। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনই আবেগতাড়িত। তাঁদের জীবনরসের পাত্রটি কোনদিনই শূন্য থাকেনা, তা বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অনুভূতিটাই হল মুখ্য, জীবনকে রসদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে পারলে সৃষ্টি-ভান্ডার আপনা আপনিই ভরে ওঠে। এজন্য দরকার শুদ্ধ হৃদয়টাকে প্রসারিত করে উন্মুখ হয়ে থাকা। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ব্যক্তি ও নাট্যকার জীবনকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে এই পরম সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের জীবন সহজ সরল পথে কোনদিনই অগ্রসর হয়নি। অথচ তাকে স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এইজন্য জীবনের একটা বড় অংশ কঠোর দারিদ্র্য যন্ত্রণার মধ্যেও মাথা উঁচু করে চলতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। তাঁর স্কুল-জীবনের রাজনীতি পর্ব থেকে সাংবাদিক-জীবন ও পরবর্তী নাট্যকার-জীবনেও এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

শচীন্দ্রনাথের জীবন স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাপের মধ্যে শুরু হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে তিনি সেই বয়সেই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে (বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন) ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ না নেওয়ার সরকারি আদেশের বিরোধিতা করে স্কুল ত্যাগ ও পরবর্তীকালে ন্যাশানাল স্কুলে পড়াশুনো এবং বিপ্লবী কাজের দায়িত্ব নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাংগঠনিক সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে শচীন্দ্রনাথের একটা জীবনাদর্শ ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর জীবনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। এই পর্বগুলি প্রত্যেকটি আকস্মিক-ঘটনাসূত্রে বাঁধা। স্কুলের শিক্ষাজীবন থেকে জাতীয়

আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পর কলেজে পড়াকালে রাজনৈতিক তৎপরতায় আত্মনিয়োগ ও "নারায়ণ" পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লেখার সূত্রে দেশবন্ধুর উৎসাহ পেয়ে সাংবাদিক জীবনে প্রবেশ আর তার বেশ কয়েক বছর বাদে বন্ধুদের আগ্রহে নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ—এ সবই ছিল মানুষের জীবনের সেই রহস্যময় প্রেরণা যার লক্ষ্য হল নিজেকে প্রকাশ করা, নিজের ভাবোপলব্ধিকে কোন একটি শিল্পমাধ্যমে তুলে ধরা।

শচীন্দ্রনাথের সৃষ্ট প্রতিটি নাট্যকর্মে তাঁর রসচেতনা ও জীবনদর্শন সুস্পষ্ট। তিনি নাট্য-আঙ্গিকের পাশাপাশি নাটকের বিষয়বস্তুর উপরও বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তাঁর স্বদেশীচেতনার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় আন্দোলনের আবেগ হতাশা দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপের ছত্রে ছত্রে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে এবং কাহিনীর দ্রুত নাটকীয় উত্থান ও পতনে। একইভাবে সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্তন একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন মানবিক মূল্যবোধ স্ত্রী-স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার কমবেশি প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে।

নাটকের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও জীবনদর্শন আলোচনা করার আগে তাঁর নাট্যকারপূর্ব জীবনে রচিত দুটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়েছিল উপন্যাস রচনার মাধ্যমে। আর সেই উপন্যাস দুটি—চিঠি (১৩২৮-২৯) ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১৩৩০) প্রচলিত হাল্কা বিষয় অবলম্বন করেনি। পাঠকমহলে সমাদৃতও হয়েছিল বলে জানা যায়। এই দুটি উপন্যাসে শচীন্দ্রনাথের যে জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে পরবর্তীকালে নাটকের ক্ষেত্রেও তা লক্ষিত হয়।

চিঠি উপন্যাসের বিষয় ছিল নারীর মুক্তি; সামাজিক ও পারিবারিক দাসত্ব থেকে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। স্নেহ মমতা নিয়ে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে, তবেই হবে সমাজের বুকে তার সত্যিকারের আসন—নারীর এই বিদ্রোহিনীরূপ শচীন্দ্রনাথের বহু সামাজিক নাটকের বিষয়। ঝড়ের রাতে, তটিনীর বিচার, সুপ্রিয়ার কীর্তি, স্বামী-স্ত্রী, প্রভৃতি মঞ্চসফল নাটকে আমরা সেইসব আধুনিকা নারীকে পাই যারা পুরুষের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে চায় না; তারা পুরুষের বুদ্ধি ও চেতনার সমকক্ষ, নাটকে সর্বদা সক্রিয় ও জীবন্ত।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা উপন্যাসে শচীন্দ্রনাথ পল্লীসমাজের সংস্কার ও গ্রামের দরিদ্র শোষিত কৃষকদের প্রতি দেশের যুবকদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। মহাজনের সর্বগ্রাসী সুদের ব্যবসা, জমিদারদের অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে গ্রামের নব্য শিক্ষিত যুবক যুবতীরা পল্লীসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছে। শচীন্দ্রনাথের সংগ্রাম ও শান্তি, দশের দাবী, মাটির মায়া প্রভৃতি নাটকে এই ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাই।

নারীর আত্মজাগরণের কথা প্রগতি চেতনার কথা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শচীন্দ্রনাথের সারাজীবনের নাট্যসাধনায় নারী তার নতুন মূল্যবোধ নিয়ে সর্বত্র দেখা দিয়েছে। সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেও সে প্রণয় বাৎসল্য আদর্শবোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় পুরুষের পায়ে তাল মিলিয়ে চলেছে। স্বদেশী আন্দোলন ও দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর ভূমিকা ভারতবর্ষে কোনদিনই প্রাধান্য লাভ করেনি। এ বিষয়ে গান্ধী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশের মনীষীরা, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সাহিত্যিকেরা দেশের নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার কথা বলেছেন; শচীন্দ্রনাথও ঐতিহাসিক নাটকে একাধিক চরিত্রে নারীকে দেখিয়েছেন পুরুষের পাশাপাশি শক্তি হিসেবে। ক্ষুরধার বুদ্ধিশালিনী তেজস্বিনী অনমনীয় চিত্তের অধিকারিণী নারী প্রেমে বাৎসল্যে করুণায় দেশপ্রেমের মহিমায় কখনো কর্তব্য কঠিন কখনো আত্মদানের গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে। বস্তুত, ঐতিহাসিক নাটকে নারী তাঁর সামাজিক নাটকে অঙ্কিত নারীর চেয়ে অনেক বেশি পরিণত শিল্প-রসোত্তীর্ণ বলিষ্ঠ ও অকৃত্রিম। জিজাবাঈ বীরা শ্যামলী (গৈরিক পতাকা), আলেয়া (সিরাজদ্দৌলা), পান্না শীতলসেনী (ধাত্রীপান্না), মমতাজ (আবুলহাসান) প্রভৃতি নারী চরিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীজাতিকে কেবল উদ্বুদ্ধ করেনি তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের যৌক্তিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঐতিহাসিক নাটকে শচীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন নির্ণয়ের আগে তাঁর উপর পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের প্রভাব আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি গিরিশচন্দ্রের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। উভয়েই সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিলেন। তাঁর গৈরিক পতাকা নাটকখানি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে

উৎসর্গ করে লিখেছেনঃ 'নাটকখানি তাঁর জাতি সংগঠনের প্রয়াসের কথা মনে রাখিয়া তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলাম।' গৈরিকপতাকার ভাববস্তুতে গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী'র (১৯১৪) হুবহু অনুকরণ নেই। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনার প্রসার ও উদারতা এই ঐতিহাসিক নাটকে প্রতিফলিত। ফলে গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে সঙ্কীর্ণতাটুকু দেখা যায়, তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী শচীন্দ্রনাথে তা দূরীভূত হয়েছে। হিন্দু জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার ও হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে শিবাজীর কঠিনব্রত উদ্‌যাপন. একজাতি এক দেশ ভারতবর্ষের স্বপ্ন উভয় নাট্যকারের অঙ্কিত শিবাজী চরিত্রের মূল সুর। 'ছত্রপতি শিবাজী' ও 'গৈরিক পতাকা' ধারী শিবাজী নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধানত, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নারী মাতৃসমা, হিন্দু দেব-দেবী ও মন্দির রক্ষায় কৃতসংকল্প। তথাপি একটু পার্থক্যও আছে। গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি যেখানে অকপট যবনবিদ্বেষী[১] মনোভাব প্রকাশ করেছে গৈরিক পতাকাধারী শিবাজী হিন্দুজাতি ও হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেও বিধর্মীদের প্রতি অনেক নমনীয়. সেখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাই তাঁর সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য।[২] গিরিশচন্দ্রের শিবাজীর এই যবনবিদ্বেষকে একালের কোন কোন নাট্য সমালোচক যেমন সমালোচনা করেছেন,[৩]

---

১. শিবাজী : (ছত্রপতি) 'একবার নয়ন উন্মীলন করে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভূমি বিধর্মীপীড়িত। যে গো-দুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃভূমে সেই গো-হত্যা নিত্য, উদাসভাবে আর কতদিন সহ্য করবেন ? কতদিন আর স্বজাতির দুর্গতি দেখবেন ? কতদিন দেবনিন্দা শুনবেন—কতদিন ধর্মের গ্লানি, প্রতিমাভঙ্গ উপেক্ষা করবেন ?'

২. শিবাজী : (গৈরিক পতাকা) '…দরিদ্র মুসলমান প্রজারা ত উৎপীড়ন করে না, তারা ত—মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালিনী করে, দেশের সকলের জন্য তারা করে স্বার্থ বিসর্জন। ধর্মরাজ্যের অর্থ, সেই রাজ্য, বন্ধুগণ যার প্রজারা জাতিধর্মনির্বিশেষে রাজার সঙ্গে সমান সকল অধিকার ভোগ করতে পারে।'

৩. 'শিবাজীর অসাম্প্রদায়িকতা ইতিহাস সমর্থিত হলেও এবং ত্যাগব্রতের আদর্শে তাঁর সুউন্নত চরিত্র অতুলনীয় হলেও, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তার প্রতিফলন মূলতঃ সাম্প্রদায়িক।' বাংলা ঐতিহাসিক নাটক—শক্তি ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৪১। দ্রঃ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশবছর' নামক গ্রন্থে নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও গিরিশচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ৬৪।

এককালে শচীন্দ্রনাথকেও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 'স্বদেশ' সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণেন্দু ভৌমিক 'গৈরিক পতাকা'র বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ খন্ডন করেছিলেন সেকালের 'সওগাত' পত্রিকায় স্বয়ং বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সমর্থন নিয়ে।

শিবাজী চরিত্রে আধ্যাত্মিকতার ভাব লক্ষিত হয়। গুরু রামদাস স্বামীর নির্দেশে নৃপতি শিবাজী সন্ন্যাস গ্রহণ করে রাজ্য-সিংহাসন দেবতার পায়ে উৎসর্গ করে তাঁরই সেবকরূপে মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি'তে জিজাবাঈ বলছেঃ 'তুমি ভবানীর পুত্র, ভবানীর কার্যে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছো, পুণ্যভূমি উদ্ধারের জন্য।' (১ঃ২) একই প্রতিধ্বনি শুনি 'গৈরিক পতাকা'র তানাজীর কণ্ঠেঃ 'সে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে শিব্বা। ভবানীর শক্তি নিয়ে ধরায় তুমি এসেছো বন্ধু, মায়ের আশীর্বাদ লৌহ কবচের মতোই তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করছে তোমার জয় অনিবার্য।' (১ঃ১)

গৈরিক পতাকায় 'ছত্রপতি'র প্রভাব থাকলেও নাট্য-ভাবাদর্শে শচীন্দ্রনাথ অনেক বেশি প্রগতিশীল, যদিও নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত ইতিহাস নিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন। আসলে শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলি ছিল তাঁর স্বদেশমুক্তি আন্দোলনের হাতিয়ার। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু মুসলমানের মিলনের মধ্য দিয়েই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। জাতি শ্রেণী ও ধর্মের প্রাচীর মানুষের আত্মাকে ক্ষুদ্র ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাকে ভেঙে ফেলার সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রাম। শচীন্দ্রনাথের মানসিকতায় যে বিপ্লবী চেতনা নিহিত আছে তার স্ফুলিঙ্গই ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে আবেগের বহ্নিস্রোত বহিয়ে দিয়েছে। ইতিহাস গৌণ ঐতিহাসিক চেতনাই সত্য—এই ভাবাদর্শেই তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচিত।[৪] আর সেই কারণেই চিরকালের আবেগপ্রবণ বাঙালীজাতি শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের ভাববন্যায় সেদিন ভেসে গিয়েছিল।

শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে নটগুরু গিরিশচন্দ্র রচিত 'সিরাজদ্দৌলা'-র ভাববস্তুতে কিছু মিল দেখা যায়। উভয়েই সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনার উপর ভিত্তি করে নাট্যবস্তুতে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনাদর্শ রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এবং নাটকে নবজাতীয়তাবোধ ও দেশকে

৪. দ্রঃ 'বাঙলার প্রতাপ'—ভূমিকা ঃ শচীন সেনগুপ্ত

পরাধীনতার পাশ থেকে রক্ষা করার সংকল্প উচ্চারিত হয়েছে। তবে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা যত ইতিহাসসম্মত শচীন্দ্রনাথের সিরাজ তা নয়। যদিও গিরিশচন্দ্রের কবিসত্তা এই ঐতিহাসিক নাটকখানিতেও ফুটে উঠে ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও কবিসুলভ ভাবুকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। পাশাপাশি শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলা চরিত্রাঙ্কনে ইতিহাসকে যথাযথ অনুসরণ না করেও নাটকীয় আবেদনে গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। শচীন্দ্রনাথের গোলাম হোসেন সিরাজের একজন বিশ্বস্ত সংগী সুখে দুঃখে সমব্যাথী দেশের মুক্তিকামীদের একজন কিন্তু সে সিরাজকে আচ্ছন্ন করে নাটকে প্রকট হয়ে উঠেনি। অপরদিকে গিরিশচন্দ্রের করিমচাচা সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও চরিত্রটির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে নাটকের অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠেছে। করিমচাচা 'ইতিহাসের ভাষ্যকার', তার সংলাপচাতুর্য তীক্ষ্ন বক্রোক্তি এতই প্রাধান্যলাভ করেছে যে মনে হয় সিরাজদ্দৌলা চরিত্রটি কিছুমাত্র ফুটে উঠলে তার কৃতিত্ব করিমচাচারই।

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা একজন স্থিতধী নবাব, যে ইংরেজদের এদেশ থেকে বহিষ্কার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার যৌবনের উচ্ছৃংখলতা, বে-হিসেবী জীবনযাপন সত্ত্বেও ইংরেজ বিতাড়নের এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় নিয়মবদ্ধ হয়ে তাকে সুমহান গৌরবোজ্জল দেশনায়করূপে গড়ে তুলেছে। শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সিরাজ আবেগে অস্থির, চারিদিকে বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রীদের মাঝখানে পড়ে এক দৈবী অসহায়গ্রস্ত নায়কের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এক করুণ বিষাদে তার জীবননাট্য ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সততই একটা তাৎপর্য দুটি নাটক ঘিরে ভিন্ন সময়ের দুটি ভিন্ন ভাবলোক রচনা করেছে। গিরিশের যুগ এবং শচীন্দ্রনাথের যুগ স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ভাবাদর্শের যুগ। গিরিশের সমকালীন দেশনেতারাও জাতিকে পরাধীনতার শৃংখল উন্মোচনের কথা ভাবছিলেন—সে ভাবনায় ছিল স্থির দৃঢ়তায় নিজেদের প্রস্তুত করা। সেখানে আবেগের স্থান নেই, যুক্তি বিচার ও সিদ্ধান্ত করে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের যুগটা ছিল স্বতন্ত্র। দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদীদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপে, তীব্র আবেগ মন্থনে যে স্বদেশী চেতনার জন্ম দিয়েছিল তাতে যেমন আছে স্বপ্নাচারী আশা তেমনি তার

পাশাপাশি আছে অনিবার্য হতাশা। স্বাদেশিকতার এই দুই যুগধর্ম প্রকাশ পেয়েছে দুই ভিন্ন যুগের 'যুগনাট্যকারে'র নাটকে, আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমসাময়িক স্বদেশী নেতৃবৃন্দের হৃদয়বন্দনা।

শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে ইতিহাস নিষ্ঠার চেয়ে বাঙালীর জাতীয় গৌরবের চেতনাই মুখ্য। একজন সাধারণ মানুষের দোষগুণ ও চারিত্রিক দুর্বলতা আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ও অসহায়তা নিয়ে শচীন্দ্রনাথের সিরাজ কেবল রসিক দর্শকদেরই আকৃষ্ট করেনি সে যুগের স্বাধীনতা সৈনিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রাণেও দোলা জাগিয়েছিল। জনৈক নাট্য ও চিত্র পরিচালক শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের ও নাট্যকারের জনপ্রিয়তার যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন ঃ 'একটা আদর্শ সিরাজ এমনই ভাবে জনচিত্তকে দোলা দিতে পারতো না, একটা রাজনৈতিক কর্মী সিরাজ শিল্পীর দৃষ্টিতে সার্থক হতো না, একটা ঘটনার চমৎকারিত্বপূর্ণ সিরাজদ্দৌলা নাটকে রসোত্তীর্ণ হতে পারতো না। নাট্যরস কোনখানে—এ নাটকে তিনি সেটা সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করে যথাযথ রং-এ ফুটিয়ে তুলেছেন যে রসিক নাট্যকারকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না।'[১] নাট্যকার নাটকের নিবেদন অংশে নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর মতে নাটক ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী নয়। ঘটনার পিছনে যে কারণটি সক্রিয় তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যই ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান।[২] সবশেষে নাট্যকারের পরিষ্কার স্বীকারোক্তি ঃ '......জাতির পক্ষে যা চরম ট্রাজেডি, তাই আমি সিরাজ চরিত্র অবলম্বন করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।'[৩]

শচীন্দ্রনাথের 'রাষ্ট্রবিপ্লব' আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকের কিঞ্চিৎ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও নাটকের ভাববস্তুতে এক বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসৃত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সাজাহান কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই চরিত্রে সুমহান ট্রাজিক সুরই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের নাটকে দারা ও ঔরংগজীবের আদর্শগত দ্বন্দ্বই মুখ্য। সেখানে সাজাহান আদ্যন্ত নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র। নাটকীয়

---

১. রূপমঞ্চ। দশম বর্ষ ১৩৫৮। শ্রাবণ-ভাদ্র। 'শচীন্দ্রনাথ' (প্রবন্ধ) কালীপ্রসাদ ঘোষ।
২. 'সিরাজদ্দৌলা'—ভূমিকা ঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ঊনবিংশ মুদ্রণ ১৩৬৯।
৩. দ্রঃ ঐ

বৃত্তের বাইরে অথর্ব নিয়তিনির্ভর সম্রাট দার্শনিক ঔদাসিন্যে রাজ্য, রাজনীতি ও ক্ষমতার অন্তঃসারশূন্যতাকে উপলব্ধি করেন।[১]

'ঝড় ঝড় হঠাৎ আসেনি জাহান-আরা। ঝড় উঠেছিল সামুগড়ে দিবা-দ্বিপ্রহরে। সন্ধ্যায় আগ্রা দুর্গে হাঁক দিয়ে যায় সেই ঝড়। নিশিথে দিল্লীর পথ বেয়ে এই ঝড়ই তখন তামাম হিন্দুস্তান তোলপাড় করে দেবে, তখন কোথায় থাকবে দারা নাদেরা, কোথায় থাকবে শিপার জহরত, আর কোথায়ই বা থাকবে শাহজাহানের সাম্রাজ্য-সম্পদ।'

দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান কিন্তু প্রথম থেকেই নিষ্ক্রিয় নন। তাঁর নির্বিশেষ পুত্রস্নেহ, একদিকে দারার প্রতি প্রগাঢ় বাৎসল্যপ্রীতি আবার ঔরঙ্গজীবের অসাধারণ ক্রূরতা সত্ত্বেও তার বিজয়ে পুত্রগৌরব উদ্বেল হয়ে ওঠে।

'জাহানারা আমি সাগ্রহে ঔরঙ্গজীবের অপেক্ষা কচ্ছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত পুত্র, আমার লজ্জা—আমার গৌরব…'

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের এক জায়গায় অমিল সুস্পষ্ট। দু'জনেই পাশ্চাত্য নাট্য রচনার আদর্শ অনুসরণ করলেও দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-প্রেমের স্বরূপই আলাদা, সেখানে তিনি দেশ-জাতি-সম্প্রদায় সবকিছু অতিক্রম করে মহাবিশ্বের ঐক্যতানে সূত্রসন্ধান করে চলেছেন। সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলন ও স্বদেশচেতনা তাঁর নাটকে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। এর বিপরীত ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় শচীন্দ্রনাথের নাটকে। কেননা শচীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে যত ঘনিষ্ঠ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ততখানি ছিলেন না। উপরন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে তার অভিমতটিও ছিল জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালীজাতি যখন তরঙ্গায়িত আবেগে আলোড়িত দ্বিজেন্দ্রমানস তখন অন্য পথে অগ্রসর হয়েছে। বিদেশী দ্রব্য বয়কটে স্বদেশী আন্দোলন যখন তুমুল হয়ে উঠেছে, সে সময় তাঁর ধারণা ঃ 'বয়কট দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে। ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেও সম্ভব নয়।' আসলে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রকৃতিটি ছিল স্বতন্ত্র, তাঁর ভাবাদর্শ আত্মোন্নতির পথটিকেই নির্দেশ করে।[২]

১. দ্রঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ৪২৫।
২. 'এদেশ যদি আজ পর প্রসঙ্গ ও বিলাতির বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত আত্মোন্নতি—নিজেদের কল্যাণ সাধনে তৎপর হয় তবে এমন কোন শক্তি নাই যে তাহার সে বলদৃপ্ত গতি রোধ করিতে পারে' (দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পত্রাংশ)
—বাংলা ঐতিহাসিক নাটক। শক্তি ভট্টাচার্য, পৃঃ-১৬২

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সংগে দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণার একটা সুস্পষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। Nationalism in India প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কথাই হলো—'Our problem in India is not political. It is social'. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বিপিনচন্দ্র পাল এবং অনেকে এই প্রবন্ধটির তীব্র সমালোচনা করেন।[১] তেমনি সমকালীন আন্দোলনে বিহ্বলতা প্রকাশ না করে দ্বিজেন্দ্রলালও প্রথমে জাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন; তা না হলে স্বাধীনতাকে লাভ করা অথবা তাকে রক্ষা করা কখনই সম্ভব হবে না। তাঁর অধিকাংশ নাটকে বিশেষ করে 'মেবার পতন' নাটকে এই ভাবটি সুপরিস্ফুট হয়েছে।

অপর দিকে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। এই কারণে তাঁর নাটকের ভাব-প্রকৃতিতে দ্বিজেন্দ্র-লালের নাটকের মিল যত না খুঁজে পাই, নাট্যআঙ্গিক ও রচনা সৌকর্যে তার চেয়ে বেশি মিল দেখা যায়। অর্থাৎ আন্তঃপ্রকৃতির চেয়ে বহিঃপ্রকৃতির মিলই সর্বাধিক।

শচীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রাম প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাতীয় ভাবনা থেকে উদ্ভূত এই স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে দেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করা। তাই দ্বিজেন্দ্র পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকের কাহিনী ও উপ-কাহিনীবৃত্ত নির্মাণে এই জাতীয় প্রেরণাই ছিল উপাদান। ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেম ও নরনারীর ব্যক্তিপ্রেম স্বাধীনতার প্রীতির সংগে এক করার প্রচেষ্টা যা পূর্ববর্তী নাট্যকারদের থেকে পার্থক্য স্পষ্ট করে। ইতিহাস চেতনা গৌণ করার প্রবণতা এতই প্রকট যে ঐতিহাসিক নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য ইতিহাস-রসটিই অনাস্বাদিত থেকে যায়। বিশেষত শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা তাঁর স্বীকারোক্তির মতই প্রাঞ্জল। তিনি তাঁর 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা' গ্রন্থে 'সংগ্রাম ও সংগঠন' শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখেছেন: "স্বদেশী যুগের 'ছত্রপতি শিবাজী'; 'সিরাজদ্দৌলা'; 'মীরকাসিম'; 'প্রতাপাদিত্য'; আর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে 'গৈরিকপতাকা'; 'সিরাজদ্দৌলা'; মীরকাসিম,' 'বাংলার প্রতাপ'

১. সংগ্রামী জনজাগরণে কবির ভূমিকা—শ্রী ক্ষুদিরাম দাস। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (সাপ্তাহিক) রবীন্দ্রসংখ্যা ১৯৮৪।

তুলনা করলে দুই যুগের নাট্যকারদের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য উপলব্ধি হবে। পরবর্তীদের নাটকে একটা সংগঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যা পূর্ববর্তী নাটকে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আরো একটা পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যাবে। তা হচ্ছে দেশ-প্রেমকে স্বাধীনতা-প্রীতিকে, উদীয়মান তরুণতরুণীর প্রেমের ও স্বাধীনতা-প্রীতির সঙ্গে এক করার চেষ্টা করা হয়েছে।...'

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত 'সংগঠনের ইঙ্গিত' শচীন্দ্র-নাটকে ইতিহাসচেতনায় সার্থক হয়ে ওঠেনি, তা সচেতন প্রয়াসে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যে চালিত হয়ে সমসাময়িক জাতীয় প্রয়োজনকে পূর্ণ করেছে। হয়ত এই কারণেই শচীন্দ্রনাথ নিজেকে 'প্রচারধর্মী' নাট্যকার বলে মনে করতেন।

তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতেও ব্যক্ত হয়েছে নাট্যকারের যুগোপযোগী ভাবনা ও চিন্তাধারা। তিনি ব্যক্তিজীবনে ছিলেন খুবই স্পষ্টবাদী। নাটকের ক্ষেত্রেও প্রদর্শন করেছিলেন সত্যকথনের দুঃসাহস যা তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়নি। সামাজিক নাটকের কাহিনী রচনায়ও শচীন্দ্রনাথ নানান বিচিত্র বিষয় অবলম্বন করেছিলেন—সমাজ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অপরাধপ্রবণতা, রাষ্ট্র-রাজনীতি, মানবতাবোধ, শ্রমিক-কৃষক সম্পর্ক, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, সমসাময়িক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, দেশবিভাগ, প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি। তাঁর সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম প্রকাশ রক্তকমল নাটকে। এই নাটকে নারীপুরুষের সম্পর্ক নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার ও নারীর বিদ্রোহ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ও ভাবনা, সে কালের দর্শকদের কাছেও সম্পূর্ণ নতুন।

শচীন্দ্রনাথ ছিলেন গতানুগতিকতার চিরবিরোধী। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও শিক্ষা তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপের মনীষী ও চিন্তাবিদগণের সামাজিক নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ধারণা তাঁকে পরিচালিত করেছে। নাট্যকারদের মধ্যে ইবসেন, জর্জ বার্নার্ড'শ, চেকভ, বিয়র্ণসন প্রভৃতি নাট্যকারের যুগভাবনা শচীন্দ্রনাথকে আন্দোলিত করেছে। কিছু বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদও তিনি নাটকের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন সমসাময়িক প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনকে যথাযথ প্রতিফলিত করতে। বিদেশের আধুনিক নাট্যকারদের অনুসরণ করে তিনিও নাটকে ব্যক্তিচরিত্রের দ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সমস্যার পটভূমিকায় নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর

প্রতিটি সামাজিক নাটকের সমস্যাও ভিন্ন ভিন্ন এবং এরই ভিত্তিতে তিনি চরিত্র রূপায়ণ করেন। সমসাময়িক একটি নাটকের সমালোচনায় শচীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলেছেন ঃ 'নাটকে সমাজ প্রতিফলনের অর্থ এই নয় যে গোটা সমাজ-টাকেই তুলে ধরতে হবে। সমাজে যেসব ঘটনা ঘটে, তার কোন একটা ঘটনা থেকে সিচুয়েশন সৃষ্টি করলেই সমাজ প্রতিফলন হয়। আর সেই সিচুয়েশনের জটিল গ্রন্থিগুলি খুলে ফেলে কোন সত্যের আভাস যদি দেওয়া যায় তাহলে ওই সমাজ প্রতিফলনই নাটক সৃষ্টি করে।'[১]

শচীন্দ্রনাথের স্বাধীনতাপূর্ব নাটকে দর্শকরুচি গভীরভাবে অনুসৃত হলেও নাটকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ছিল অসাধারণ। সমাজ-অর্থনীতি রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজসেবা প্রভৃতি সম্পর্কে নাট্যকারের স্বাধীন চিন্তাভাবনা এই পর্বের কোন কোন সামাজিক নাটকের কাহিনীতে স্থান পেয়েছে যা সমসাময়িক নাট্যকারদের প্রচলিত চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

১৯৩৪ সালে রচিত হরিজন আন্দোলনে উপর লেখা নাটক দশের দাবী-তে শচীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমের এক প্রহসন-রূপ তুলে ধরেছেন। নাট্যকার নিজেই ছিলেন স্বদেশী বিপ্লবী, তাঁর অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ ব্যক্ত হয়েছে এই নাটকে। নাটকের ভূমিকায় বলেছেন—'দুই শ্রেণীর দেশ সেবকের সহিত আমার পরিচয় আছে। এক ঃ যাঁহারা সত্য সত্যই দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। আর দুই ঃ যাঁহারা স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঝান্ডা উঁচাইয়া আগাইয়া যান, কিন্তু ফ্যাসাদ দেখলেই ঠান্ডা হইয়া পড়েন। প্রথম শ্রেণীর দেশ-সেবকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নাই।'

সমাজের উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণী যারা সংখ্যায় বেশি অথচ দুর্বল, শিক্ষাদীক্ষা-হীন, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্‌কালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাদের বাহুবল এবং সক্রিয় সমর্থন লাভের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গান্ধীজী প্রবর্তিত চরকা খাদি গ্রামসেবা এবং অবহেলিত শ্রেণীর ভালো করার 'সদিচ্ছা' নিয়ে সে সময় একটা সৌখিন প্রচেষ্টাও শুরু হয়। একে উপলক্ষ করে উচ্চশ্রেণীর নব্য যুবক যুবতীদের বেশ সময়কাটানো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ ঘটে গেল। তাদের বুকে ঘৃণা ও উপেক্ষা আর মুখে দয়া-দাক্ষিণ্য অন্ত্যজ নর-

১. সমসাময়িক নাটকের সমালোচনা—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রূপমঞ্চ, জুন-জুলাই ১৯৫১।

নারীদের কাছে তাদের জাহির করা প্রগতিশীলতা তাই হাস্যকর হয়ে যায়। দশের দাবী নাটকের এই বিষয় ও ভাবনা নাট্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল।

নাট্যকার এই নাটকে নকল সমাজসেবীদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন, যাদের কাছে সমাজসেবার নাম তিন মাইল রাস্তা ঝাঁট দেওয়া। সমাজসেবার কথায় গ্রামের লোকদের কাছে আড়ম্বর দেখানো। তাদের স্নান খাওয়াদাওয়া আয়াসের প্রতি সতর্ক অভিনিবেশ যুবক যুবতীদের প্রেম মন-দেওয়ানেওয়ার খেলা খেলবার অবকাশ লাভ করা—এর মধ্যে আর যাহোক দেশপ্রেম অথবা মানবপ্রেম বলে কিছুই নেই, তা সৌখিন মজদুরিরই নামান্তর।

আদিবাসী ও অন্ত্যজদের সদার যখন বলে: 'বাবু ওদের ঘরে তুদের থাকতে হবেক।' তখন তাদের মুখ শুকিয়ে যায়। তাদের সমাজসংস্কার, 'ছোটলোকদের' ভাল করার ইচ্ছা সব মাথায় ওঠে। তারা ঘরমুখী হয়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এই নাটকখানি সম্পর্কে প্রশংসামুখর ছিলেন। কখনো কখনো নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিলেতে অভিনয় করার ইচ্ছাও প্রকাশ করতেন।[১] তিনি নিজে নাটকটির প্রযোজনায় ও অভিনয়ে ছিলেন। যদিও এ নাটক বেশি দিন চলেনি। দর্শকেরা এর কাহিনী বিষয়ে আকৃষ্ট হয়নি।

তথাপি ১৯৩৪ সালের রংগালয় জগতে সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রগতিশীল বিষয়বস্তু ও সত্য কথনের দুঃসাহসিকতা একান্তই বিরল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা বিবেকানন্দের সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ কিছু মানুষ সত্য সত্যই সেদিন উপেক্ষিত শ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল; সংখ্যায় নগণ্য হলেও নাট্যকারের দৃষ্টি তা অতিক্রম করে যায়নি। অনেক দুঃখ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দু-একজন অবহেলিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ঘরের আত্মীয় হয়ে যেতে পেরেছিল। দয়াল অমরেশ নন্দিনী এই ধরনের চরিত্র। শেষপর্যন্ত এ নাটকে নাট্যকার যে চরম ও প্রকৃত বাস্তব সত্যটা তুলে ধরেছেন এবং আজকের দিনে দেশে দেশে শোষিত বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর যে সুদূরপ্রসারী অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নাট্যকার স্মরণ করিয়ে দেন, শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্য থেকেই তাদের মুক্তিযজ্ঞের নেতৃত্ব

১. বাংলার নাটক ও নাট্যশালা। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। দ্রষ্টব্য: 'ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' শীর্ষক অধ্যায়।

গড়ে তুলতে হবে। তাদের গভীর দুঃখের শরিক যে জন সেই হবে তাদের মুক্তিপথের কান্ডারী। অন্যথায় স্বদেশ সেবার নামে আড়ম্বর দেখানো অথবা অন্তরস্পর্শহীন দয়াদাক্ষিণ্য পরিণামে বিপদই ডেকে আনে। তাই নন্দিনী আর অমরেশের আবেগকে স্তব্ধ করে দয়াল বলে ওঠে ঃ'...ফিরে যাও ভাই, ফিরে যাও দেবী, অনুকম্পার আবেগ দিয়ে, করুণার বারি বর্ষণে পতিতের পরিত্রাণ হয় না। তাতে গণদেবতা অপমানিত হন, ক্রুদ্ধ হন, প্রতিশোধ নেবার জন্য দিকে দিকে প্রলয়ের আগুন জ্বলে ওঠে।'

সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ 'অতি আধুনিক' নরনারীকে সমাজ সমস্যার পটভূমিতে যেভাবে রূপায়িত করেছেন তাতে নাট্যকারের নাগরিক মনন-শীলতারই পরিচয় বহন করে। জীবনের প্রথম পর্বে তিনি বঙ্গরঙ্গালয়কে সজীব ও সচল রাখার উদ্দেশ্যে নাটক রচনার ক্ষেত্রে যে দর্শকরুচি অনুসরণ করেছিলেন, তাতে নাট্যসাহিত্যের রস ক্ষুণ্ণ হলেও মঞ্চসাফল্য ছিল তর্কাতীত।

তবে তিনি শুধু মঞ্চ সফল নাট্যকারই ছিলেন না, কিছু নাটকের সাহিত্য-মূল্যেও তিনি অমর হয়ে আছেন। শেষ পর্বের নাটকগুলি ছাড়া কিছু ঐতিহাসিক নাটকও তাঁর সেই প্রতিভার পরিচয় বহন করে। শেষ পর্বের কালোটাকা, এই স্বাধীনতা, সবার উপরে মানুষ সত্য প্রভৃতি নাটকে তাঁর মৌলিক নাট্যপ্রতিভা ছাড়া সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

যুগ পরিবর্তনের নিয়মকে শচীন্দ্রনাথ অনেক আগেই শিল্পীর দূরদর্শিতার সাহায্যে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা' গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন ঃ 'বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বাংলা নাটক সব সময়ে কেবলই যে যুগের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে এসেছে তা নয়, অনাগতের আভাসও দিয়েছে এবং সব সময়েই মানবতার জয়গানই গেয়েছে।' নাট্যকারের এই উক্তি নিজের পক্ষে এতই সুপ্রযোজ্য যে তার প্রমাণ তিনি স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে নাটকের কাহিনী ও বিষয়বস্তুতে সমাজ অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায় নীতি ও সংস্কার সম্পর্কে 'নতুন' কথা বলতে পেরেছেন।

তাঁর 'মাটির মায়া' 'কালোটাকা' প্রভৃতিতে সমাজতান্ত্রিক ধারণার স্পর্শ কিছু রয়েছে। মাটির মায়া (১৯৪৩) নাটকে মাটি ও মেশিনের মধ্যে যে যুগদন্দ্ব আছে নাট্যকার তাকে উপস্থিত করেছেন। কৃষক কিভাবে শ্রমিকে

রূপান্তরিত হচ্ছে, কৃষকের শান্তির নীড় গ্রাম্যস্নিগ্ধতা আন্তরিকতা ও ভালবাসার বন্ধন হারিয়ে ক্রমশ শ্রমিকের হাড়ভাঙা খাটুনি, মেশিনের নির্মমতায় মালিকের মুনাফার জাঁতাকলে কি ভাবে তারা আস্তে আস্তে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও সংস্কার হারিয়ে সর্বহারার চেতনায় উন্নীত হচ্ছে নাটকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তেমনি কালোটাকা (১৯৪৮) নাটকেও ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। 'যেদিন বঞ্চনা থাকবে না, শোষণ থাকবে না, অনাহারে কেউ মরবে না'—এমন দিনের স্বপ্ন উচ্চারিত হয়েছে নাটকের উপসংহারে। কালোবাজারী মুনাফাখোর অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যে নারী প্রতিবাদস্বরূপ, আসামী কালোবাজারী স্বামীকে জেলে বিদায় জানিয়ে সে (বিজয়া) বলছে ঃ 'সেইদিনের অপেক্ষাতেই আমি বসে থাকব। দেশ ততদিনে স্বাধীন হবে।... সেদিন সমাজে বঞ্চনা থাকবে না, শক্তিমানরা দুর্বলদের শোষণ করে সম্পদ জমিয়ে তোলবার সুযোগ পাবে না। সেদিন একটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটলে সারা দেশ কেঁদে উঠবে, একটি শিশু শুকিয়ে মায়ের কোল থেকে ঝরে গেলে সমগ্র রাষ্ট্র টলমল করবে। ভাববেন না আপনাকে একটা কাহিনী শোনালাম, স্বপ্নে-দেখা কোন ছবি ভাষা দিয়ে এঁকে তুল্লাম। এ কাহিনী নয়, এ স্বপ্নও নয়। সত্যিই সেদিন আগত।...'

প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে শচীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব কিছু থাকা সম্ভব। পথেরদাবী, শ্রীকান্ত ২য় ও ৩য় পর্ব, বিপ্রদাস প্রভৃতি উপন্যাসে শ্রমিক চেতনার উপাদান রয়েছে। যেমন কৃষকের শ্রমিকে রূপান্তর 'মহেশ' ছোটগল্পের কাহিনী বিষয়। পরাধীন দেশের গ্লানি জাতীয়তাবোধ সামাজিক কুসংস্কার উচ্চনীচ ভেদাভেদ বঞ্চনা শোষণ সর্বোপরি গভীর মানবপ্রেম শরৎ-উপন্যাসে যে ভাবে ফুটে উঠেছে, তার ভাষা প্রকাশভঙ্গি ও ভাবনার সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের কিছু নাটকে স্পষ্ট মিল দেখা যায়। এছাড়া স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে শচীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য শরৎ-উপন্যাসে স্কুল-কলেজীয় শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নারীই কেবল নয় নিরক্ষর প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন এবং সমাজের উচ্চনীচ সকল স্তরের নারীদের মুখে চিন্তা ও বাকস্বাধীনতা দিয়েছেন। তেমনি শচীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক সকল নাটকে নারীকে স্বাধীন এবং অবাধ মতপ্রকাশের অধিকারিণী করে অঙ্কিত

করেছেন, অবশ্য তারা প্রায় সকলেই অত্যাধুনিকা এবং অভিজাত ঘরের সুশিক্ষিতা নারী। নারীর সতীত্ব ও নারীত্ব এই দুয়ের মধ্যে কোনটি বড় এ প্রশ্নের মীমাংসা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যেমন দেখিয়েছেন তেমনি শচীন্দ্রনাথের জননী, এই স্বাধীনতা, কালোটাকা, ঝড়ের রাতে প্রভৃতি নাটকে সতীত্ব ও নারীত্বের দ্বন্দ্বে নারীর স্বাধীন সত্তাই জয়ী হয়েছে। নারীকে তিনি পুরুষের পদতলে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে রাখেননি অথবা পতি পরমদেবতা-র নৈবেদ্য রচনায় জাগতিক সুখ ও আনন্দকে বিসর্জন দিতে দেননি। ঝড়ের রাতে নাটকের নায়িকা বিজলী তাই অনায়াসে স্ত্রী স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করে বলে ঃ '… স্টীয়ারিং হুইল আয়ত্বে আনবার কৌশল যে নারী অর্জন করে, স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবনের পথ বেয়ে কেবল সেই যেতে পারে, তাই সকলেরই উচিত ও কাজটি অভ্যাস করা।' অথবা '…স্থাবরের স্থিতিশীলতা নিয়ে পচবার গলবার চেয়ে, গতির আনন্দ উপভোগ করতে করতে মরা ঢের ঢের ভালো।'

এই স্বাধীনতা (১৯৪৯) নাটকে পূর্ববাঙলার উদ্বাস্তু সমস্যা, হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয়, সামাজিক সংস্কারের ঘাত প্রতিঘাতে শচীন্দ্রনাথের চিন্তা-ধারার আর এক রূপ ফুটে উঠেছে। এটিকে রাজনৈতিক নাটক বলা যায়। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববাঙলার হিন্দু উদ্বাস্তুদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ফুটে উঠেছে এতে। রাজনীতি যে নাটকের বিষয় হয়ে উঠতে পারে শচীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কেও ছিলেন অবহিত। তাঁর পরিষ্কার স্বীকারোক্তি ঃ 'আজ যখন রাজনীতি মানুষের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার আয়ত্ত করে নিয়েছে, তখন নাটক আর নাট্যশালা তা বর্জন করে চলতে চাইলে পিছনেই পড়ে থাকবে। আজকার রাজনীতি রাজার নীতি নয় রাষ্ট্রের নীতি! আর রাষ্ট্রের নীতি হচ্ছে মানবতার বিকাশ, মানুষের প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র মানুষের উন্নয়ন। এ নাটকেরও কাজ তাই সাহিত্যেরই কাজ তাই।…'[১]

এই সময় তিনি সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তখনও তিনি চীন (১৯৫৩) রাশিয়া (১৯৫৫) রুমানিয়ায় সাংস্কৃতিক সফর করেননি। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা ও দেশী বিদেশী সাহিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তা ধারার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে,

১. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাংলা নাটক ও নাট্যশালা গ্রন্থের 'যুগান্তরের সূচনা' নামক প্রবন্ধ।

চীন রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পরিভ্রমণের পর তিনি পূর্ণ সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ না করে বিশ্বমানবতার প্রতি, অহিংসা-সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন তার উদাহরণ 'সবার উপর মানুষ সত্য' (১৯৫৬) নামক সর্বশেষ রচিত নাটকখানি।

পানামা খালকে কেন্দ্র করে মিশরের ওপর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নির্লজ্জ, নগ্ন আক্রমণের বীভৎস ঘটনাকে উপলক্ষ করে এই নাটক রচিত। মানুষ আজ সভ্যতার সংকটে উপনীত। চারিদিকে যুদ্ধের দামামা। মানবতা প্রেম শান্তি আজ অনিশ্চয়তার গর্ভে। তবু মানুষের পৃথিবীতে সভ্যতার এই চরম সন্ধিক্ষণে একমাত্র মানুষই পারে মনুষ্যত্বের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পরিণাম থেকে রক্ষা করতে। নাটকের নায়িকা তরুণী সুপ্রভার মনে অজস্র প্রশ্ন ভিড় করে আসে। অতীত ইতিহাসের যবনিকা সরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায় সাম্রাজ্যলোভী যুদ্ধবাজ শাসক সিজার, হানিবল, কনস্তান্তিন, ধর্মীয় প্রচারক যাজক সেইন্টপল, অতৃপ্ত কামনাময়ী ক্লিওপেত্রা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কার্লমার্কস আর বাংলাদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীচৈতন্য। নাটকের দৃশ্যপট রচিত অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের রূপরেখায়। বিপ্লবী সাংবাদিক ও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মানস ও জীবনদর্শন উপলব্ধির পক্ষে নাটকটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নাটকের প্রতিটি চরিত্র যেন এক একটি প্রতীকের আশ্রয়ে নির্মিত। মানব-কল্যাণ, সমাজ-রাষ্ট্র প্রণয়, ধর্মীয় চেতনা সর্বোপরি মানুষের মুক্তি সম্পর্কে নাট্যকারের সারা জীবনের চিন্তা ভাবনার ফসল এই নাটকে রূপ পরিগ্রহ করেছে যা আত্মানুভূতিকে প্রতীক কল্পনার সাহায্যে ও রহস্য-সাহিত্যের আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই নাটকে। শচীন্দ্রমননকে বুঝতে গেলে এই নাটকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের নরনারীর প্রশ্নোত্তর মানবজীবনের মূল সমস্যাগুলির বিতর্কে পাঠককেও অংশ নিতে হবে। নাটকের প্রধান চরিত্র প্রস্তর নির্মিত নরসিংহ (Sphinx)। নাটকের পরিসমাপ্তিতে তার শেষ সংলাপে নিহিত নাটকের ভাববস্তু '······মানুষ আজও মানুষ হয়নি বলেই আমার সারাটা দেহ এখনো পশু-দেহ রয়েছে, ক্রাইষ্ট এখনো ক্রুশে ঝুলছেন, বুদ্ধের মূর্তি পাহাড়ে কাননে পাষাণ হয়ে দিবস গণনা করছে। মানুষে মানুষে পরম প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে যেদিন, সেইদিনই হবে আমার মুক্তি, খ্রীস্টের মুক্তি, বুদ্ধের

মুক্তি যার অর্থ মানুষের মুক্তি।'

দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকার দেখেছেন মানুষের প্রতি মানুষের পাশবিক ও অমানবিক ব্যবহার; দেখেছেন হিংসা বিদ্বেষে উন্মত্ত পৃথিবীর সভ্য মানুষ পরস্পর আত্মহনন ও আত্মকোলাহলে নিঃশেষিত হচ্ছে; জাতিতে জাতিতে, উচ্চনীচ ভেদাভেদে মানবাত্মার চরম অপমান প্রতিনিয়ত কিভাবে ঘটে চলেছে। সামাজিক নাটকের নানাস্থানে শচীন্দ্রনাথ এই নিপীড়িত মানবাত্মার পক্ষাবলম্বন করেছেন। শেষ পর্বের সামাজিক নাটকগুলিতে তারই অভিব্যক্তি; সবার উপর মানুষ সত্য নাটকে সেই ভাবেরই গভীর ব্যঞ্জনাদীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে। ঐতিহাসিক নাটক আবুলহাসান ধাত্রীপান্নায়, সামাজিক নাটক মাটির মায়া, কালোটাকা, এই স্বাধীনতা প্রভৃতিতে শচীন্দ্রনাথ মানবতারই জয়গান করেছেন।

নাটকের বিষয় ও ভাববস্তুতে নাট্যকারের চেতনলোকের প্রতিফলন ঘটে। শচীন্দ্র-নাটকের আলোচনা কালে তাঁর মনন রসচেতনা ও জীবনদর্শন আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। শচীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত মানবতার পূজারী: এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনিবার্য প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত নন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ্বমানবতার আদর্শও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন স্বদেশী—স্বাধীনতার সৈনিক, আবার সাংবাদিক জীবনে বিদ্রোহী কল্লোল-গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, যেমন অস্তমিত নাট্যকার-জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পেছনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির স্মৃতি বুকে রেখেও চল্লিশের গণনাট্য আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিজন ভট্টাচার্য তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ নতুন দিনের নবীন নাট্যকারদের নিঃসঙ্কোচে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বহুরূপী প্রমুখ অপেশাদার নাট্যসংস্থার পাশে দাঁড়িয়ে নাটকের ক্ষেত্রে তাঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন পেশাদারী মঞ্চের যুগ শেষ, নাটক এখন অপেশাদারীদের হাতে নতুনরূপে উদ্ভাসিত হবে। পেশাদারী মঞ্চের শেষ জনপ্রিয় নাট্যকার শচীন্দ্র-নাথের এতে কোন ক্ষোভ ছিল না, তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিই ভবিষ্যৎ নাট্যআন্দোলন গড়ে তুলবে, ফলে বঙ্গরঙ্গজগতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

তিনি জবানবন্দী (১৯৪৪) নাটকের অভিনয় দেখে তাই মুক্ত নিরপেক্ষ মন্তব্য করেনঃ 'রচনা, প্রযোজনা ও অভিনয়ে এঁরা নতুন দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা যত বেশী প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করবেন, থিয়েটারে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউশন হওয়ার পথে তত এগিয়ে যাবে।'[১]

পরবর্তীকালে (১৯৫২ ?) তিনি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংস্থা সারাভারত গণনাট্য সংঘের কোষাধ্যক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি হিসাবে দীর্ঘ পাঁচ বছরের ও বেশি সময় কৃতিত্বের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি কি পরিমাণ 'কম্যুনিস্ট' ভাবাপন্ন ছিলেন তা বিতর্কের বিষয়। কেননা তিনি প্রধানত মানবতাবাদী সেই সঙ্গে প্রগতিশীলও বটে—কখনই পুরাতনকে শাশ্বত মনে করে আঁকড়ে ধরে থাকেননি। জীবনের শেষ পর্বে এসেও তাই নতুনের জয়গান করেছেন। অগ্রজের দায়িত্ব ও ভালবাসা নিয়ে তার ভালমন্দ বিচার করেছেন; নবীন নাট্যকারের হাতে তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল তুলে দিয়েছেন। অনেক পত্রপত্রিকা তাঁর এই উদারতা, নবীনের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং তাঁর প্রতি নবীনদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে তীর্যক চোখে দেখতেন।

এই সময় 'নবান্ন' (অক্টোবর, ১৯৪৪) অভিনয়ে বাংলা নাট্যজগতে একটা বড় রকমের আলোড়ন ওঠে। নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকে অভিনয় ও মঞ্চরীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটা দিক উন্মুক্ত হল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এটা একটা বড় আঘাত হয়ে দেখা দিল। মঞ্চমালিক পেশাদার শিল্পীগোষ্ঠী ও পুরাতনপন্থীরা গণনাট্য-শিল্পীদের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ চালালেন। নবান্ন অভিনয়ের জন্য তখন শহরে কোন মঞ্চই আর ভাড়া পাওয়া যায় না। এই নতুন ধরনের নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে তাঁরা নিজেদের অক্ষমতায় আরো বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।[২] শচীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন নবীনদের পক্ষে। তাঁদের

১. সংস্কৃতির প্রগতি। সুধী প্রধান, পৃঃ ১৮২ (নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে)।

২. ...গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী অ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্য-জগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায় না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গিয়েছেন।...'

(লেখকের কথা/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১০২)

হয়ে কলম ধরলেন তিনি। গণনাট্য সংঘের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন এবং নাট্যজগতের এই নতুন ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা অনেকের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। তৎকালীন 'নাট্য ভারতীর' নাট্য সাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় পর্বের সম্পাদকীয়তে এক দীর্ঘ বক্তব্যের কিয়দংশ উল্লেখ করা যেতে পারে '……সম্প্রতি কলিকাতা শহরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীবৃন্দের উদ্যোগে যে গণনাট্য সংঘ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে শচীন্দ্রবাবু তাহাদের ওকালতী করিতেই যে সাময়িক পত্রের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা তিনি দরজা গলায় আবেদন জানাইয়াছেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে"—এই থিয়েটারের পরিকল্পনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা সমাজের যে স্তরকে রিপ্রেজেন্ট করতে চান, নিজেরা সেই স্তরের লোক না হলেও তাদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতিসম্পন্ন বলেই একথা বলা যায় যে, তাদের এই থিয়েটার গণনাট্যের প্রকৃত আসর হয়ে উঠে ভবিষ্যতে একদিন শ্রেণীর সংগে শ্রেণীর সেতু রচনা করে বাঞ্ছিত ঐক্য এনে দেবার সহায়তা করবে। এই কারণে পিপল্‌স্ থিয়েটারকে শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করে নেওয়া প্রত্যেক প্রগতিশীলের কর্তব্য।" —শচীনবাবু যখন কলিকাতার পাবলিক থিয়েটারগুলির চিহ্নিত অভিজ্ঞ নাট্যকার, তখন নাট্যজগতের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার তাঁহার রীতিমত অধিকারও আছে মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এদেশে গান্ধিজী হইতে তোতাবনী এবং ও দেশের হিটলার-মুসোলিনী-তোজো কোম্পানী প্রমুখ মহাপুরুষগণ তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলির এমনিই হাঁড়ির হাল করিয়া ছাড়িয়াছেন যে, কোন ভদ্রলোক ও বস্তুটির উপর আস্থা রাখিতে পারে না……'[১]

বর্তমান যুগের দিকে তাকিয়ে আজ নিঃসংশয়ে বলা চলে তথাকথিত সমালোচকদের অসারত্ব প্রমাণ করে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতাই জয়ী হয়েছে। উপরের সমালোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল তিনি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এবং আশেপাশের হিতৈষী ও অনুরাগীদের উপেক্ষা করেও নিজের সত্যোপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। শচীন্দ্রনাথের এই তেজস্বিতাকে তাঁর সমসাময়িক রংগজগতের অনেকে ভয় পেতেন এবং অহঙ্কারী বলে যেমন নিন্দা করতেন আবার নাট্যচর্চা এবং নাটক সম্পর্কে তাঁর পান্ডিত্যকে শ্রদ্ধাও করতেন। সেকালে একদিকে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার অপর

১. 'নাট্যভারতী'র নাট্য সাহিত্য গ্রন্থমালা (২য় পর্ব) ১৯৪৫ সাল, এপ্রিল।

দিকে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়কে তাঁদের মনীষা ও পান্ডিত্যের সাহায্যে পরিপুষ্ট করেছিলেন। এই দুই মনীষী ব্যক্তিগত জীবনেও একে অপরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তবে উভয়ের নাটকের ক্ষেত্রে জীবনদর্শন ছিল ভিন্নমুখী।

শিশির ভাদুড়ী ছিলেন সাহিত্যের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের পূজারী। মানুষের অন্তর্লোকের রহস্য, ও সৃষ্টির সৌরভে বিকশিত সেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ অসাধারণ। কিন্তু সমসাময়িক দেশ ও সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার প্রতি ছিলেন উদাসীন।[১] অপরদিকে শচীন্দ্রনাথ ট্রাডিশনকে গ্রহণ করেও পরিবর্তিত সময়ের তালে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেকারণে নাটক ও রঙ্গালয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা যুগকে অনুসরণ করেছে। নাট্যশালা ও নাটকের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন ঃ 'নাট্যশালাকে যাঁরা নিছক রঙ্গালয় করে রাখতে চান, তাঁরা নাট্যশালার হিতৈষী নন, সংস্কৃতি সম্বন্ধেও সচেতন নন। নিছক রঙ্গ পরিবেশনে আত্মনিয়োগ করলে নাট্যশালা অবনত হয়ে অবলুপ্ত হবেই। বাংলা নাট্যশালা তার সৃষ্টিকাল থেকে জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে যোগ রেখেই অগ্রসর হয়েছে। যাকে বলে social significance নাট্যশালার নাটকে তার নানা পরিচয় রয়েছে।'[২]

শিল্পের উদ্দেশ্য যে নিছক আনন্দ ও শিল্পরস পরিবেশন করা নয় দেশ ও জাতির প্রতি তার নৈতিক দায়িত্ব আছে শচীন্দ্রনাথ তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। নিজেকে তিনি বার্নাড শ'য়ের মত প্রচারধর্মী নাট্যকার বলেই মনে

১. 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও বাংলার সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ নাট্যাচার্যের রিহার্সাল পরিচালনা ও নাটক প্রযোজনার ভূয়সী প্রশংসা করেও একস্থানে লিখেছেন ঃ 'বিস্ময়ের কথা এই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও দেশপ্রীতি থাকা সত্ত্বেও সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে একমাত্র আমার 'দেশের দাবী' পূর্ণাঙ্গ নাটক ছাড়া কোন নাটক তিনি অভিনয় করেননি।'

শারদীয়া রূপমঞ্চ/ঊনবিংশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৫৯

২. শারদীয়া রূপমঞ্চ, ১৩৬১ চতুর্দশ বার্ষিকী, আশ্বিন-কার্তিক।

করতেন।[১] অবশ্য বার্নাড শ'য়ের নৈতিক ধারণার সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না।

শেষ জীবনে শচীন্দ্রনাথ শিল্পের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও স্বাধীন মত ব্যক্ত করে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষই শিল্পের প্রকৃত ধারক ও বাহক। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবেতিহাসের অধ্যায় উন্মোচন করে তিনি দেখালেন, অসাধারণত্ব প্রমাণের জন্য কিছু মানুষ সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত লোকশিল্প থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কৃত্রিম শিল্প রচনা করে থাকেন ঃ 'A handful of people tore themselves away from the vast masses of the people and turned uncommon. In order to establish their uncommonness they robbed art of the native spontaneity of the common man and made art artificial.'[২]

সুতরাং শিল্পীর সৃষ্টি তখনই সার্থক যখন তাঁর শিল্পে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ ও সংগ্রামের কথা রূপায়িত হয়। সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে শিল্পের প্রাঙ্গণে, তাদের স্পর্শ ছাড়া শিল্প শাশ্বত হবে না। "All art belongs to the Common man" নামক একটি বক্তৃতা সংকলনে এ বিষয়ে শচীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিমত ঃ '……To day, everyone the artist, the literateur, the Philosopher, the Scientist, the progressive politician —eveyone has learnt that it is only the Common man who can keep the lamp burning. Art, Literature, Philosophy, Science and everything besides, may only remain alive at the touch of the

১. '…আমি আযৌবন প্রচারধর্মী নাটক লিখে এসেছি। পরবশতার দিনে সে-সব নাটক কেমন ফলপ্রদ হয়েছে তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। চীনে গিয়ে দেখে এসেছি সমগ্র জাতিকে সংগঠনের কি বিস্ময়কর শক্তির যোগান দিচ্ছে সংগীত নৃত্য ও নাটক। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি আজকার দিনে নৃত্যকে ও নাটককে সংগঠনের কাজে নিয়োগ করবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।' —শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শারদীয়া 'রূপমঞ্চ' ১৩৬১ চতুর্দশবার্ষিকী, আশ্বিন-কার্তিক।

দ্রঃ "All the highest literature is journalism ……And so let other what they call literature, journalism for me". (The Art of Barnard Show 'The sanity of Art' P-3)

2. A speech delivered by Sachin Sengupta at a reception to Prithwiraj Kapoor at the Purabi Cinema, Calcutta, on January 9,1952. ('Unity' April—2-6)

hand of the Common man. This truth has learnt by all at a heavy cost.'

শচীন্দ্রনাথ যুগের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। এর মূলে ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও মনীষা—সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে এটাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কালে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছেন : '……তিনি নাট্য-সাহিত্যের সাধনার সঙ্গে তাঁর নিজের আত্মিক সাধনাকে সমগতিতে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তি যেমন সমাদরের সামগ্রী, তিনি নিজে স্বকীয় মনুষ্যত্বের জন্য তেমনি শ্রদ্ধার পাত্র। ……সত্যভাষী শচীন্দ্রনাথকে দরদী শচীন্দ্রনাথকে আমি শ্রদ্ধা করি--প্রণাম জানাই।'[১]

আবেগের সঙ্গে মননের ও সংগ্রামী চেতনার যোগ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটক-কারদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথের মত আর দেখা যায়নি। একই সঙ্গে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার উন্নতি, নাট্যশালাকে গণচেতনার পীঠস্থান করে গড়ে তুলতে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তাঁর শেষ বয়সের নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধনিবন্ধে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে একটা সংযোগসাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে ট্রাডিশনে বিশ্বাসী ছিলেন। পুরাতনকে ত্যাগ না করে, তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন না করে বরং কালের ও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতনের যথাযথ মূল্য নিরূপণ করলে সেই অভিজ্ঞতায় নতুনের যাত্রাপথ সুগম হবে বলে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল।[২] এই সময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তৎকালীন চলতি নাটকের যে সব সমালোচনা করেছেন, সেখানে কোন সংকীর্ণতা ও অহেতুক

১. শিল্পী ও সাধক—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপমঞ্চ, শ্রাবণ—ভাদ্র (১৩৫৮)।

২. সমসাময়িক বিখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে শচীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি করেন— 'পুরোনোর ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমানের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ভবিষ্যতের পথ তৈরী করবে জগতের এইত রীতি। …নূতনের আকর্ষণ তীব্র হয় কিন্তু যদি খুঁটি শক্ত না হয় তাহলে ম্লান হয়ে যেতে বাধ্য। নবনাট্য আন্দোলন প্রারম্ভে যে ঢেউ তুলেছিলেন তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি আকর্ষণীয়। …নতুন কথা, নতুন রূপ, নতুন ধারা নতুন ধরনের উচ্চাঙ্গের অভিনয়—তা ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে—উপযুক্ত বাহনকে আশ্রয় করতে না পেরে ক্রমশ শুকিয়ে উঠলো…।' (শৌভনিক নাট্যোৎসব স্মারক সংখ্যা, সম্পাদক-দেবাশিস দাশগুপ্ত)।

গোঁড়ামির পরিচয় দেখা যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় শোক প্রকাশে যথার্থই বলা হয়েছে ঃ '……তিনি জাতীয় ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সমাজ সম্পর্কে তিনি উদারনীতিক সংস্কারকের মানবতাবোধ ও সহানুভূতির দ্বারা অনুভাবিত ছিলেন। বাংলার নাট্যকলায় নূতন আগ্রহের অভ্যুদয় লক্ষ্য করিয়া তিনি খুশী হইয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের উন্নতি, অভিনয়ের মান উন্নয়ন এবং নাটকের প্রযোজনা ও পরিবেশনের পদ্ধতিতে নূতনত্বের পরীক্ষা তাঁহার বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল।'[১]

শেষ জীবনে দারিদ্র্য হতাশা তাঁকে আচ্ছন্ন করলেও নতুন দিনের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানিয়ে তাকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সংকীর্ণতার মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করেনি। নবীন নাট্যকারদের ভালবেসে অগ্রজের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাই তিনি দান করতে চেয়েছেন। তাদের ত্রুটি এবং ভুলপথ সম্পর্কে সচেতন করেছেন বারবার। কিন্তু সময় বড়ই নিষ্ঠুর। তারুণ্যের গতি পুরাতনকে চিরদিন পাশ কাটিয়ে চলে। তার চেয়ে বড় কথা, দেশ জাতি ও তার শিল্পকলা—ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার সর্বনাশা প্রবণতা শচীন্দ্রনাথকে দারুণভাবে আঘাত করেছিল। আপাত কঠোর আদর্শনিষ্ঠ এই মানুষটির প্রজ্ঞা ও অনুভূতি কত গভীর ছিল তা বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। একস্থানে তিনি লিখেছেন ঃ '…… যাঁরা নতুন শ্লেটে আঁক কষবার ভুল উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা জেনে বুঝে জাতির ক্ষতি করছেন।…যে নাট্যশালাগুলি জন্ম পেল বাঙলার নাট্য ঐতিহ্য গড়ে উঠবার ফলে, তারাই ট্রাডিশনাল নাটকের অভিনয় করে না ; সৌখীন দলরাও নয়। কয়েকবছর পরে বাংলার লোক জানবেওনা যে বাংলার একটা বলিষ্ঠ নাট্যট্রাডিশন ছিল যা বৃটিশ ব্যুরোক্রেসিকে, প্রতিক্রিয়াশীল সমাজকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যা অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষিতদের পাশে এনে বসিয়েছিল, যা ভাষাহীন দেশে ভাষার প্লাবন বহিয়েছিল ; গানহীন দেশে গান শুনিয়েছিল ; নৃত্যহারা জাতিকে নাচের ছন্দ দিয়েছিল ; নিরক্ষর নরনারীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল উপনিষদের পুরাণের বাণী, ইতিহাসের কাহিনী, সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দবেদনা।……'[২]

---

১. আনন্দবাজার পত্রিকা—৭ মার্চ, ১৯৬১।

২. পুনশ্চ নাটকের পুরোজ্ঞা কথা—শচীন সেনগুপ্ত। শারদীয় যুগান্তর ১৩৬৬।

তিন

দর্শকরুচি ও আধুনিক রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নাটকে এর প্রভাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা—কাব্য, উপন্যাস ছোটগল্পে একটা যুগান্তর আনার চেষ্টা চলছিল। কিছু কিছু পরিবর্তনও চোখে পড়ল। সমাজের নিচুতলার শ্রমজীবী মানুষের সুখদুঃখের ও বাস্তব-জীবনের দলিল রূপায়িত হল গল্পে ও উপন্যাসে। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে গতানুগতিকতাই প্রায় বজায় রইল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে পাশে রেখে একটা নতুন সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা গেল কবি, ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও চিন্তাভাবনার স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা ও নতুন ভাবনার আলো প্রতিফলিত হল বাংলা সাহিত্যের জগতে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে সর্বপ্রথম সমাজ রাষ্ট্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের চিরকালীন সত্য সংকেত ও রূপকের মাধ্যমে ফুটে উঠলো। এদিক থেকে বিচার করলে আধুনিক কাব্য উপন্যাস ছোটগল্পের মত আধুনিক নাটকেরও তিনি পথপ্রদর্শক। যদিও রবীন্দ্রনাথের নাটক তৎকালীন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একরকম উপেক্ষিতই ছিল। কেননা এ ধরনের রূপকধর্মী নাটকের রস গ্রহণের ক্ষমতা সে সময়ে সাধারণ দর্শকের ছিল না। ফলে পুরনো ধারার নাটকই ছিল সেসময় মঞ্চের প্রাণ। অবশ্য নাটকের বিষয়বস্তু ও চিন্তাভাবনায় যে ক্রমশ পরিবর্তন দেখা যাছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'আধুনিক' নাটকের সাহিত্যমূল্য কেবলমাত্র রবীন্দ্র-নাথের নাটকেই দেখা গেল। এ বিষয়ে অন্যান্য নাট্যকারগণ ছিলেন একেবারেই উদাসীন।

এই সময় যাঁরা মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকে দর্শকদের রুচি অনুযায়ী নাটক রচনা করেছেন তাঁদের বেশিরভাগ নাটক সাহিত্য হয়ে না উঠলেও মঞ্চসফল নাট্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—এঁদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অন্যতম। তাঁর অধিকাংশ নাটকই মঞ্চ-সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশেষত

প্রথম দিকে তিনি দর্শক ও মঞ্চের অধীন ছিলেন,। সে সময় দর্শকরুচি ও আধুনিক মঞ্চের নির্দেশে নাটক লিখতে হয়েছে বলে তাঁর কোন কোন নাটকে স্বাধীন শিল্পীসত্তা ফুটে ওঠেনি বললেই চলে।

এটা খুবই সত্য যে, শচীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাবের সময়টা ছিল অস্থিরতা-পূর্ণ। বিশ্বযুদ্ধশেষে নতুন করে মানবিক ও পার্থিব মূল্যবোধ যাচাই শুরু হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই অস্থিরতার প্রভাব সুস্পষ্ট। ঠিক ভাল করে বোঝা যায় না কোন পথে সাহিত্য অগ্রসর হবে অথচ নতুন কিছু বলবার তাগিদ অনুভব করছেন লেখকেরা। নিত্যনতুন ভাবনা জন্ম নিচ্ছে তাঁদের মনোজগতে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মুক্ত হয়ে তাঁরা নতুন সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করছেন অথচ অচেনা নতুনের ভীতি, তাকে গ্রহণ করার পথে সংকোচ, সমাজ ও সংস্কারের প্রবল বাধায় ইতস্তত লেখকেরা। এই সময়টা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুটা বন্ধ্যা দশা মনে হলেও নব্যচেতনার বীজ অংকুরিত হচ্ছিল অলক্ষ্যে।

এই বিশেষ যুগে নাটকের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বটা ছিল সবচেয়ে প্রবল। গিরিশচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে বিষয়ে ও ভাবে যে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে শচীন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারগণের অধিকাংশ নাটকে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য থাকলেও শিল্পরসসৃষ্টিতে তা কখনো কখনো সার্থক হয়নি। এর কারণ হল যুগসন্ধিক্ষণের অস্থিরতা। ফলে শচীন্দ্রনাথের নাটকে বস্তুচেতনার পাশাপাশি ঈশ্বরীয় ও ঐতিহ্যচেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মাটির মায়া নাটকে এই ধরনের অসামঞ্জস্য প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে যুগটা ছিল ভাব ও ভাবনার আলো-আঁধারে। মার্কসীয় বস্তুদর্শন ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মধ্যবর্তী দোদুল্যমানতা আর দ্বন্দ্ব নাট্যকারদের আচ্ছন্ন করেছিল। মাটির মায়া নাটকে শচীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী বস্তুচেতনার কথা তুলে ধরেছেন। নতুন যুগের নতুন ইঙ্গিত—নাটকের বিষয় ও ভাববস্তুতে এর ন্যূনতম পরিচয় তুলে ধরাই ছিল একজন নাট্যকারের পক্ষে যথেষ্ট সাহস ও প্রগতিশীলতার পরিচয়।

শচীন্দ্রনাথ নাটকে যেমন যুগ-অনুসরণ করেছেন তেমনি দর্শকরুচিকে মনে রেখে মঞ্চ-সাফল্যের কথাও তাকে ভাবতে হয়েছে। একজন সফল মঞ্চনিষ্ঠ নাট্যকারকে মঞ্চ অভিনয় কলাকৌশল ছাড়া সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারণাকে মাথায় রাখতে হয়। শচীন্দ্রনাথের নাটকে এর কমবেশি

প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য নিছক প্রমোদের জন্য দর্শকমনোরঞ্জক কাহিনী রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের অপরাধপ্রবণ সামাজিক নাটকগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নাটক অবশ্যই মঞ্চনির্ভর। অভিনয়যোগ্যতা নাটক বিচারের প্রাথমিক শর্ত। প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতি আজ পর্যন্ত নানা আঙ্গিকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে বর্তমান পরিণতি লাভ করেছে তার পেছনে মঞ্চাভিনয়ের সুদীর্ঘ নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা সর্বদাই সক্রিয়। এইজন্য নাটককে গতিশীল শিল্প (ডায়নামিক আর্ট) বলা হয়। কিন্তু নাটক যেহেতু কেবলমাত্র মঞ্চ-নির্ভর হলে অথবা নিছক স্থূল জনরুচিকে আশ্রয় করলে শিল্প-রসোত্তীর্ণ হয় না, সেইজন্য সব মঞ্চসফল নাটকই শিল্প নয়। কিন্তু সকল সার্থক নাট্যশিল্পের মাপকাঠি হল অভিনয়সাফল্য। যে কোন নাট্যপ্রেমিক ব্যক্তিই স্বীকার করবেন নাট্যজগতকে সচল ও সজীব রাখতে হলে নিত্যনতুন অভিনয়যোগ্য নাটকের অবশ্য প্রয়োজন। ' বাংলা নাটকের এক একটি যুগে এক একজন বিশিষ্ট নাট্যকার এমনিভাবেই রঙ্গমঞ্চের চাহিদা পূরণ করেছেন।

নাটক কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও সাধারণভাবে বলা যায় তা অবশ্যই অভিনয়যোগ্য হওয়া চাই তৎসহ সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ ও অনুশাসন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু থাকা আবশ্যক। বর্তমানে এর পরিধি আরও বিচিত্র পথে বিস্তৃত হয়েছে। তাতে যুক্ত হয়েছে—রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক মানবতাবোধ ব্যক্তি-মানুষের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবচেতন মনের অনুভূতি রহস্য। তথাপি মঞ্চ সাফল্যের সঙ্গে যেহেতু দর্শকের ও নাটকের সম্বন্ধ, সুতরাং নাটক যতই উচ্চচিন্তাবাহী হোক অথবা তার সাহিত্য গুণ যতই উচ্চশ্রেণীর হোক তা অভিনয়যোগ্য এবং দর্শকশ্রোতৃমন্ডলীর উপভোগ্য হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় রঙ্গমঞ্চকে সচল ও সজীব রাখা কোনমতেই সম্ভব নয়।[১]

নাট্যকার জীবনের প্রথম দিকে শচীন্দ্রনাথ দর্শকের ভালোলাগা না লাগার উপর নাটকের উৎকর্ষ বিচার করেছিলেন। ফলে মঞ্চসাফল্যের জয়টিকা লাভ

১. '...পড়তে ভালো লাগা সাহিত্যের গুণ আর দেখতে ভালো লাগা বা শুনতে ভালো লাগা অভিনয়ের গুণ। কাজেই, নাটক লিখিত এবং নাটক অভিনীত, এই দু'য়ের ভেতরে আসমান-জমিনের তফাৎ, একথা যত শীগ্গির আমরা মেনে নেব ততশীগ্গিরই আমাদের বাঙলা থিয়েটারের মঙ্গল। -—'এ ও তা'। প্রজ্ঞ, সুহঠাকুরতা।

করলেও নাট্যসাহিত্যের চিরন্তন আবেদন সম্পর্কে সম্ভবত তিনি পূর্ণ সজাগ ছিলেন না। পরিণত বয়সে দর্শকরুচির ধারণাকে পরিবর্তন করেছিলেন 'কালোটাকা' 'এই স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতার সাধনা' 'জয়নাদ ও আর্তনাদ' 'সবার মানুষ সত্য' প্রভৃতি নাট্যরচনার মাধ্যমে। তবে যুগনাট্যকার হিসাবে উপর দর্শকরুচি অনুসরণের সার্থকতা যেমন গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে কেন্দ্র করে প্রতিপন্ন হয়েছে, শচীন্দ্রনাথও সেই বিশিষ্ট ধারার সুযোগ্য প্রতিভূরূপে বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে চিরদিন আলোচিত হবেন।

আসলে 'দর্শকরুচি' ব্যাপারটিকে বুঝতে গেলে যে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি থাকা দরকার সে সময়ে অধিকাংশ নাট্যকারের তা ছিল না, শচীন্দ্রনাথের ছিল। অত্যন্ত সচেতন প্রয়াসেই নাটকের বিষয় আঙ্গিক ও ভাববৈচিত্র্যে অবগাহন করেছিলেন, আর এই সচেতনতায় যুক্ত হয়েছিল মননশীলতা ও পান্ডিত্য। নাটকের মধ্যে বিষয় ভাব ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য দর্শকেরা চিরদিন কামনা করেন। নাটকে এই বৈচিত্র্যরস সৃষ্টিতে শচীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্য। পরিণত বয়সে নবীন নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে 'নাট্যশালার সমস্যা' নামক প্রবন্ধে নাট্যানুরাগী লেখকদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি এই ধরনের কথাই বলেছিলেন ঃ "......নতুন নাট্যকারদেরকে নাট্যবৈচিত্র্যের কথা ভাবতে হবে। একই ধরনের নাটক রচনা করে ও তার পরিবেশন করে নতুন নাট্যধারাকে প্রবহমান রাখা যাবে না। নাটকের কাছে মানুষের রংয়ের দাবী, রূপের দাবী, অজানা কল্পলোকের বিস্ময়ের দাবী থাকবেই। শুধু বাস্তবতা দিয়ে সে ক্ষুধা মেটানো যাবে না। ......বৈচিত্র্য চাই-ই। নতুন লেখকদের মাঝে যাদের শক্তি আছে, তাঁদেরকে তাঁদের সৃষ্টির মাঝে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে পরখ করে দেখতে হবে কোন রূপ দেখিয়ে, কোন রসে ভিজিয়ে দর্শকদের খুশি করা যায়। জোর করে দর্শকদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। জাতির দাবী উপস্থিত না হলে নাটকের নবরূপ দেওয়াও সম্ভব হয় না।......[১]

মঞ্চ ও দর্শকরুচি অভিজ্ঞ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মঞ্চকে নাটক বিচারের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে তিনি বিশেষ নাটক লিখে বিশিষ্ট দর্শকদের তৃপ্ত করতে চাননি, আপামর সাধারণ

১. নাট্যশালার সমস্যা—শচীন সেনগুপ্ত। 'রূপমঞ্চ' শারদীয়া, ১৩৫৮।

মানুষের বিনোদনার্থে নাটক রচনা করেছেন। প্রথম দিকে তাঁর কিছু নাটক সাহিত্য হয়ে না উঠলেও মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে কোন বাধা পায়নি তিনি নাটকে বাস্তবতা ও প্রয়োজনে অবাস্তবতাকেও গ্রহণ করেছেন, সেজন্য তাঁর নাটকে অতিনাটকীয় উপাদান এত সহজলভ্য। নাট্যরচনা সম্পর্কে শচীন্দ্র-নাথের সুস্পষ্ট অভিমত ঃ 'নাটক তো লিখব অভিনয় হবার জন্যই। না হলে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস না লিখে নাটক লিখতে গেলুম কেন।'[১]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, আধুনিক রঙ্গমঞ্চে সতু সেনের অবদান চিরস্মরণীয় বস্তুত আমেরিকা প্রত্যাগত সতু সেনই বাংলা নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূচনা করেছেন। আলোর ব্যবহারে, দৃশ্য-পরিমণ্ডল রচনায়, আধুনিক মঞ্চসজ্জায় ও সেইসঙ্গে মঞ্চে কলাকৌশলে আধুনিকীকরণের দ্বারা তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা বাংলা নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। শচীন্দ্রনাথ এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তার মূলে সতু সেনের অবদান অসামান্য।

আধুনিক মঞ্চ ব্যবস্থা যেমন শচীন্দ্রনাথ মাথায় রেখেছিলেন তেমনি আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নাট্যরসবৈচিত্র্য সৃষ্টিই ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক যুগে জনপ্রিয়তায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার, তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকদের একাধিক রচনা তার সাক্ষ্য দেয়।

শচীন্দ্রনাটকের জনপ্রিয়তার উৎস এর সংলাপ-মাধুর্যে কাহিনীর স্বচ্ছন্দগতি আবেগানুভূতি বিষয় ও আঙ্গিকবৈচিত্র্যে। শুধুমাত্র এই কয়টি নাট্যবৈশিষ্ট্য তাঁর নাটককে দর্শকদের অন্তরের গভীরে নিয়ে গিয়েছিল। তৎকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীরাও তাঁর নাটকের গুণগ্রাহী ছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতারা তাঁর নাটকে অভিনয় করে তৃপ্ত হতেন, শচীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার প্রতি তাঁরা গভীর শ্রদ্ধান্বিতও ছিলেন। তাঁর নাটকে অভিনয় করে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যেমন তৃপ্তি পেতেন এমন আর কোথাও নয়। তাঁর মঞ্চসফল নাটকগুলিতে অভিনয় করেই নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী নীহারবালা সরযূবালা খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন।

১. বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—শ্রীমনোমোহন ঘোষ। দৈঃ বসুমতী ১৩৬৭, ৭, ২৬ ফাল্গুন।

এর কারণ ছিল নাটকের কাহিনী ও আঙ্গিকবৈচিত্র্য এবং এর মধুর সংলাপ। কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নন তৎকালীন থিয়েটার দর্শকরাও তাঁর নাটকের বৈচিত্র্যধর্মিতায় গভীর আকৃষ্ট ছিল।[১]

নাট্যকার হিসাবে শচীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলারঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নাটক লিখেই তাঁর কর্তব্য শেষ হত না, তাকে মঞ্চরূপ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর চিন্তা ও সৃষ্টিশক্তি সর্বদাই সক্রিয় থাকত। নাটকের পান্ডুলিপিকে অভিনয়ের মধ্যে সার্থক করার জন্য নাটকের রিহার্সালে সর্বদা উপস্থিত থেকে যথাযথ অভিনয়ের প্রতি তীক্ষ্ন লক্ষ্য রাখতেন। বস্তুত, নাট্য-পরিচালনার কাজেও তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ থাকত। তাঁর মনোমত না হওয়া পর্যন্ত অভিনেতা ও নির্দিষ্ট পরিচালকের সঙ্গে কোন বোঝাপড়াই শেষ হত না। এসব ক্ষেত্রে কখনো কখনো মতান্তর পর্যন্ত ঘটে গেছে, তথাপি তিনি নতি স্বীকার করেননি। এর অসংখ্য নজির আছে। মঞ্চ-উপস্থাপনায় পরিচালক বা অভিনেতার সঙ্গে মতের মিল না হলে পান্ডুলিপি নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে আসতেন। রিহার্সালে কখন কখন তিনি পরিচালকের ভূমিকা নিতেন (পেশাদারী মঞ্চে কয়েকখানি স্বরচিত নাটক যথা—কাঁটা ও কমল, মাটির মায়া'য় পরিচালকের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল)। অভিনয়ে অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর নিষ্ঠার অভাব তিনি সহ্য করতেন না। সেখানে ছিলেন তিনি ক্ষমাহীন। এই রকম একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

নাট্য নিকেতনে 'সতীতীর্থ' (১৯৩১) অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। এই নাটকেই বিখ্যাত অভিনেত্রী রানীবালার অভিনয় জীবনের শুরু। সতীতীর্থ নাটকের মহলার শেষদিনে শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত। 'তাঁকে দেখে রানীবালা ঘাবড়ে যান এবং মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরোয় না। নাট্যকার রেগে গিয়ে রানীবালাকে এমন চড় মারেন যে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁর মনে ভয়ানক দুঃখ হয় জীবনে এই প্রথম মার খেলেন, তাও এই রকম পরিস্থিতিতে। অভিনয় করা ছেড়েই দেবেন ঠিক করলেন। নীহারবালা তখন তাঁকে বুঝিয়ে

১. '......এমন দিন গেছে যেদিন ঠিক ৫টায় নাট্যভারতীতে করলাম 'তটিনীর বিচার' তারপর নাট্যনিকেতনে গিয়ে 'পথের দাবী' করলাম...'

(নিজেরে হারায়ে খুঁজি—২য় পর্ব। অহীন্দ্র চৌধুরী। পৃঃ ২০০)

শান্ত করেন। সতীতীর্থের প্রথম অভিনয় রাত্রিতে তিনি খুব ভাল অভিনয় করেন।......'[১]

এই দুর্বাসা-চিত্ত ব্যক্তিকে বংগরংগমঞ্চের সাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রী কলাকুশলী যেমন ভয় পেতেন তেমনি শ্রদ্ধাও করতেন, কেননা রংগমঞ্চের বিপদের দিনে নাটকের অভাবে অচল নাট্যগৃহকে সচল করতে সর্বশক্তি নিয়ে সবার আগে তাঁকেই দেখা যেত। রংগমঞ্চের নট-নটী কলাকুশলীদেরও এমন আপনজন সেকালে কমই ছিলেন। নাট্য-প্রযোজকদের যথেচ্ছাচারের পীড়ন থেকে মঞ্চশিল্পীদের যেমন বুক দিয়ে রক্ষা করেছেন, অপর দিকে নাট্যমঞ্চের প্রাণশক্তিকে অব্যাহত রাখার জন্য একের পর এক মঞ্চসফল নাটক রচনা করে গেছেন। তাঁর এই দৈবতভূমিকা স্বভাবতই নাট্যজগতের আর এক মহারথীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বাংলা নাট্যমঞ্চের চিরস্মরণীয় পুরুষ গিরিশচন্দ্র।

এ প্রসংগে অভিনেতা ভূপেন চক্রবর্তীর 'নীলকণ্ঠ শচীনদা' নামক-স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধটির কিয়দংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেনঃ '১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস—দোলের ঠিক আগের দিন। নাট্যনিকেতনের কর্তৃপক্ষের অমানুষিক অত্যাচারে আমরা প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন অভিনেতা একসংগে কর্মত্যাগ করে চলে আসি এবং নিজেদের চেষ্টায় একটা ক্ষুদ্র দল গড়ে তুলি। ···আমাদের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো শ্রদ্ধেয় শচীনদা'র প্রীতি ও সহানুভূতি আমরা হারাবো কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ভয়লেশশূন্য শচীনদা ধনীদের প্রেমের ফাঁস ছিন্ন করে, কপর্দকশূন্য কয়েকজন অভিনেতার পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন···। তাঁর মত একজন অভিভাবককে, তাঁর মত একজন বন্ধুকে সামনে পেয়ে অতি উৎসাহে একটি সুষ্ঠু দল গড়ে তুলতে সক্ষম হই। নিঃস্বার্থভাবে তিনি আমাদের দান করলেন তাঁর "আবুল হাসান" "বাংলার দুলাল"। তাঁর স্বার্থত্যাগে, তাঁর উপদেশে, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমাদের ক্ষুদ্র 'রূপমহল' কি অভিনয়ে, কি প্রয়োগনৈপুণ্যে, সংস্থাপনে সমস্ত মঞ্চজগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে।'[২]

শচীন্দ্রনাথের তেজস্বিতায় সে সময় বাংলা রঙ্গজগতের সকলেই যেমন সন্ত্রস্ত থাকতেন তেমনি মানুষটির স্বচ্ছ হৃদয়ের জন্য সকলেই ভালবাসতেন। রূপমঞ্চ-

১. 'সর্বস্নেহধন্যা রানীবালা'—শ্রীমতী মণিদীপা মুখোপাধ্যায়, রূপমঞ্চ ১৬শ বর্ষ, আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৩৬২।

২. নীলকন্ঠ শচীনদা—ভূপেন চক্রবর্তী, রূপমঞ্চ, ১৩৫৮ শ্রাবণ-ভাদ্র।

সম্পাদক চলচ্চিত্র ও নাট্যসাংবাদিক কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'বাংলা নাট্য জগতে একান্নবর্তী পরিবারের শেষ প্রতিনিধি' বলে অভিহিত করেছেন।[১] পেশাদার রঙ্গমঞ্চের একান্নবর্তী পরিবারের পরিবেশ, সমভাগী সুখ-দুঃখের চেতনা আজ অবলুপ্ত। শিল্প জগতের নৈরাজ্য নিরপেক্ষশূন্যতার ক্রমব্যাপ্তি লক্ষ্য করে গভীর হতাশায় নাট্যকার ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য লিখেছেন : '...দুঃখের বিষয় নাটক পরিবেশন করতে গিয়ে শত বাধাবিপত্তির মধ্যে বিয়াল্লিশের কালেও যে উন্মুক্ত প্রাণের পরিসর পেতাম, বর্তমান অবস্থার অবাধ সুযোগ-সুবিধার মধ্যে (?) আজ সেই উৎসব অঙ্গনের সন্ধান পাই না। আমিই অঙ্গন চিনি না, না অঙ্গনই আমাকে চেনে না, কে জানে...'[২] বর্তমান পেশাদারী রঙ্গমঞ্চজগতে ছোট বড় অভিনেতা কলাকুশলী থেকে পরিচালক নাট্যকার—প্রত্যেকের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ক্রমশ ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, হয়ত সেই কারণে বাংলা নাট্যজগতে মৌলিক নাট্যসৃষ্টি তেমন সম্ভব হচ্ছে না।

গিরিশচন্দ্র থেকে শচীন্দ্রনাথ, এক একজন প্রতিভাবান শিল্পী অভিনেতা ও নাট্যকার এই নাট্যজগতে সাম্যবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে শক্তিশালী করে গেছেন। শচীন সেনগুপ্ত এমনই একজন আত্মবিশ্বাসী ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী নাট্যকার, যিনি তৎকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শিল্পী কলাকুশলী মঞ্চকর্তৃপক্ষ সবাইকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন। মঞ্চজগতের নানা পরিকল্পনায় তিনি ছিলেন পরামর্শদাতা ও বিপদে পরম বন্ধু। দারিদ্র্যের রূঢ় বাস্তবের মধ্যে কেউ তাঁকে কাতর হতে দেখেননি। অন্যায়ের কাছেও কোনদিন নত হননি। মঞ্চ-মালিকদের অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে নাট্যশিল্পের অবজ্ঞাত শিল্পীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন চিরদিন। রঙ্গজগতের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যেমন ছিলেন মূর্তিমান প্রতিবাদস্বরূপ, আবার নাটক রচনায় তাঁর নিত্য-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা সর্বদাই সক্রিয় ছিল। একজন

১. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন : 'স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। নানা আলোচনা উপদেশ, গঠনমূলক কাজ এবং নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজকদের মধ্যে সংঘশক্তি উদ্বোধনের মধ্য দিয়া তিনি আধুনিক নাট্য আন্দোলনকে অশেষভাবে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

—বাংলা নাটকের ইতিহাস। পৃঃ। ৪৭৩

২. দ্রঃ ভূমিকা নবান্ন—৪র্থ সংস্করণ, মার্চ ১৯৬২।

'যুগনাট্যকারের' যাবতীয় গুণাবলী তাঁর ছিল, যেমন ছিল গিরিশচন্দ্রের। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁকে ঐ নামেই অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ'…শচীনদা যুগনাট্যকার। তিনি পরিবর্তনশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটকের রূপেরও পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে শচীনদা আমাদের পুরোধা। স্থায়ী নাট্যসাহিত্যে শচীনদার আসন অনিবার্য, কেননা তিনি স্রষ্টা ও দ্রষ্টা।'

শচীন্দ্রনাথ যখন বাংলা নাট্যমঞ্চে যুক্ত হয়েছেন তখন রঙ্গমঞ্চ পুরনোদিনের নাট্যরুচির জের টেনে চলেছে। প্রধানত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা ধরে অভিনীত হচ্ছে, মাঝে মাঝে উপন্যাসের নাট্যরূপ দর্শককে উৎসাহিত করছে মাত্র। এই সময় শিশিরকুমার ও আর্ট থিয়েটারের কিছু শক্তিশালী অভিনেতাদের অভিনয়-প্রতিভা রঙ্গজগৎকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। তথাপি নাটকের বৈচিত্র্যহীন আখ্যানবস্তু গতানুগতিক মঞ্চআঙ্গিক প্রকৃত নাট্য-কলারসিকদের তৃপ্তিদানে ক্রমশ অসমর্থ হচ্ছিল। শচীন্দ্রনাথ বৈকালী পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে প্রবোধ গুহ'র (আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) সঙ্গে থিয়েটারে যাতায়াতের সূত্রে পরিচিত হলেন অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি একদিন কথায় কথায় বললেন 'নতুন ধরনের নাটক টাটক লিখুন মশায়। এসব পুরনো ধাঁচের বই-এ অভিনয় করে তেমন সুখ হয় না।'[১] শচীন্দ্রনাথ কথা রেখেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি শিশিরকুমার ও আর্ট-থিয়েটারের বৈচিত্র্যহীন পুরনো ধাঁচের নাটকাভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতা উভয়েই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। শচীন্দ্রনাথ বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই গতানুগতিকতার জড়ের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করলেন। তাঁর রচিত নতুন ধরনের মঞ্চসফল নাটকগুলি জনমনে রুচির বিবর্তন ঘটালো। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় ধারার একঘেঁয়েমি থেকে রক্ষা করেছিলেন নাটকে নতুন নতুন আখ্যান ও সংলাপ-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে।

ইতিমধ্যে আর্ট থিয়েটারে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সার্থক একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) অভিনীত হয়ে প্রচলিত নাট্যধারায় কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে বটে তবে পূর্ণদৈর্ঘ নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথের 'রক্ত-কমল'

---

১. দ্রঃ শচীন সেনগুপ্তের 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা'য় 'আর্টথিয়েটার ও নাট্য মন্দির' নামক প্রবন্ধ। দ্রঃ দৈনিক বসুমতী, 'বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' —মনোমোহন ঘোষ। ১০ মার্চ, ১৯৬১।

(১৯২৯) নাট্যজগতে বিপ্লবের সূচনা করল বলা যেতে পারে। রক্ত-কমল নাটকে শচীন্দ্রনাথ কেবল সময় সংক্ষেপই করলেন না নাটকের আঙ্গিকে আমূল পরিবর্তন ঘটালেন, বিষয়বস্তুতেও আনলেন বৈচিত্র্য।

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুরুষের কাছে প্রেমহীন বশ্যতাকে অস্বীকার করে উদার মানবিকতায় নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে নতুন যুগের নতুন চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তথাপি 'রক্ত-কমল' নবীন দর্শকদের আকৃষ্ট করলেও প্রাচীনপন্থীদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়নি, তার কারণ নাটকের বিষয়বস্তু ও আয়তন। বিষয়বস্তুতে পতিতার মানবতাকে অনেকে সরল সংস্কারে গ্রহণ করেনি। উপরন্তু তখনকার দিনে পাঁচ ছয় ঘন্টার নাটকেই দর্শকরা তৃপ্ত হতেন, সওয়া দুই ঘন্টার নাটকে নবীন দর্শকরা খুশী হলেও প্রাচীন দর্শকদের কাছে তা ছিল পয়সা জলে ফেলার সামিল।[১]

শচীন্দ্রনাথ এই সা।য়িক ব্যর্থতায় ভেঙে পড়েন নি। অনতিবিলম্বে একের পর একটি মঞ্চসফল নাটক উপহার দিয়ে তাঁর দর্শকরুচি ও যুগোপযোগী নাট্য-ভাবনার সঠিক মূল্যায়নই প্রমাণ করেছেন। পুরাতন পদ্ধতির অভিনয়ের প্রতি দর্শকের ক্রম-ঔদাসীন্য বাংলা নাট্যশালাকে কতখানি নির্জীব করে ফেলেছিল তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে গভীরভাবে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক নতুন ধরনের সামাজিক নাটকের প্রতিও তেমন আকর্ষণ বোধ করছে না অথচ বহু অভিনীত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দর্শকেরা আর মোটেই সন্তুষ্ট নন।[২] বাংলা নাট্যমঞ্চের এই উভয় সংকটের দিনে শচীন্দ্রনাথ নাটকের ক্ষেত্রে

১. দ্রঃ বাংলার নাটক ও নাট্যশালা। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। 'আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির' নামক অধ্যায়।

দ্রঃ একশ' বছরের বাংলা থিয়েটার। শিশির বসু। পৃঃ ৪১২-৪১৪।

২. 'পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় দেখবার আগ্রহ কতকগুলি লোকের থাকবেই কিন্তু তাই বলে কেবল যদি ওই দুই রকম নাটকের অভিনয়ই আমরা করি তাহলে দর্শকদের অরুচি কেন জন্মাবে না ? আমার বিশ্বাস পৌরাণিক প্রীতি দর্শকদের আর নেই। কিন্তু তা নেই বলেই যে অন্য নাটক জমবে সে কথাও আমি বলি না। না বলার সঙ্গত কারণ রয়েছে। পৌরাণিক নাটক অভিনয় করে খুব জাঁকালো দৃশ্যপট দেখিয়ে দেখিয়ে খুব উত্তেজনাপূর্ণ বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়ে শুনিয়ে আমরা দর্শকদের এমন করে ফেলেছি যে জীবন্ত নাটক আর তাদের উত্তেজনার খোরাক যোগাতে পারছে না আর সেই কারনেই তারা বলছে যে সামাজিক নাটক জমে না। দর্শকরা পুরান ইতিহাস চায় না আবার সামাজিক নাটকও তাদের মনোবৃত্তিকে তৃপ্ত করতে পারছে না, এই-ই হয়েছে এখনকার অবস্থা।'— সাপ্তাহিক 'নটরাজ' (সম্পাদক—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ— শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দর্শকের সঠিক নাট্যরুচি নিরূপণ করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা কমে যেতে থাকে এবং দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বর্ধিত হয়। এই সঙ্গে বাংলা সামাজিক নাটকও রঙ্গমঞ্চের জগতে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে সচেষ্ট হল। শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলি গ্রাম ও শহরের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সামাজিক নাটক মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী নাটকগুলি থেকে স্বতন্ত্র। দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে বাঙালী সমাজ ও পরিবারের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আমাদের জীবন ও অভিজ্ঞতায় সচরাচর ধরা পড়ে। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে শহরের কৃত্রিম জীবনযাত্রা ও শিক্ষিত নর-নারীর যে দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে, সেখানে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন মিল নেই। আধুনিক সমাজ সম্পর্কে সঠিক অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে অত্যাধুনিক পরিবারের আচার-আচরণ বাক্যালাপ কিছুই বাস্তবসম্মত মনে হয়না। আবার তাঁর প্রতিটি সামাজিক নাটকেই 'ক্রাইম' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, নাগরিক মননশীলতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও 'আধুনিকতা' কখনো কখনো আচরণসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। এর পেছনে শচীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র ও পুঁথিগত অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। ঘটনা-দুর্ঘটনার চমক ও নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মুখে কেবল বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক সাংলাপ আবেদন সৃষ্টি করেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটক সম্পর্কে বলেছেনঃ 'শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলির মধ্য দিয়া অতি আধুনিক নাগরিক সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের বিচিত্র সমস্যা রূপায়িত করিবার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু সমস্যাগুলি বাস্তব জীবন হইতে অনেকক্ষেত্রেই সংগৃহীত নহে—মানবচরিত্র সম্পর্কিত পুঁথিলব্ধ জ্ঞান হইতে পরিকল্পিত। সেইজন্য তাঁহার অধিকাংশ সমস্যারই বাস্তব আবেদন খুব সার্থক হইতে পারে নাই।'[১] শচীন্দ্রনাথের নাটকে এই ত্রুটি সত্ত্বেও জনপ্রিয়তা অর্জনে কোন বিঘ্ন ঘটেনি, উপরন্তু এর উপর ভিত্তি করেই সমসাময়িক দর্শকরুচির প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়।

১. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)। পৃঃ ৩৮৫।—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের জনপ্রিয়তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে অভ্যস্ত সাধারণ দর্শকেরা নাটকে বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্নে মোটেই সচেতন ছিলেন না। তাঁরা নাটকে বৈচিত্র্যের উত্তেজনাই কামনা করতেন। নাট্যজগতে শচীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত যে-সমস্ত সামাজিক নাটক মাঝে মাঝে অভিনীত হচ্ছিল তা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক এবং কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ। বস্তুত এই জাতীয় নাটকে প্রচলিত ঐতিহাসিক নাটকের আবেগ ঘটনা-দুর্ঘটনা আকস্মিকতা এবং উত্তেজনাপূর্ণ সংলাপের একান্ত অভাব ছিল বলে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে অভ্যস্ত দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারছিল না। শচীন্দ্রনাথ খুব সহজেই সমসাময়িক দর্শকদের রুচি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে ঐতিহাসিক নাটকের উত্তেজনাও সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন অবাস্তব কাহিনী নাটকীয় বলিষ্ঠ সংলাপ ও ঘটনার আকস্মিকতা উপস্থিত করে। অবশ্য, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যরচনায় উপজীব্য বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তন দেখা যায়। তাঁর শেষ কয়েকখানি নাটক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ রঙ্গালয়ে সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম রুচির পরিবর্তন দেখা যায়। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে এর সূচনা বলা যেতে পারে। এই নতুন ধরনের সামাজিক নাটকে অঙ্কিত স্ত্রী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি কৌতূহলপ্রদ। এতদিন নাটকে যে ধরনের নারী চরিত্র আমরা দেখছি শচীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারী তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের চলাফেরা আচরণে কথাবার্তায় সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মত প্রকাশের দৃঢ়তা দেখা গেল। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের নায়িকারা 'পুরোনো নায়িকাদের থেকে আলাদা—আগের সমাজের "বাঙলার বধূ বুক ভরা মধু" টাইপ নয়। আমরা পেলাম নতুন যুগের নারী, যাকে বার্নাড শ'র নাটকে "নিউ ওম্যান" বলা হয়েছে।'[১]

ঝড়ের রাতে নাটকখানি আধুনিক নরনারী সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে রচিত। মনস্তত্ত্বের ব্যবহার ও অপরাধপ্রবণতা নিয়ে এর কাহিনীরস সৃষ্টি হয়েছে। পুরাতন ঐতিহ্যবাহী নাটকের সরল সাদাসিধা পথে এর বিষয়বস্তু ও পাত্র-পাত্রীর

১. 'শতবর্ষে নাট্যশালা' সংকলন গ্রন্থে 'দর্শকের আসন থেকে'—সুশীল মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৮২।

চরিত্র অঙ্কিত হয়নি। সে সময় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের দর্শকেরা একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি চাইছিল। ফলে, 'ঝড়ের রাতে'র মত নাটক খুব সহজেই বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শচীন্দ্রনাথ দর্শকমন উপলব্ধি করেই ঝড়ের রাতে নাটকে মঞ্চ আঙ্গিক ও নাট্য-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন এবং সহজে সাফল্যলাভ করেছিলেন। শ্রীঅখিল নিয়োগীর (স্বপন বুড়ো) ভাষায়ঃ 'তার "ঝড়ের রাতে" কে বাংলা নাটকে একটি মাইল স্টোন বলা চলে।'[১]

'ঝড়ের রাতে'র পর 'তটিনীর বিচার' 'স্বামী স্ত্রী' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি নাটকে পূর্বোক্ত নতুন যুগের নারীকে দেখা গেল। এইসব নাটকের বিষয়বস্তুর নতুনত্বেই শুধু দর্শকরুচি আকৃষ্ট হয়নি, এর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও মঞ্চরূপায়ণের অভিনবত্বে বাংলা নাটকের দর্শক অভিভূত হয়েছিল। একটি স্বতন্ত্র রুচিও গড়ে উঠল শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলিকে ঘিরে।

কেবল স্ত্রী চরিত্র নয় পুরুষ চরিত্রগুলির বিশেষত্ব তাঁর নাটকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তটিনীর বিচার নাটকে 'ডাঃ ভোস' অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিল। স্বামী স্ত্রী নাটকে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'ললিত' চরিত্রাভিনয়েও অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। দর্শকরুচি শচীন্দ্রনাথের নাটকের আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুতে কেবল নয়, বিভিন্ন নাটকের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য জনচিত্তজয়ী করেছে। সামাজিক নাটকের অধিকাংশ পুরুষ চরিত্র 'অত্যাধুনিক' উচ্চশ্রেণীর মানুষ। তাদের আচরণ কথাবার্তায় উগ্রসাহেবিয়ানা ও পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রকট হয়ে উঠেছে। এককথায় তথাকথিত সোফিস্টিকেটেড সমাজের আচার-ব্যবহার তাদের কৃত্রিম প্রেম-প্রণয় ও মানসিক দ্বন্দ্ব সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাধারণ দর্শকের মনস্তত্ত্ব সর্বদাই অচেনা জগতকে অনুসরণ করে। তাদের স্থূল চেতনায় নিজেদের দুঃসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মঞ্চে পুনরাবৃত্তি দেখতে মন চায় না। সমাজের উঁচুতলায় যে অভিজাত সমাজ আছে সেখানকার স্ত্রী পুরুষের সুখ দুঃখ তাদের শিক্ষাদীক্ষা রুচি তাদের ঐশ্বর্য বিলাস কৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা-অভিমান অপরাধপ্রবণতা প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দলাভ করতে চায়।

১. ঐ—'শতবর্ষের আলোকে আমার দেখা নাট্যরথী মহারথী—অখিল নিয়োগী, পৃঃ ৩৫১।

সাধারণ মানুষের কাছে সমাজের উপরতলার জীবনযাত্রা স্বপ্নের বস্তু। শচীন্দ্রনাথ একে নাটকের উপজীব্য করে নাট্যরস সৃষ্টি করেছেন।

পরবর্তীকালে বাস্তবসম্মত সাধারণ মানুষের কথা নিয়েও তিনি নাটক লিখেছিলেন, সাধারণ রঙ্গালয়ে তা চলেনি। তাঁর অপরাধপ্রবণ নাটকগুলিই কিন্তু সাধারণ দর্শকের মনে বহুদিন পর্যন্ত মুদ্রিত ছিল। এখন আলোচনা করা যেতে পারে, শচীন্দ্রনাথের সমসাময়িক নাট্যজগতে দর্শকরুচি কোন পথ অনুসরণ করেছিল।

এই সময় অর্থাৎ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে একদিকে জাতীয় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে—স্বদেশী চেতনায় উদ্দীপ্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলি তাকে অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে পুরনো মূল্যবোধ অর্থাৎ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক পরিবর্তনে জাতির মধ্যে যে টানাপোড়েন অবস্থা চলছে তাতে ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য ও ব্যক্তি-সম্পর্কবোধের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা ও দ্বন্দ্ব সমাজদেহে এক বিরাট ধাক্কা দিয়েছে। শচীন্দ্রনাথের নাটক উক্ত বিষয়বৈচিত্র্য অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। দর্শকেরাও একঘেঁয়ে নাট্যবিষয় থেকে মুক্ত হয়ে মনের ও চিন্তার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়ে শচীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে বেশি পছন্দ করেছিল। তাঁর ঐতিহাসিক ও অপরাধপ্রবণ সামাজিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তার এই হল অন্যতম কারণ। তাঁর নাট্যরচনা গতানুগতিক পথে অগ্রসর হয়নি অথবা একই ধরনের বিষয় ও ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়নি। তাঁর একখানি নাটক অপর যে কোন নাটক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশেষত সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর নাট্য রচনার প্রথম পর্ব থেকেই শুরু হয়েছে।

বিষয়ের আধুনিকতা শচীন্দ্র-নাটকের জনপ্রিয়তার মূলে যেমন কার্যকর হয়েছে তেমনি কিছু কিছু নাটক মঞ্চসাফল্যের পথে অন্তরায় স্বরূপ হয়েছে। তাঁর প্রথম নাটক 'রক্ত-কমল'-এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি 'জননী' আর একটি নাটক। নাটকটির অভিনয়ে সর্বপ্রথম ওয়াগান স্টেজ ব্যবহৃত হয়। এর আখ্যান বিষয় এক কুমারী জননীর জীবন সংগ্রাম। চলচ্চিত্রসুলভ কাহিনী পরিবেশনে নাটকটির আঙ্গিক নির্মিত হয়েছে। তথাপি জননী নাটকের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সাধারণ দর্শকের সংস্কার যুক্ত না থাকায় তা মঞ্চসফল হয়নি। এই সময় অনুরূপাদেবীর উপন্যাস অবলম্বনে 'মা'

(১৩৪০) নাটকটি কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল ঃ 'দর্শকরা 'জননী'কে সমাজবিরোধী, আর 'মা' কে সমাজরক্ষী বলে মনে করে জননীকে প্রত্যাখ্যান করলেন, আর 'মা' কে জানালেন অভিনন্দন।'

এমনি আর একখানা নাটক কালের দাবী (১৯৩৮)। এ নাটকখানিও প্রচলিত সামাজিক সংস্কারে আঘাত হানার ফলে বেশিদিন চলেনি। দুই স্ত্রী পরস্পরকে ভালবেসে একে অপরকে সুখী করার জন্য একজন সন্ন্যাস গ্রহণ করে অপর জন আত্মহত্যা করে অথচ কেউই স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে না। এ ধরনের মননশীল বিষয়ে মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল দর্শক ছাড়া সাধারণ অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকসমাজের তেমন আকৃষ্ট না হওয়ারই কথা।

অপরাধপ্রধান সামাজিক নাটকে শচীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। বস্তুত, তাঁর এই ধরনের নাটকগুলিই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আরও লক্ষণীয় হল, এই সমস্ত নাটকের কাহিনী নির্মাণে শচীন্দ্রনাথের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাব ভীষণভাবেই প্রকট হয়েছে। ঝড়ের রাতে, তটিনীর বিচার, জননী, সুপ্রিয়ার কীর্তি, নার্সিং হোম প্রভৃতি নাটকগুলিতে শহরজীবনের জটিলতা, কৃত্রিমতা এবং তৎকালীন চলচ্চিত্রসুলভ অভিনয়কে মনে রেখে রচিত নাট্য সংলাপ তাঁর নাটকে যে গতির সঞ্চার করেছে জনপ্রিয়তার মূলে তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, নাটকের মঞ্চসাফল্যের প্রথম শর্ত হোল দর্শকরুচিকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা। এজন্য নাট্যকারের প্রয়োজন দর্শকদের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদাকে গভীরভাবে অনুভব করা। এ প্রসঙ্গে নাটকের সংজ্ঞাকে শচীন্দ্রনাথ নতুন আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'নাটকের পান্ডুলিপি নাটক নয়, পান্ডুলিপির অভিনয়ও নাটক নয়, নাট্যসৃষ্টির অবলম্বন বা মাধ্যম। ওদের সঙ্গে দর্শকদের মনের সংযোগেই নাটক সৃষ্টি হয়, যা অনুভূতির অতিরিক্ত কিছু নয়।...... নাট্যসৃষ্টির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কোন কিছুর স্থান নাটকে নেই, আর প্রয়োজনীয় সবকিছুরই স্থানই নাটকে আছে। এই প্রয়োজনের কোন সংজ্ঞা অথবা নিদর্শন দেওয়া যায় না। সৃষ্টির সময় স্রষ্টা যা অপরিহার্য বলে জানবেন, তাই সেই নাটকের পক্ষে প্রয়োজন। তা যদি অবান্তর হয় তা হলে নাটকই হবে না। অবান্তর কি না, তা প্রমাণিত

হবে দর্শক মনের প্রতিক্রিয়ার বিচারে। আর কোন বিচারে নয়।......'[১]

তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি মূলত সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছে; এই সময়ের দর্শকদের রুচি খুব স্বাভাবিক কারণেই স্বদেশী ভাবোদ্দীপ্ত নাটকীয় বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করবে সন্দেহ নেই। শচীন্দ্রনাথ খুব বিশ্বস্তভাবেই তাকে অবলম্বন করেছিলেন। উল্লেখ্য সমসাময়িক দেশমুক্তির চেতনা গিরিশচন্দ্রের নাটকেও সার্থক হয়ে উঠেছে; কিন্তু ডি.এল. রায়ের ঐতিহাসিক নাটকের শাশ্বত মানবমুক্তির স্বপ্ন শচীন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারদের বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি, সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনাই ছিল এর মুখ্য সুর।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সর্বাধিক মঞ্চ-সফল নাটকগুলি অধিকাংশই ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল এই সমস্ত নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের জাতীয় মুক্তি-চেতনা গ্রাম ও শহরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইংরেজ সরকার এইসব নাটকের অভিনয় বারবার বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে, এর জনপ্রিয়তা হ্রাস না হয়ে আরো বর্ধিত হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রুচি অনুসরণ করেছে। তাঁর দ্বিতীয় নাটক ও প্রথম মঞ্চ-সফল ঐতিহাসিক নাটক গৈরিক পতাকায় (১৯৩০) জাতীয়তাবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে মহারাষ্ট্রবীর দেশপ্রেমের প্রতিমূর্তি রাজা শিবাজীর মধ্যে।

'গৈরিক পতাকা' প্রসঙ্গে নাট্যকার মন্মথ রায় বলেছেন 'জাতীয়তার তূর্যনিনাদ'। সে সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে আসমুদ্র হিমাচল সর্বস্তরের

১. জাতীয় নাট্যশালা গড়বার মুখে ভাববার কথা—শচীন সেনগুপ্ত, শৌভনিক নাট্যোৎসব স্মারক সংখ্যা, ১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭।

দ্রঃ বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য সমালোচক শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রেশট-নাটকের তাত্ত্বিক আলোচনায় শচীন সেনগুপ্তের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেনঃ 'সবচেয়ে বড় সত্য হোলো থিয়েটারের অস্তিত্ব কি তার নানা ভঙ্গী বা কলাকৌশলের জন্য? নাট্যকার অভিনেতা পরিচালকের জন্য? শিল্প নির্দেশকের জন্য? কোনো ভঙ্গীই সার্থক নয় যদি না দর্শককে আকৃষ্ট করে, উদ্বুদ্ধ করে? বের্টল্ট ব্রেশটের থিয়েটার এই প্রশ্নটিকেই মূলমন্ত্র করে আধুনিক থিয়েটারের ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে বেঁচে রয়েছে।' ব্রেশট ও তাঁর নাটক, পৃঃ ২৩।

মানুষ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরাজ রাজত্বের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। জাতিভেদ ও উচ্চনীচ ভেদাভেদ ভুলে মানুষে মানুষে যে ভ্রাতৃত্বের রাখী বন্ধনের সূচনা হয়েছিল, 'গৈরিক পতাকায়' তারই প্রতিধ্বনি রয়েছে।

এই নাটকের অভূতপূর্ব মঞ্চ-সাফল্যে স্বদেশী যুগের দর্শকরুচিই প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকীয় সংলাপের ধ্বনি-মাধুর্য বক্তৃতাধর্মী আতিশয্য অতিনাটকীয়তা সবকিছুই জাতীয় ভাবাবেগে পরিচালিত ছিল, আর এ সবই দর্শকের কল্পনা ও বীর-রসাত্মক ভাবনাকে উজ্জীবিত করত।

সিরাজদ্দৌলা (১৯৩৮) আর একখানি স্মরণীয় ঐতিহাসিক নাটক। এক সময় এর জনপ্রিয়তা প্রবাদের মত ছিল। এর করুণ রসসিঞ্চিত ও বীর-ভাবব্যঞ্জক সংলাপ গ্রামের পথে-প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হত। এই নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নাট্যকারের ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শ ও সে কালের দর্শকরুচি। নাটকের অন্তপ্রবাহী আবেদন সে দিনের জাতীয় আন্দোলনকেও গতিদান করেছিল। বাঙলাদেশের গ্রামে গঞ্জে শহরে সিরাজদ্দৌলা নাটক মঞ্চ গ্রামোফোন রেকর্ডে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল জনপ্রিয়তার সর্বকালের ইতিহাসে তা স্মরণীয় থাকবে। দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে একই সময়ে একই নাটক (শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা') অভিনয়ের প্রতিযোগিতা বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নেই।[১] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় (আঃ ১৩০২ সালে), মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র ও স্টারে তদীয় শিষ্য অমৃতলাল মিত্র গিরিশচন্দ্র প্রণীত 'প্রফুল্ল' নাট্যাভিনয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' পুস্তকে তার উত্তেজনাকর বর্ণনা পাওয়া যায়।

স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা (১৯৩৮) নাটক দেখে আবেগে বিহ্বলতায় হলের মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। সে ইতিহাস

১. দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯শে ফেব্রুয়ারী, (৬ই ফাল্গুন), বৃহস্পতিবার, ১৯৪৮। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখতে পাই রঙমহল ও মিনার্ভা উভয় মঞ্চে একই সময়ে শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা নাটকের প্রতিযোগিতামূলক অভিনয়। রঙমহল : প্রধান চরিত্রাভিনয়ে, সিরাজ-নির্মলেন্দু, গোলাম—রবি বসু, আলেয়া—রাণীবালা, লুৎফা—রমা। মিনার্ভা : প্রধান চরিত্রাভিনয়ে, সিরাজ—বিপিন গুপ্ত, গোলাম—জহর গাঙ্গুলী, আলেয়া—রাধারানী, লুৎফা—সরযূবালা।

মুদ্রিত হয়ে আছে প্রত্যক্ষদর্শীদের কলমে।[১] ঠিক এর পরেই সুভাষ বসুর নেতৃত্বে বিখ্যাত 'রিমুভ্যাল অব্ ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি মুভমেণ্টে'[২] বৃটিশ সরকার সারা দেশের জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে এই স্মৃতিস্তম্ভটি সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মিনার্ভা মঞ্চে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' দেখে তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতা বালগঙ্গাধর তিলকও অভিভূত হয়ে নাট্যকারকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান।

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনিশ্চয়তা অস্থিরতা হতাশা কম-বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। আবুলহাসান রাষ্ট্রবিপ্লব ধাত্রীপান্না প্রভৃতি নাটকে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা নাটকীয় দ্বন্দ্ব-মুহূর্তগুলি সৃষ্টি করেছে। দর্শকরুচির কথা মনে রেখে নাট্যকার এইসব নাটকেও দীর্ঘ বক্তৃতাধর্মী সংলাপ মানসিক উদ্বেগ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন এবং নাটকের শেষ দৃশ্যগুলি করুণরসাত্মক অতি-নাটকীয় ও আবেগাপ্লুত করে তুলেছেন।

নাটক রচনায় শচীন্দ্রনাথ দর্শকরুচিকে অস্বীকার করেননি কেননা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন: '……নাটক ছাড়া নাট্যশালাকে জাতির সঙ্গে যুক্ত রাখবার আর কোন মাধ্যম নাট্যশালার নেই।' একজন 'যুগনাট্যকারে'র সাফল্য-লাভের পক্ষে যে গুণগুলি থাকা প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে ছিল এবং সেগুলি ছিল স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। অর্থাৎ একদিকে যেমন তিনি দর্শকরুচিকে উপেক্ষা করেননি তেমনি নাটকের আখ্যানবস্তু ও নাট্যআঙ্গিকের গতানুগতিকতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। 'তাঁর মত ব্যক্তিত্বের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তিনি

১. দ্রঃ 'সুভাষচন্দ্র ও মরমী নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলার অভিনয়' (একটি বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা)—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, রূপমঞ্চ শারদীয়া ১৩৭১।

২. বৃটিশ শাসকেরা নবাব সিরাজদ্দৌলাকে অত্যাচারী প্রমাণ করার জন্য লালদীঘির সামনে বিখ্যাত ব্লাকহোল ট্রাজেডি বলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিল। তাদের বক্তব্য সিরাজ যখন কলকাতা অবরোধ করেছিলেন তখন ওই পাঁচ'ছ হাত জায়গার মধ্যে একশ তেইশ জন ইংরেজ পুরুষ মহিলাকে আটক রাখা হয়েছিল। পরের দিন সকালে বন্দীশালার দরজা খুলতে দেখা গেল অধিকাংশ লোকই মারা গেছে।

ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্র প্রমাণ করেন এই কাহিনী ভিত্তিহীন। এর পর বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ করেন ব্লাকহোল ট্রাজেডি বা অন্ধকূপ হত্যা কলকাতায় ঘটেইনি।

দর্শকরুচিকে মেনে নিয়ে তাকে সুকৌশলে উত্তরণ ঘটিয়েছেন অন্য উচ্চতর রুচিতে। 'যুগনাট্যকার' হিসাবে বর্তমান যুগের নাট্য-আন্দোলনের সংগে এই ধারাবাহিকতায় সংযোগ রক্ষার মধ্যেই তাঁর সার্থকতা।

এবার শচীন্দ্রনাথের নাট্যকার-জীবনের শেষ পর্বের নাটকগুলিকে একটি বিশেষ ধারায় বিচার করা প্রয়োজন। কেননা পরিণত বয়সের রচিত নাটক-গুলিতে তিনি পূর্বেকার নাট্যরীতি ও ভাবাদর্শের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এ ধরনের নাটক দর্শকদের মধ্যে তরল আনন্দানুভূতি না জাগিয়ে তাদের চিন্তার গভীরতায় টেনে নিয়ে যায়। এর বিষয়বস্তুও আলাদা—দেশ কাল ও সমাজের নানা সমস্যার গভীরে প্রোথিত। এই সমস্ত নাটকে শচীন্দ্রনাথ মানবপ্রকৃতি রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গুরুতর সূক্ষ্ম ভাবনার বিশ্লেষণ করেছেন। অতিনাটকীয়তা কাহিনীর অসম্ভাব্যতা ও দর্শকের অ-শৈল্পিক রুচি অনুসরণ করার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। অন্তিমপর্বের কয়টি নাটক শচীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও বটে। নাটকগুলিতে দর্শকরুচি অপেক্ষা পরিবর্তিত যুগ-চেতনাই বেশি প্রতিফলিত।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলানাটকে গণ-চেতনার যে স্পষ্ট রূপ সর্বপ্রথম 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকে দেখা গেল, শচীন্দ্রনাথের তৎকালে রচিত নাটক কালো টাকা, এই স্বাধীনতা, সবার উপর মানুষ সত্য, জয়নাদ ও আর্তনাদ প্রভৃতিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। নিপীড়িত মানবাত্মা ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় কুসংস্কার ও সংকীর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত রাজনৈতিক মুনাফার বিরুদ্ধে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের সুতীব্র ঘৃণা কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে এই সমস্ত নাটকে। পূর্বেকার নাটকগুলি থেকে এদের পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যা যুগানুসারী শিল্পভাবনার প্রতি তাঁর গভীর প্রত্যয়ই ফুটে ওঠে। পরিণত চিন্তাভাবনাবিশিষ্ট এই নাটকগুলিতে সস্তা জনপ্রিয়তার আকর্ষণ অনুভব করেননি তিনি অথবা মঞ্চকে সক্রিয় ও সজীব রাখার উদ্দেশ্যে প্রচলিত ধারায় নাটক রচনার আবশ্যকতা বোধ করেননি।

'নবান্ন' বাংলা নাটকের প্রচলিত বিষয় ও রীতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। পরবর্তীকালে শচীন্দ্রনাথ এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে হরিজন আন্দোলনের উপর লেখা নাটক 'দশেরদাবী' (১৯৩৪), জমিদার সামন্ত-আভিজাত্য বনাম নব্যক্যাপিটালিস্ট বণিক সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে লিখিত

'সংগ্রাম ও শান্তি' (১৯৩৯) এবং মেসিন আর মাটির দ্বন্দ্ব নিয়ে 'মাটির মায়া' (১৯৪৩) প্রভৃতি নাটকে তিনি 'নবান্ন' প্রবর্তিত চিন্তাধারার প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন ; অর্থাৎ শ্রমিক কৃষকের উপেক্ষিত ব্রাত্য জীবনকে শচীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম পূর্বোক্ত নাটকগুলির মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন ।

স্বাধীনোত্তর যুগে তাঁর রাজনৈতিক নাটকগুলিতে বিশেষ মৌলিকত্বের চিহ্ন বর্তমান। কালোটাকা, এই স্বাধীনতা, সবার উপর মানুষ সত্য, জয়নাদ ও আর্তনাদ প্রভৃতি নাটকে বাঙলাদেশ ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যজাতি রাষ্ট্র মানবসভ্যতা এবং মানবতাবাদ নানা প্রশ্নাকারে ও বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে। সরস সংলাপ নাটকের বিতর্কিত বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশও দেখা গেল। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে লিখলেনঃ '...পলিটিক্সই আবার নতুন সংস্কৃতি। সুতরাং নাট্যশালা যদি তা বর্জন করে চলতে চায়, তা' হলে জাতির প্রয়াস থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেই এবং তার জীবনরস শুকিয়ে যাবেই, ডানলোপিলোর আসন অথবা অবিরত দু'শ রাত্রির অভিনয় তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।'[১] পরিণত বয়সেও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে প্রাচীন ও নবীনের সংযোগসূত্র হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ।

এই সময়ের নাট্য-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন ঃ '......শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্রনাথ হতাশ হন নাই। তিনি আজও পরিণত বয়সেও নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে চেষ্টার পর চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। প্রতিটি চেষ্টার মধ্যে তাঁহার গভীর চিন্তা ও উপলব্ধির লক্ষণ ফুটিয়া উঠে সূক্ষ্ম ও নিরাভরণ শিল্পের মাধুর্য ও আবেদন লইয়া।'[২]

শচীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ের মাটির মায়া নাটকে শ্রমিক ও কৃষকের আশা-হতাশা ও বিদ্রোহের একটা চিত্র পাওয়া যায়। অতিনাটকীয় সংলাপ অবাস্তব দৃশ্য পরিকল্পনা নাটকের দুর্বলতম অংশবিশেষ হলেও বাংলা নাটকে তা একান্তই মৌলিক ও বৈপ্লবিক। মাধব মোড়ল একজন সত্যিকারের গ্রাম্যচাষী। গ্রামের কৃষক-মহাজনের প্রচলিত সম্পর্কে সে মোটেই সন্তুষ্ট

---

১. 'নাটক সংস্কৃতি ও সরকার'—শচীন সেনগুপ্ত, রূপমঞ্চ শারদীয়া ১৯৫৪ ।

২. 'নূতন নাট্য আন্দোলন'—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ জানুয়ারী, (১৯৫০)।

নয়, রীতিমত বিদ্রোহী। সে ব্যতিক্রম, অস্থির আদর্শবান ও আবেগপ্রবণ। এই মানুষটিকে কেন্দ্র করে নাট্যকার দেখিয়েছেন মাটি ও মেসিনের দ্বন্দ্ব। একটির প্রতি মায়া, অপরটিকে ঘিরে মোহ—এই দুই জটিল দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে মাধব মোড়ল কেবলই অস্থির। তার মৃত্যুতেও সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস করছে শিল্প কারখানা। গ্রামের চাষীরা পরিণত হচ্ছে শ্রমিকে। নতুনভাবে বাঁচার জন্য, দুমুঠো পেট ভরে খেতে পাওয়ার তীব্র বাসনায় গ্রামের মানুষ চলেছে শহরে—এক অন্ধকার অবিচার উৎপীড়ন থেকে আর এক অন্ধকারে, গ্লানি আর দারিদ্র্যময় নর্দমাসিক্ত জীবন-যাত্রার পথে। পরিণতি একই। নাট্যকারের চিন্তায় সাধারণ মানুষের শান্তি কেবলই আশার পথ খুঁজে চলেছে এবং পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হচ্ছে।

নাটকটিতে মঞ্চ সাফল্যের সস্তা উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। অতিনাটকীয় মুহূর্তে অবাস্তব দৃশ্য ও কাহিনী পরিকল্পনায় দর্শকরুচির প্রাধান্য স্পষ্ট। তবে ব্যতিক্রম এর নাট্য বিষয়ে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-ধারার ক্ষেত্রে।

সংগ্রাম ও শান্তি নাটকখানি পূর্বোক্ত নাটকের অনেক আগেই রচিত, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাটির মায়া নাটকে। সংগ্রাম ও শান্তি নাটকেও ঐ একই সুর শোনা যায়। যদিও সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক শ্রমিকের জীবন এই নাটকে মুখ্য হয়ে ওঠেনি কিন্তু তাদের জীবনকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সমাজের সেইসব জমিদার-সামন্তশ্রেণী ও নব্য ক্যাপিটালিস্ট বণিক সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন এই নাটকের মাধ্যমে। এখানেও সমাধান নেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই—নাট্যকার নিজেই নাট্যবিষয়ের মধ্যে দিশেহারা। নাটকের পরিণতিতে সামন্ততন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠা চেয়েছেন কিনা তাও স্পষ্ট নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সুখ নেই শান্তি নেই, আছে পুরনো জমিদারী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাতে—এই ভ্রান্ত ধারণাই নাটকের পরিণতিতে দর্শকদের পরিচালিত করে। মাটির মায়া নাটকেও আমরা এই অসামঞ্জস্য দেখেছি।

আসলে নাট্যকার নিজেই ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। নব্য ধনতন্ত্র ও পুরনো জমিদারতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভালমন্দ—এই উভয় দিক সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের ধারণা থাকলেও নাটকে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে

সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করে তিনি সম্ভবত দর্শকরুচি ও দর্শক-মানসিকতাকে মনে রেখে তা পারেন নি। তৎকালীন দর্শকেরা ছিলেন সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের মানুষ, সুতরাং যন্ত্রের জয় দেখানো নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কথা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত নাট্যবিষয়ের বাইরে রাখেন নি, বরং এ ব্যাপারে তাঁর অগ্রগামী ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকখানি প্রথম থেকেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বেতারেও এই নাটকটি প্রচারিত হয়।

সতু সেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তন করলেন; কিন্তু এই ধরনের মঞ্চোপযোগী নাটকের খুবই অভাব ছিল। শচীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন—তটিনীর বিচার, সংগ্রাম ও শান্তি, নার্সিংহোম প্রভৃতি একের পর একটি নাটক রচনা করে চললেন। নতুন ধরনের যে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ; যেমন ওয়াগন মঞ্চ তেমনি ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এ বিষয়ে অন্যতম অগ্রণী নাট্যকার।

কেবলমাত্র মঞ্চ ও নাট্যআঙ্গিকের ক্ষেত্রেই নয়, নাট্যবিষয়ের ক্ষেত্রেও তিনি কোনদিন স্থির ধারণাকে আঁকড়ে থাকেননি। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ধারণাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলা নাটকে একটা যুগান্তরের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। যদিও শচীন্দ্রনাথ এর বহু আগেই সংগ্রাম ও শান্তি, মাটির মায়া, দশের দাবী, নরদেবতা প্রভৃতি নাটকে বিষয় ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। আর এই কারণে 'নবান্নে' যুগ পরিবর্তনের ইঙ্গিত তিনি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন পেশাদারী মঞ্চের যুগ শেষ হয়েছে, এখন শুরু সৌখীন রঙ্গমঞ্চের জয়যাত্রা। নাট্যআন্দোলন নাটকবিচার নাট্যআঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটল।

এই সময় থেকে নাটকের বিষয়বস্তুতে রাজনীতি ও সমাজদর্শন একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। দেশে দেশে সমাজ পরিবর্তনের ঢেউ ভারতবর্ষের মাটিকেও আন্দোলিত করেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে বাংলাদেশ আবার সকলের অগ্রভাগে। এর শিল্প-সাহিত্যে রাজনৈতিক ও

সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ যেমন এই ধারাকে স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনি নিজেকেও প্রস্তুত করেছেন নতুন রীতির নাটক নির্মাণে।

উল্লেখ্য, শচীন্দ্রনাথের 'নবান্ন' পরবর্তী অধিকাংশ নাটক আইডিয়া প্রধান। ঘটনা এখানে আইডিয়াকে অনুসরণ করেছে। সেইজন্য তা নিছক রুচির অনুগামী না হয়ে তাতে জটিল সামাজিক ও মানবিক সমস্যামূলক চিন্তাভাবনা মুখ্য হয়ে উঠেছে। কালোটাকা (১৯৪৮), স্বাধীনতার সাধনা (১৯৪১), এই স্বাধীনতা (১৯৪৯), ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর (১৯৫৩), অন্তরাগ (?) সবার উপর মানুষ সত্য (১৯৫৬), জয়নাদ ও আর্তনাদ (১৯৬১) প্রভৃতি নাটক শচীন্দ্রনাথ মঞ্চের তাগিদে রচনা করেননি।

কালোটাকা নাটকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে বড়দিনে (১৯৪৮) অভিনীত হয়। পরিণত বয়সের রচনা অথচ নাটকে অঙ্কিত চরিত্রগুলি নবীন হাতের তুলিতে সজীব হয়ে উঠেছে। এখানে নবীনের মুক্ত প্রসারিত দৃষ্টির সংগে প্রবীণের অভিজ্ঞতার আলো মিশে নাটকখানি শিল্প-রসোত্তীর্ণ হয়েছে। নাটকটি গুণীজনের প্রশংসা পায়। সংলাপ-নৈপুণ্য ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নাটকখানিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নাটকের প্রধান চরিত্র পরিতোষের চোরাকারবারি স্বরূপটি নাট্যকার বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। চোরাকারবারিরা দেশের শত্রু মানুষেরও শত্রু কিন্তু সব-কিছু অতিক্রম করেও পরিতোষ নিজের পারিবারিক জীবনেই সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি পায়। চোরাকারবারি স্বামীর বিদুষী স্ত্রীর মানসিক ট্রাজেডিটিও গভীর উপলব্ধির মধ্যে সার্থক হয়েছে। রসসাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখেছেন: 'এ যুগের সবচাইতে কঠিন সমস্যা নিয়ে রচিত শচীন দা'র নাটকের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের তরোবারি ক্রীড়ায় সরযূবালা, জহর ও অঞ্জলি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলেই সাধারণ দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছে—গান ও বেলেল্লাপনার অভাব তাঁদের অধীর করে তোলবার অবকাশ পাচ্ছে না। এ পথে চললে রঙ্গমঞ্চ একদিন আধুনিক পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের সমকক্ষ হতে পারবে আশা করি।'[১] যখন বাংলা নাট্য আন্দোলনে নতুন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটছে, পুরাতন বিষয়

১. দ্রঃ বিজ্ঞাপন, আনন্দবাজার পত্রিকা। ৯ জানুয়ারী ১৯৪৮।

ও আঙ্গিক সম্পূর্ণ বর্জন করে নতুন বিষয় ও পাশ্চাত্য আঙ্গিকে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, এই সময় পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত শচীন্দ্রনাথের 'কালোটাকা'র যুগোপযোগী বিষয়-ভাবনার প্রকাশ তাঁর চিরনবীন নাট্যপ্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।[১] জীবনের গভীর মূল্যবোধ এই নাটকে পরিস্ফুট।

শচীন্দ্রনাথের নাটকে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বক্তব্যের বলিষ্ঠতা। বিশেষ করে তাঁর শেষ পর্যায়ের নাটকগুলিতে দেশ সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বাধীন মত ও চিন্তার পরিচ্ছন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। 'এই স্বাধীনতা' নাটকখানিতে নাট্যকারের সত্যকথনের স্পষ্টতা অপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে নাট্যবিষয়ে ও নাট্যকারের স্বাধীন ভাবনায় একটি বিশেষ মাত্রা (ডাইমেনশান) আনতে সক্ষম হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ যেহেতু যুগসচেতন সেই কারণে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাটিকেও তিনি অনায়াসে নাটকে স্থান দিয়েছেন। 'নবান্ন' পরবর্তী সময়ে তাঁর অধিকাংশ নাটকে রাজনীতির ছোঁয়া লেগেছে আর তাতে বলিষ্ঠ ও স্বাধীন মত ব্যক্ত হয়েছে।

'এই স্বাধীনতা' মূলত রাজনৈতিক নাটক। দেশবিভাগের ফলে বাস্তুহারা কিছু মানুষ অসহায়ভাবে স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে কিভাবে ছিন্নমূল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের নৈতিক অধঃপতন দারিদ্র্য প্রতিহিংসা আর সেই সঙ্গে হতাশার অন্ধকারে বিদ্যুৎচমকের মত তাদের মানবিক ঐশ্বর্য ক্ষমা প্রেম আর হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে এই নাটকে। মানুষের দোদুল্যমান চিত্তের অনিশ্চয়তা সংশয় ও অবিশ্বাসের মাঝখানে জীবন-প্রত্যয়ের বাণীও শুনিয়েছেন নাট্যকার, নাটকটিতে তিনি রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরেছেন। তবে নাট্যকার নিজেই বলেছেন: 'সমস্যার সমাধান নাট্যকারের কাজ নয়। তা হচ্ছে প্রবন্ধকারের কাজ, রাষ্ট্র পরিচালকের কাজ।'[২]

১. "প্রবীণ নাট্যকারের এই নতুন নাটকখানি সকল দিক দিয়াই নূতন। এমন একখানি সুরচিত, সুঅভিনীত এবং সুপ্রযোজিত নাটক বহুদিন রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় নাই। কালোকারবারীরা কেবল যে রাষ্ট্রসমাজের অমঙ্গল করিতেছে তাহাই নয়, পারিবারিক বেষ্টনীতেও যে আদর্শের সংঘাতজনিত অশান্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে, একটি পারিবারিক কাহিনী সৃষ্টি করিয়া নাট্যকার সমগ্র অমঙ্গলটির একটির পরিপূর্ণ রূপ দিয়াছেন।" —নাট্য সমালোচক। 'মিনার্ভায় কালোটাকা'। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮, রবিবার। ২. দ্রঃ 'এই স্বাধীনতা' নাটকের ভূমিকা।

নাটকটি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় 'পনেরই আগস্ট' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। নাট্যকারের কথা অনুসরণ করে বলা যায় নাটকটি পৃথক ধরনের লেখা। অবশ্য শচীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের প্রতিটি নাটক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করেছে। একটির সঙ্গে অপরটির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'এই স্বাধীনতা' কোন অঙ্ক ও দৃশ্য দ্বারা বিভক্ত নয়। কাহিনীকাল বারো ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ। নাটকখানি মঞ্চসফল না হলেও এর বিষয় ও ভাবনার গভীরতায় চিন্তাশীল দর্শকগণ অভিভূত ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বাধীনতা নাটকের দীর্ঘ সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন 'কিছুকালপূর্বে মিনার্ভায় তাঁহার 'কালোটাকা' এমনি একটি অভিনব নাটক দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছিলাম। বর্তমানে রঙমহলে তাহার নূতন নাটক 'এই স্বাধীনতা' দেখিয়া আবার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহাকে নমস্কার জানাইতেছি। নাটকটি অভিনব। বারোঘন্টার কাহিনী এবং সে কাহিনী আজিকার দিনের কাহিনী। যে সমস্যা আজ সমগ্র বাঙালীর জীবনকে মর্মান্তিক-ভাবে বেদনায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, সেই সমস্যার পীড়নে পীড়িত জীবনের বেদনার্ত কাহিনী……

যেমন নাটকের পরিকল্পনা—তেমনি শাণিত ব্যঞ্জনাদীপ্ত সংলাপ—তেমনি সত্যকে স্বরূপে আবিষ্কারের দৃষ্টি……'[১]

অথচ নাটকখানা নিয়ে সে সময় কম জল ঘোলা হয়নি। বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক দলের তুমুল বিরোধিতা ও বিরূপ সমালোচনা নাট্যকারকে সহ্য করতে হয়। শচীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে এর উল্লেখ করে লিখেছেন: '……স্বাধীনতার পর আমি একখানা নাটক লিখি যাতে করে উদ্বাস্তুদের জন্য দেশের কি কি সমস্যা দেখা দেবে, তারই একটা ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছিলাম এবং বলেছিলাম স্বাধীন রাষ্ট্রকেই ওর সমাধান করতে হবে।……নাটকখানা ভালো কি মন্দ হয়েছিল তা আলোচনার কথা নয়। আলোচনার কথা এই যে, পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলেরা মায় হিন্দু মহাসভা ওর অভিনয় বন্ধ করার প্রচারণা করতে লাগলেন এবং অভিনেতৃদেরকে কোন একটি দল ভয়ও দেখালেন

১. 'নূতন নাট্য আন্দোলন'—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ জানুয়ারী, ১৯৫০।

যে স্টেজের ওপর বোমা ফেলা হবে। মালিক একদিন অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। ওতে স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম, কংগ্রেসের নীতির কিছু সমালোচনা করেছিলাম এবং একটি হিন্দু মেয়ের সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলের প্রণয় এবং প্রণয়ভঙ্গ দেখিয়েছিলাম।'[১]

দেশ বিভাগের শোচনীয় পরিণতি এবং মুসলমান ও হিন্দু যুবকযুবতীর সমাজ অননুমোদিত প্রণয় নিয়ে সম্ভবত এটিই সর্বপ্রথম রচিত বাংলা নাটক। নবান্ন নাটকের সংলাপ ছিল একটি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। 'এই স্বাধীনতা' নাটকেও শচীন্দ্রনাথ পূর্ববাঙলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করছেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা উল্লেখ করার মত। বাংলা নাটকের বৈচিত্র্যের সন্ধানে তাঁর নিরলস নাট্যপ্রতিভা পরিণত বয়সেও সক্রিয় ছিল। একারণে বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে শচীন্দ্রনাথের স্থান গুরুত্বপূর্ণ একথা তাঁর সমসাময়িক একাধিক সমালোচকই স্বীকার করেছেন।

পূর্ব-আলোচিত নাটকগুলি ছাড়া শেষ জীবনে আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন, যেমন 'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর' 'জয়নাদ ও আর্তনাদ' 'অস্তরাগ' 'সবার উপরে মানুষ সত্য' প্রভৃতি। নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়নি। নাট্যকারের শেষ পর্বের সর্বশেষ এই কয়খানি নাটকের সাহিত্যমূল্যে ও গুণগত নাটকীয় উৎকর্ষ নাট্যকারের প্রজ্ঞা ও মননের পরিচয় বহন করলেও এগুলি এ-যাবৎ মঞ্চস্থ হয়নি। সম্ভবত নাটকগুলির মঞ্চসাফল্য সম্পর্কে প্রযোজকদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

বস্তুত, 'দর্শকরুচি' যুগের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে অনুসরণ করে থাকে। আর এই কারণে শচীন্দ্রনাথের উপান্ত্য জীবনে রচিত নাটকগুলিতে যুগানুসারী চিন্তাধারাই ব্যক্ত হয়েছে। কালোটাকা, এই স্বাধীনতা নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতাই উপজীব্য বিষয় হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় ও ভাবনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়; মানবিক মূল্যবোধের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্বাধীন ভারতবর্ষের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন দেখা গেছে। স্বাধীনোত্তর দেশে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বপ্ন গেছে মুছে। শচীন্দ্রনাথ স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন, পুঁজিবাদী সমাজ-

১. পুনশ্চ নাটকের পুরোণো কথা—শচীন সেনগুপ্ত, শারদীয়া যুগান্তর ১৩৬৬।

ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। রাষ্ট্রনেতা ও শাসকশ্রেণীর মিথ্যে আশ্বাস, ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির নির্লজ্জ প্রয়াস, অন্যায় অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমাজের দুষ্ট ক্ষত উন্মোচিত করে দিলেন তাঁর শেষ পর্বের নাটকে। এই সময় গণনাট্য সংঘের প্রথম যুগের নাটকের সঙ্গে তাঁর শেষ কয়েকখানা নাটক সমান তালে না চললেও তিনি ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক ও পরম বন্ধু। শেষপর্বের নাটকে শচীন্দ্রনাথ দেশ জাতি ও সমাজ সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন —মানবপ্রেম যেখানে সকল অনৈক্য বিচ্ছিন্নতা হিংসা ও অশান্তির একমাত্র সমাধান। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন নানান অভিজ্ঞতায়, মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার শৈল্পিক অভিব্যক্তি ঘটেছে এই পর্বের নাটকে। দর্শকরুচি অথবা মঞ্চসাফল্য নিয়ে তিনি এসময় আদৌ চিন্তিত ছিলেন না। যদিও বহুবার স্বীকার করেছেন, মঞ্চ সফলতা ছাড়া নাটক রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। শচীন্দ্রনাথের পরে মঞ্চসাফল্য অর্জনে গণনাট্য ও অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলি নতুন যুগের সূচনা করে। নাট্যশালা এখন কেবলমাত্র ধনী ও মধ্যবিত্তদের চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে রইল না, তা শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনার পীঠস্থান হিসাবে পরিগণিত হল। 'দর্শকরুচি' শব্দটি তাই কোন একসময় 'দর্শকমনন' শব্দে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এখন নাটকের সমালোচনায় 'দর্শকমনন'-এর কষ্টিপাথরে বিচার করা হয়। অবশ্য, স্বাধীনতা-পূর্বে বাঙলানাট্যমঞ্চে 'দর্শকরুচি'ই ছিল নাটক বিচারের মানদণ্ড মঞ্চসাফল্যের চাবিকাঠি এবং বাঙলা নাট্যমঞ্চকে সজীব ও গতিশীল রাখার একমাত্র প্রেরণা।

চার

॥ মঞ্চ-আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ॥

রঙ্গমঞ্চ হলো জীবনকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত করার একটি শিল্পমাধ্যম, তা কখনো কখনো বাস্তবোচিত হলেও বাস্তব নয়—একটা ইঙ্গিত মাত্র। দর্শক স্বীয় কল্পনাবলে তাতে জীবনের সত্য উপলব্ধি করেন।[১] দৃশ্যপট মঞ্চসজ্জা আবহসঙ্গীত আলো অভিনয় পরিচ্ছদ অঙ্গরাগ (মেকআপ) ইত্যাদি নাটকের প্রকৃত রূপকে ফুটিয়ে তুলতে অভিনেতাকে সক্রিয় সাহায্য করে—এ সবই মঞ্চ-আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগে ক্রমবর্ধমান চলচ্চিত্র-প্রীতিকেও নাট্যপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত রেখে স্লাইড-প্রজেকশন দ্রুতদর্শন মঞ্চমায়া প্রভৃতি মঞ্চ-আঙ্গিকে যুক্ত হয়েছে।

শচীন্দ্র-নাটকের মঞ্চ-প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন মঞ্চরীতির আলোচনা শুরু করার আগে প্রাক্-শচীন্দ্রযুগ এবং সমসাময়িক কালের মঞ্চরীতি ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বাংলারঙ্গমঞ্চের বিবর্তনে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

কবি ও নাট্যকার মধুসূদনের সময় থেকেই বাংলা নাটক ও নাট্যশালা নিয়ে যথার্থ চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। এ সময় বাংলা থিয়েটার কলকাতার বিদেশীদের থিয়েটারকে আদ্যন্ত অনুকরণ করেছে।[২] সাহেবদের থিয়েটার দেখে

1. "The stage presents a world of illusion, and even the so-called Realism is not Reality. What is presented is a suggestion of conditions assumed to exists, an illusion of Reality, and if the suggestions is made sensibility, the audience will see the Reality imaginatively". (Lighting the stage—P. Corry, P-12)

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'নাটক হচ্ছে রঙ্গভূমিতে উপস্থাপিত জীবনের প্রতীতিগ্রাহ্য প্রতিফলন।' (পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন—ভূমিকা)।

২. 'আমাদের দেশে প্রসিনিয়াম স্টেজে অভিনয়ের গোটা ব্যাপারটাই বিদেশীদের কাছ থেকে ধার করা। অভিনয়ের ঐতিহ্য আমাদের নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু 'প্রসেনিয়াম স্টেজে' দৃশ্যপট খাটিয়ে অভিনয় করার ব্যাপারটা আমরা জানতাম না।' বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যসজ্জার বিবর্তন—গণেশ মুখোপাধ্যায় (শতবর্ষে নাট্যশালা)।

ধর্মদাস যে সিনগুলো এঁকেছিলেন, প্রথম প্রথম তাতে না থাকত 'ডায়মেনশন' না 'পারস্‌পেকটিভ'। 'উইংস' এঁকেও দৃশ্যপটের অভাব মোচনের চেষ্টা হত। ক্রমশঃ 'কার্পেণ্টার্স সিন' বা 'ফ্ল্যাট সিনে' দৃশ্যপট অঙ্কিত হল। 'গুটানো সিনে' দরজা দেওয়া খোলা ইত্যাদি দেখানো সম্ভব ছিল না, তার জন্য দরকার 'সরানো সিন' (কার্পেণ্টার্স সিন)। এ ছাড়া যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ময়দানে অলিম্পিক থিয়েটারে গিয়ে দৃশ্যসজ্জার নতুন নতুন কৌশল শিখেছিলেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চে তার প্রয়োগও করেছিলেন।[১]

মঞ্চসজ্জার অন্যতম উপাদান হলো আলোকসম্পাত। বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে গ্যাসের বাতি ছিল একমাত্র ভরসা, তার আগে রেড়ীর তেলের সেজ ও মোমবাতি ব্যবহার হত। সহজে অনুমেয় তাতে মঞ্চ স্পষ্ট হত না, পেছনের সারির দর্শকদের কাছে অভিনেতার অভিব্যক্তি এবং দৃশ্যপট উভয়ত অস্পষ্ট থাকত। বলা বাহুল্য, বাংলা রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার থিয়েটার শিল্পে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

প্রথমদিকে মঞ্চে ফ্ল্যাড স্পট এবং আর্কল্যাম্পের ব্যবহার হলেও তা যথাযথ ছিল না। আবহসংগীতে ছিল বিলেতী কনসার্টের ব্যবস্থা, পরবর্তীকালে করুণ ও বীররস এবং ক্লাইমেক্‌সের ক্ষেত্রে বেহালা ক্লারিওনেট নানা পর্দার আড়বাঁশী ও ঝাঁজ ব্যবহৃত হত। অভিনেতাদের সাজপোশাক এবং মেকআপ বা অঙ্গরাগে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না। চরিত্রোপযোগী সাজ এবং অঙ্গরাগের তাৎপর্য উপলব্ধি হয়েছে অনেক অনেক পরে। এবিষয়ে শিশির ভাদুড়ী সর্বপ্রথম সচেতন শিল্পী ও প্রযোজক বলে জানা যায়। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি নতুন ভঙ্গি, পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট উচ্চারণ এবং বাস্তবোচিত রীতি প্রবর্তন করেছিলেন।

যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটক (১৯২৪) প্রযোজনায় মঞ্চ-প্রয়োগ ও অভিনয়ের প্রচলিত রীতিতে পেশাদারী মঞ্চে সর্বপ্রথম পরিবর্তন দেখা গেলো।[২] শিশিরকুমারের এই অবদানের পেছনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল সর্বাধিক।

১. দ্রঃ পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়)—বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃ-১৭২।
২. 'সীতার সর্বত্র নতুনত্ব, আদ্যন্ত নতুনত্ব, ভিতরে বাহিরে নতুনত্ব'—ইন্দ্রমিত্র। সাজঘর, পৃঃ ৩১৬।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের নাটকেই প্রথম প্রচলিত নাট্যধারায় ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল, প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর মঞ্চ-বৈশিষ্ট্য গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করেছিল।

জানা যায়, সীতা নাটকের প্রযোজনা শচীন্দ্রনাথকে নাট্যকার-জীবনে উৎসাহিত করে তোলে। সীতা নাটকের অভিনয়ে মঞ্চ-সজ্জায় দেখা গেল রুচি ও শালীনতাবোধ এবং জাতীয় চেতনার প্রকাশ। 'সীতা'র অভিনয় দর্শন করে শচীন্দ্রনাথের নাট্যরুচি এক নতুন পথের সন্ধান পেল। তিনি বুঝলেন, কেবল বিষয়ের বৈচিত্র্যই দর্শকদের মুগ্ধ করে না, নাটকের আঙ্গিক-বৈচিত্র্য মঞ্চ উপস্থাপনার অভিনবত্বও দর্শকদের উৎসাহিত করে। এছাড়া সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চও একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পায়। পরবর্তীকালে শচীন্দ্রনাথ নাট্যরচনার এই পথটি সর্বদা অনুসরণ করতেন।

তবে প্রযোজনার ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের রুচি গতানুগতিকতা বিরোধী হলেও নাট্য বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে অধিকতর 'আধুনিক' নাটক প্রযোজনায় তিনি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। এ বিষয়ে প্রথম থেকেই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগ্রণী ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক নাটকের আখ্যানবিষয় আঙ্গিক ও মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তর আনলেন। নাট্যবিষয়ের গতানুগতিকতা ভেঙে তিনি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন তাতে রঙ্গালয়ের দর্শক-সাধারণ একযোগে চমকিত ও চমৎকৃত হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চের স্থূল দৃষ্টিভঙ্গি সূক্ষ্ম শিল্পরুচিতে রসাভিষিক্ত হল। শচীন্দ্রনাথের একক প্রচেষ্টায় রংগমঞ্চে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়, আমেরিকা প্রত্যাগত প্রয়োগবিদ সতু সেনের সহযোগিতায় তা সার্থক হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, অত্যাধুনিক মঞ্চ পরিকল্পনার জন্য তাঁরও প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত নাটকের। সে দায়িত্ব সম্পাদন করে শচীন্দ্রনাথ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আধুনিক নাটকের একটা রূপরেখা তুলে ধরতে পেরেছিলেন। বস্তুত, আখ্যান-বৈচিত্র্যের সঙ্গে মঞ্চ ও আলোক-বৈচিত্র্যের মিলনে সেদিন এক নাট্য-আন্দোলনের রূপ নেয়। তাই বলা চলে, এই নব-যজ্ঞের পুরোহিত যদি শচীন্দ্রনাথ, তবে সতু সেন তাঁর যজ্ঞ-সেনা। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে জাতীয় পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত রীতির পরিবর্তন ঘটানোর আংশিক কৃতিত্ব সতু সেনেরও।

স্থিতিশীল মঞ্চে এলো প্রাণ, এলো গতি। সতু সেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তন করলেন, শব্দ ও আলোর মায়াজাল সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এর উপযুক্ত

প্রয়োগের জন্য দরকার ছিল শচীন্দ্র-নাটকের। অতীত দিনের দর্শকরা তাই স্মৃতি রোমন্থন করেন 'ঝড়ের রাতে'র দৃশ্যগুলি আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সার্থক ব্যবহার ঘটেছিল যে নাটকটিতে সর্বপ্রথম সেই 'তটিনীর বিচার'-এর।

ঝড়ের রাতে (১৯৩১) নাটকের অভিনবত্ব সেদিন নাট্যরসিক দর্শক ও সমালোচকদের যে গভীর আলোড়িত করেছিল তার নিদর্শন তৎকালীন বহু পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।[১] প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন : 'ঝড়ের রাতের আলোকসম্পাত বিদ্যুতের ঝলসানিতে, বৃষ্টির শব্দে, রাস্তায় মোটরের হর্ণের আওয়াজে সতু সেনের দক্ষতা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।........."ঝড়ের রাতে"......নাটকও স্বতন্ত্র রকমের। এক দৃশ্যের নাটক, কিন্তু অভিনয় হয় তিন ঘণ্টাব্যাপী।'

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা নাটক ও নাট্যশালা গ্রন্থে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সতু সেনের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে মঞ্চ-প্রযুক্তিবিদ্যাকে তিনি এদেশের অনুন্নত রঙ্গমঞ্চের সেবার কাজে লাগিয়েছিলেন। শচীন্দ্রনাথের নাটকগুলি সতু সেনের মঞ্চ-প্রয়োগরীতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করেছে। বাংলা নাট্যশালায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তন, মুড লাইটের যথার্থ প্রয়োগ এবং উন্নত মঞ্চসজ্জা সৃষ্টিতে সতু সেনের অবদান অনস্বীকার্য। নাট্যকারের পক্ষে যা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র নাট্য সংলাপের সাহায্যেও দর্শকচিত্তকে আকৃষ্ট করা যায় না ; তখন সঠিক মুড লাইটের ব্যবহারে অভিনেতাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং

১. ৯ম সংখ্যার 'ধূমকেতু' পত্রিকা (১৩৩৮) 'ঝড়ের রাতে'র প্রযোজনা সম্পর্কে লিখেছে : 'ঝড়ের রাতে'......প্রযোজনার দিক থেকে শ্রীযুক্ত সতু সেন শুধু যে সাফল্য লাভ করেছেন তাই নয়, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এ ধরনের প্রযোজনা আর ইতিপূর্বে হয়েছে বলে মনে পড়ে না, ঝড়ের শব্দ এবং বৃষ্টির আবহাওয়া এমন চমৎকারভাবে বাইরে জমে উঠেছিল যে তা এখনও কানে বাজে।'

দ্র : 'আত্মস্মৃতি'—সত্যেন্দ্রনাথ সেন (সতু সেন) এক্ষণ/শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৮

দ্র : আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—সতু সেন/সম্পাদনা : অমিতাভ দাশগুপ্ত

অভিনেতাদের বাচনভঙ্গী দর্শকের অন্তর স্পর্শ করল।[২] এ ছাড়া, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তনের ফলে নাটকে এলো গতি—চলচ্চিত্রের গতিধর্মিতা নাটকে সঞ্চারিত হওয়ায় নাটক যুগোপযোগী হল।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বিসর্জন নাটকের প্রথম দৃশ্যে যে সাময়িক মুড লাইট ব্যবহার করতেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শচীন্দ্রনাথের 'ঝড়ের রাতে', 'কামাল আতাতুর্ক' ও তাঁর সমসাময়িক 'শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে সতু সেনের আলোর ব্যবহার দর্শকের বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং অভিনীত চরিত্রকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিল।

কেবল মুডলাইট নয়, সামাজিক নাটকের সেটিংসেও সতু সেন বাস্তবতা আনলেন। বাস্তবসম্মতভাবে সেট ও দৃশ্যসজ্জা রচনায় সত্যকারের চেয়ার টেবিল খাট প্রভৃতি খুঁটিনাটি মঞ্চে নিয়ে এলেন। সামাজিক নাটকের প্রতিটি সেটই (বৈঠকখানা শয্যাগৃহ প্রভৃতি) বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। পেশাদারী বাংলা রঙ্গমঞ্চে এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা এই প্রথম। শচীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক নাটকগুলি সতু সেনের মঞ্চসজ্জার উৎকৃষ্ট নিদর্শন ছিল। এ বিষয়ে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথও নতুন নতুন আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক রচনা করে সতু সেনের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করেছিলেন।

শচীন্দ্রনাথই প্রথম নাট্যকার যিনি সমসাময়িক চলচ্চিত্রের গতিশীলতা ও জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখে নাটকের আঙ্গিক দৃশ্য ও সংক্ষিপ্ত সংলাপ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম সামাজিক নাটক 'রক্তকমলে' দ্রুত গতির আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়েছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের অভাবে নাটককে চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তুলে ধরার প্রকৃত সাহস একমাত্র তাঁরই ছিল।

রঙমহলে সতু সেনের সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চের পাশাপাশি নাট্যনিকেতনে

I, The actor relies on facial expression to convey that important part of the play that cannot be written by the author or solely expressed in the words that are spoken ; the actor must show to the audience what he is thinking and feeling, assuming, of course, that he is thinking and feeling. It must be remembered also that it is much more difficult for the audience to hear the words that are spoken if it is difficult to see the actors clearly" (Lighting the stage : 'Why lighting is important' —P. Corry : P—II).

শচীন্দ্রনাথও মঞ্চকে গতিশীল করার মাধ্যমে নাটকের দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ওয়াগন বা শকটমঞ্চ সেই চেষ্টার ফসল। জননী নাটকে (১৯৩৩) সর্বপ্রথম ওয়াগন মঞ্চ ব্যবহৃত হয়, পরে নিরুপমা দেবীর 'মা' নাটকে তার সার্থক প্রয়োগ হয়। নিচে চাকা লাগানো ওয়াগন মঞ্চকে ঘোরাতে হত বাঁশের সাহায্যে। 'জননী' নাটকে স্বয়ং নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ এবং প্রযোজক প্রবোধ গুহ কখনো কখনো এই কাজে লেগে যেতেন।[১]

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সতু সেনের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তন এক স্মরণীয় ঘটনা। এর একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও আছে। এই সময় চলচ্চিত্রের ক্রম-জনপ্রিয়তা বাংলা রঙ্গালয়কে ক্রমশই দর্শকশূন্য করে তুলছিল। অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করে রঙ্গালয়গুলি একের পর এক ধুঁকছিল। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' চলচ্চিত্রসুলভ বিষয়বস্তু প্রবর্তন করলেও চলচ্চিত্রসুলভ গতির জন্য দরকার ছিল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সাহায্যে কোনরূপ অযথা সময়ক্ষেপ না করে দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তনের দ্বারা নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

রঙমহলে মহানিশা (১৯৩৩) নাটকে সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তিত হয়। সতু সেন ও নরেশ মিত্রের যুগ্ম পরিচালনায় এই সময় যতগুলো নাটক মঞ্চস্থ হয় তাতে কেবলমাত্র দৃশ্য পরিবর্তনের সুবিধাজনক মাধ্যম হিসাবেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে ব্যবহার করা হয়, এর বেশি নয়। সে সময় এই বিশেষ ধরনের মঞ্চোপযোগী নাটকের খুবই অভাব ছিল। সুদীর্ঘ সংলাপ, দীর্ঘস্থায়ী বীররসাত্মক 'অ্যাকশন'-বহুল দৃশ্য—প্রচলিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের আঙ্গিক এই মঞ্চের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। শচীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উপযোগী নাটক রচনা করলেন। তাঁর তটিনীর বিচার, সংগ্রাম ও শান্তি, নার্সিংহোম, পথের দাবী প্রভৃতি নাটকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সার্থক ব্যবহার হয়। তটিনীর বিচার নাটকে এর ব্যবহার[২] বিপুল দর্শককে আকৃষ্ট করে।

---

১. দ্রঃ বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, দৈনিক বসুমতী, ১০ মার্চ, ১৯৬১।

২. 'শচীন্দ্রনাথ লিখলেন নতুন নাটক' 'তটিনীর বিচার'—যাতে দৃশ্যগুলি এমন ভাবে রচিত যে, তার অভিনয়ের পক্ষে ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ একেবারে অপরিহার্য। অর্থাৎ অন্য সব 'অনড়' রঙ্গমঞ্চে এ নাটক অভিনীত হওয়াই সম্ভব নয়!'—শ্রীমনোমোহন ঘোষ (বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীন্দ্রনাথ) দৈনিক বসুমতী। ১০ মার্চ, ১৯৬১

ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটে গেল। নাটকে দৃশ্য বিভাগ আর রইল না। অধিকাংশ নাটক তিন অঙ্কেই শেষ হল। দৃশ্য পর্যায়ে পারম্পর্য রক্ষার জন্য অকারণ গান নাটককে ভারাক্রান্ত করলো না। ছোট ছোট সংলাপ, প্রতিটি দৃশ্যের শেষ সংলাপের সঙ্গে পরবর্তী দৃশ্যের প্রথম সংলাপের মিল রাখায় দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তনের ফলে দর্শকের মন কাহিনীর গতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়—ঘূর্ণায়মান মঞ্চের বৈশিষ্ট্য শচীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে এই ভাবে সার্থকতা লাভ করে। এর প্রচলনে সেট সিনের ব্যবহার সুবিধাজনক হলো। ওয়াগান মঞ্চের অসুবিধাও অপসারিত হল।

চলচ্চিত্রের ক্রম-জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে প্রয়োজন হল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ও চলচ্চিত্রসুলভ দ্রুতগতিসম্পন্ন নাট্যকাহিনীর। এই সচেতন প্রয়াসের ফলে শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সামাজিক নাটক অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে। আর এই সাফল্যের পেছনে অতিনাটকীয় ও চলচ্চিত্রসুলভ কাহিনী রচনার পাশাপাশি মঞ্চ-কলাকৌশল আলো শব্দ প্রভৃতির উন্নত ব্যবহার প্রচুর সাহায্য করেছিল।

মঞ্চ-কলাকৌশলের ক্ষেত্রে সতু সেন ছাড়া তাঁর নাটককে জনপ্রিয় করতে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পরেশ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। স্বামী স্ত্রী (১৯৩৭) নাটকে তিনি যে মঞ্চসজ্জা করেছিলেন তা এককথায় ছিল অনবদ্য। নাটকের কয়লাখনির দৃশ্যটিতে ক্রেনের সাহায্যে নায়ক ললিত (দুর্গাদাস) খনি অভ্যন্তরে ওঠানামা করছে, কখনো কর্মীদের নামিয়ে দিচ্ছে; প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে এখনো তা স্পষ্ট ছবির মত।[১]

এই সময় থেকে মঞ্চে আঁকা সিনের ব্যবহার সঙ্কুচিত হওয়ায় কোথাও কোথাও একেবারে তুলে দেওয়া হয়। তার বদলে সতু সেনের প্রবর্তিত 'বক্‌স সেট' দৃশ্যসজ্জার প্রধান উপকরণ হিসাবে প্রচলিত হল। বিশেষত বাংলা সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে যেখানে ঘরোয়া দৃশ্য মুখ্য, বক্‌স সেটের সাহায্যে বাস্তবসম্মত করে তুলতে জুড়ি নেই। শচীন্দ্রনাথের সময়ের 'আধুনিক' সামাজিক নাটককে 'ড্রয়িংরুম ড্রামা' বলা হত। রবীন্দ্রনাথ নাটকের এই রীতিটি পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা নাটকে আমদানী করেন, প্রয়োগবিদ সতু সেনও পশ্চিমী শিক্ষাকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যথাযথ ব্যবহার করে এই ধরনের নাট্য আঙ্গিক সফল করেছিলেন।

১ 'কয়েকজন স্মরণীয় স্রষ্টা'—সন্তোষ সিংহ (শতবর্ষে নাট্যশালা)

বস্তুত, মঞ্চ প্রয়োগ রীতিতে সতু সেনের পর বাংলা রঙ্গমঞ্চে অদ্যাবধি বিশেষ কিছুই নতুন সংযোজিত হয়নি। বর্তমান পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এবং আধা-পেশাদারী নাট্যসংস্থাগুলিতে সতু সেন প্রবর্তিত মঞ্চ ও আলোকসম্পাত রীতিই অনুসৃত হচ্ছে।[১]

শচীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের গতানুগতিক মঞ্চরীতির পুরনো ধারার মধ্যেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। গৈরিক পতাকা (১৯৩০) নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁর কথা থেকেই জানা যায়, নাটকের স্থান ও কালানুযায়ী দৃশ্যপটগুলি ছিল স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ। বিশেষত কামান দেগে দুর্গ ধ্বংস আর আলোকসম্পাতের সাহায্যে ঘোরতর নেপথ্য-যুদ্ধের দৃশ্য নাটকের বিষয়কে বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলেছিল।[২] বলাবাহুল্য, গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্‌কালে গৈরিক পতাকা'র জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও শিবাজীর দেশপ্রেম সমগ্র বাঙালীজাতিকে গভীর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে গৈরিকপতাকার নাট্যাভিনয় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শচীন্দ্রনাথের আবুল হাসান (১৯৩৫) নাটকখানিও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর জমকালো পোশাক পরিচ্ছদ, নাচগান ও মঞ্চ-বৈশিষ্ট্য নাটকের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। তাঁর অপর দুইখানি ঐতিহাসিক নাটক ধাত্রীপান্না (১৯৪৩) ও রাষ্ট্রবিপ্লবের (১৯৪৪) মঞ্চরীতিও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রথম বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রচলিত জমকালো দৃশ্যসজ্জা বর্জন করে কেবলমাত্র আলোক-সম্পাতের সাহায্যে ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হল—ঘটনাটিও ঐতিহাসিক বটে। উভয় নাটকেই আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থায় সতু সেন ছিলেন। শ্রীমনোমোহন ঘোষের মতে : 'দৃশ্যপটের সাহায্য না নিয়ে শুধু পর্দার সাহায্যে নাটক অভিনয় যে সম্ভব তা নাট্যভারতীতে ধাত্রীপান্না ও মিনার্ভায় রাষ্ট্রবিপ্লব অভিনয় করিয়ে

১. 'শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, তরুণ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সতু সেনের প্রবর্তিত ধারাকে মেজেঘষে চমৎকার রূপ দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে সার্থকভাবেই প্রকাশ করেছেন।' —সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ('বাংলা নাটকের প্রয়োগরীতি' শতবর্ষে নাট্যশালা' গ্রন্থের ১৮৯ পৃঃ)

২. বঙ্গবাণী পত্রিকা—৫ জুলাই, ১৯৩০।

শচীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেন।'[১] এই মঞ্চরীতি সে যুগে একেবারেই অসম্ভাবিত ছিল। উল্লেখ্য, 'নবান্ন' (১৯৪৪) এর পরবর্তী নাট্য-প্রযোজনা। ধাত্রীপান্নার নামমাত্র মঞ্চসজ্জা গণনাট্য আন্দোলনের 'সাজেস্টিভ সেট' তৈরি পরিকল্পনার পূর্ব-সূচনা বলতে বাধা কোথায়?

---

৩. বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, দৈনিক বসুমতী ১০ মার্চ, ১৯৬১)

'...নাট্য ভারতীতে অভিনীত...ধাত্রীপান্না নাটকের সঙ্গে সতু সেনের মঞ্চ কৌশল ও আলোকসম্পাতের কৃতিত্ব চিরদিনই জড়িয়ে থাকবে...', বিনয় লাহিড়ী (রঙ্গমঞ্চ বৈশাখী ১৩৬২)

পাঁচ

॥ অভিনয় ॥

বাংলা নাটকের মঞ্চ-প্রয়োগ প্রসঙ্গে 'নাট্য প্রযোজনার' কথা এসে পড়ে। নাট্য প্রযোজনার মধ্যে একই সঙ্গে মঞ্চ-রীতি দৃশ্য-সজ্জা রূপ-সজ্জা ও অভিনয় অন্তর্ভুক্ত। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের আগে ছিল 'মোশান মাস্টার'। যিনি অভিনয় শিক্ষক তিনি প্রধান অভিনেতাও বটে। আবার নৃত্য শিক্ষক, সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন আলাদা আলাদা ব্যক্তি, কিন্তু সমগ্রভাবে কোন প্রয়োগকর্তা ছিলেন না।

শিশিরকুমারের সময় থেকেই 'নাট্য প্রযোজক' শব্দটি চালু হয়, তিনি একই সঙ্গে মঞ্চ-কলাকৌশল দৃশ্যসজ্জা অভিনয় পরিচালনা প্রভৃতি নাটক সংক্রান্ত সকল বিষয়ই নিয়ন্ত্রণ করতেন।

নাটক বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর অভিনয়! মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তি হল অঙ্গভঙ্গি অথবা অভিনয় করা। মানব-মনের বিশেষ অনুভূতির সঠিক প্রকাশ পর্যবেক্ষণ করে তা অনুমানের সাহায্যে ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির প্রচলিত ধারায় ফুটিয়ে তোলাই অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য।[১]

অভিনয়ের ক্ষেত্রে নটগুরু গিরিশচন্দ্র থেকে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রাক্-শিশির যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনয়-শিক্ষকরূপে পরিচিত। এই যুগের অভিনয়ে আবেগের বাহুল্য ও অপরিমিত বাহ্যক্রিয়াই ছিল মুখ্য। অতিনাটকীয়তা সৃষ্টির প্রবণতা অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। নাটকের সুদীর্ঘ সংলাপ আবৃত্তিতে সাধারণ অভিনেতাদের কোন কৃতিত্বই প্রকাশ পেত না। অবশ্য, গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখ অভিনেতাগণ অভিনয়ের ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। কিছু বিখ্যাত অভিনেত্রীও ছিলেন ব্যতিক্রম।

---

১. "Gesticulation or Abhinaya is a natural and primary instinct of the human race. Acting embraces the use of gestures and laws of gesticulation deduce from observation what is appropriate for the expression of particular sentiments of human mind". (History of classical sanskrit literature. P—527)—Krishnamachari.

গিরিশযুগের পর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী পেশাদারী মঞ্চের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকর্তা ও অভিনেতা বলে স্বীকৃত। শচীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন ঃ 'নাট্যাচার্যের রিহার্সাল দেখবার, জানবার, শেখবার, বোঝাবার বিষয় ছিল।…' এই সময়ের আর একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর স্থান অভিনয় নৈপুণ্যে শিশিরকুমারের ঠিক পরেই। কোন কোন সমালোচক অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় রীতির বিরূপ ও তীব্র সমালোচনা করলেও তাঁর অভিনয় প্রতিভা সেকালে সর্বসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের অভিনয়-বৈশিষ্ট্য গিরিশযুগের পরবর্তী অভিনয়রীতির দুটি বিশেষ ধারা। শিশির-কুমারের অভিনয়ে ছিল উপলব্ধির দিকটি প্রধান, সেখানে সমগ্র সত্তাই চরিত্রের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলায় নিয়োজিত। অন্তর্মুখীনতা, বাগবৈদগ্ধ্য, মার্জিত ও পরিশীলিত উচ্চারণ তাঁর অভিনয়ের প্রকৃতি।[১] অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়রীতি কিছু পরিমাণে গিরিশ যুগকে অনুসরণ করেছে বলে মনে হয়। সংলাপ প্রক্ষেপণে অতিনাটকীয় ঝোঁক এবং কৃত্রিমতার দ্বারা অভিনয়ে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে তোলা অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

অহীন্দ্র চৌধুরী প্রথম জীবনে ছিলেন যাত্রাশিল্পী। যাত্রাভিনয়ে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি শৌখিন নাট্যাভিনয়েও দক্ষতা লাভ করেন। উত্তরকালে তিনি মঞ্চ ও চিত্র উভয় জগতেই জনপ্রিয় অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শিল্পী অহীন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সংযত। কাজের মধ্যে কোন ফাঁকিও ছিল না। এ সম্পর্কে তাঁর পরিস্কার বক্তব্য ঃ 'আর্টিষ্টের সমাদর বড় ক্ষণস্থায়ী। এই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শুভলগ্নে যাঁরা উপার্জন করে নিতে পারেন তাঁরাই ভাগ্যবান। …আমার

১. 'চন্দ্রগুপ্ত নাটকে 'চাণক্যে'র ভূমিকায় পুরাতন অভিনেতাদের সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয় তুলনা করলে বোঝা যাবে যে, কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন খাত নয়, চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছে শিশিরকুমারের প্রতিটি অঙ্গ, চোখ, মুখ—এমনকি গতি-ভঙ্গিমা পর্যন্ত। যে অংশে পূর্বেকার অভিনেতারা উচ্চ চিৎকারে ফেটে পড়তেন ; সে অংশে শিশিরকুমার শুধু একটু স্তব্ধ চাহনি নিক্ষেপ করে বা মাত্র গুটিকয়েক কথা খুব নীচু পর্দায় উচ্চারণ ক'রে চাণক্যের মর্মবাণী, প্রতিহিংসা ও ক্ষোভকে মূর্ত করে তুলেছেন।'

—শিশিরকুমার ভাদুড়ী (রূপলোকের নরনারী)। শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সচিত্র শিশির' ৩৬শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৩।

ভাগ্যেও নানা জনের কাছ থেকে আহ্বান এসেছে—অনেক সময় অবসর করে উঠতে পারিনি, তবুও আহ্বান এসেছে। আমাকে যতখানি চাইবেন বাংলার দর্শক, ততখানি দেওয়ার শক্তি যতদিন আমার মধ্যে থাকবে, ততদিন আমার পক্ষে অহেতুক অবসর যাপনের কোন হেতু খুঁজে পাই না। যেদিন আমার Demand আর থাকবে না, সেদিন ছুটির দরখাস্ত না পেশ করলেও সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরেও ছুটি নিয়ে আমাকে বসে থাকতে হবে।'

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়েছে ঐতিহাসিক নাটক-গুলিতে। মিশর কুমারী নাটকে 'আবনে'র ভূমিকায় তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এরপরই উল্লেখযোগ্য হল সাজাহান নাটকের 'সাজাহান' ভূমিকা। সামাজিক নাটকেও তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সামাজিক নাটকগুলিতে। তটিনীর বিচারে ডাঃ ভোস চরিত্রাভিনয়ে তিনি কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন।[১৫] চরিত্রটিতে তিনি যে আবেদন সৃষ্টি করেছিলেন তা তাঁর অভিনয় প্রতিভারই নিদর্শন। শয়তান অর্থলোভী নিষ্ঠুর মানুষেরও হৃদয়ের কোণে সঞ্চিত থাকে বাৎসল্য মমতা। চরম মুহূর্তে নিজের সন্তানের জন্য সে যে কোন কঠিন আত্মত্যাগ করতে পারে। ডাঃ ভোস চরিত্রাভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী তা চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বস্তুত, স্নেহাতুর ও ভাবাবেগপ্রধান চরিত্র রূপায়ণে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন।

অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে গিরিশ-যুগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেলেও তা স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। গৈরিশরীতির অভিনয়ে সংলাপের শেষে যে ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায় 'শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এই ঝোঁক সামলে নেন অর্ধসমাপ্ত কিংবা অর্ধোচ্চারিত শেষ কথাটির সাথে ফিস ফিসে গলায় তাঁর হাঁফিয়ে ও চিবিয়ে

১৫. 'ডাঃ ভোস (অহীন্দ্র চৌধুরী) অপূর্ব অভিনয় করেন। এমন সংযত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিনয় সচরাচর দৃষ্ট হয় না।...'—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ)।

দ্রঃ 'এ কথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবেনা যে, অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ের আকর্ষণই ছিল তটিনীর বিচার-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।'—অহীন্দ্র চৌধুরী (রূপলোকের নরনারী) শ্রী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিত্র শিশির, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৩

বলার ভঙ্গীতে।' ঐ কথার সূত্রেই নাট্যসমালোচক সুবোধকুমার ঘোষ তটিনীর বিচার নাটকের ডাঃ ভোস চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন ঃ "Seven years experience at Chicago" বাক্যাংশের 'Chicago' কথাটির অর্ধোচ্চারিত অভিনয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ফিসফিসে গলায় একই ঝোঁকে উচ্চারিত "হে' হে'" শব্দ দুটির ভেতরের শ্বাসাঘাতগুলিকেই শুধু শ্রুতিমধুর করে তোলেনি সমগ্রভাবে বাক্যাংশটিকেও নাট্যরসোত্তীর্ণ করে তুলেছে এক সুস্পষ্ট ক্রূরতার ব্যঞ্জনায়''[১] ডাঃ ভোস চরিত্রটিতে অভিনয় করে অহীন্দ্রবাবু খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করেন। চরিত্রটির সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এবং অভিনয়ে চরিত্রটির ভাব ও বৈশিষ্ট্য অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।[২] 'আবুলহাসানে'র পণ্ডিত মদাম্রা, 'বাংলার প্রতাপ' নাটকের কার্ভালো, 'নার্সিংহোমে'র ডাঃ বিক্রমাদিত্য, 'সংগ্রাম ও শান্তি'র চন্দ্রশেখর, 'পথেরদাবী'র সব্যসাচী প্রভৃতি শচীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের মুখ্য ভূমিকায় ও গুরুত্বপূর্ণ সহচরিত্রে রূপদান করে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অহীন্দ্র চৌধুরীর সমসাময়িক আর একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। নির্মলেন্দু ছিলেন দানীবাবুর (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) শিষ্য। সুদর্শন সুপুরুষ চেহারা, কণ্ঠস্বরও ছিল অপূর্ব। শচীন্দ্রনাথের নাটক-এ শিবাজী ও সিরাজের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ছিল অসাধারণ। গৈরিশরীতিতে ইনিও অভিনয় করতেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ছিল অনবদ্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় স্বয়ং নেতাজী তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সিরাজের করুণ পরিণতিতে তাঁর চোখের জল বাধা মানেনি। সিরাজের বীরত্ব, অসহায়তা ও স্বদেশপ্রেম নির্মলেন্দুর অভিনয়ে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল তাতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও দুর্বার করে তুলতে সাহায্য করেছিল। শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং নির্মলেন্দুর অভিনয়ে এতই অভিভূত

১. বাংলা নাটকের অভিনয়—শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ জানুয়ারী ১৯৩৮)।

২. 'এমন সংযত স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক অভিনয়ে করেন যে 'ডাক্তার ভোস' তাঁহার অন্যতম বৈজয়ন্তী! আপাদমস্তক অভিনয়ে চরিত্রের ভাবে এমন ভরপুর অহীন্দ্রবাবুকে ইতিপূর্বে তেমনটি আর দেখা যায় নাই।'—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ)

হয়েছিলেন যে নাটকটি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। আবেগপ্রধান সংলাপে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণেও অপূর্ব দখল ছিল। 'স্বভাবত তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, যথেষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট, তাছাড়া সুদূর-শ্রাব্য এই স্বরে মিষ্টত্বের অভাব নেই। যদিও পরদার পর পরদা চড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে চরম মুহূর্তে উপনীত হওয়াই তার প্রকৃতিসম্মত রীতি তথাপি প্রবল ভাবাবেগের মাঝখানে নাট্যরসের তারতম্য অনুসারে সুসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বর বিকৃতির চাতুর্য তাঁর অভিনয়কে স্থানে স্থানে সাত্ত্বিক অভিনয়ের মর্যাদা দান করেছে।'[১] সিরাজদ্দৌলা নাটকে তাঁর অভিনয়ে এক বিশেষ ভঙ্গি ছিল। 'বাঙলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা' বা 'হাজার হাজার সৈন্য পলাশীর প্রান্তরে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল' এই ধরনের কবিত্বপূর্ণ সংলাপ নির্মলেন্দুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে শোকের ছায়া নেমে এসে দর্শককেও আকুল করে তুলত। আবার 'ভুলে যাই গোলাম হোসেন নিজের প্রাসাদ থেকে আমাকে চোরের মত পালিয়ে যেতে হচ্ছে'—এই বিশেষ বাক্যাংশে তাঁর অভিনয় ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'ভুলে যাই গোলাম হোসেন···'বাক্যাংশটি ডুকরে কেঁদে ওঠার মত শোনাত। আর' 'নিজের প্রাসাদ থেকে···'বাক্যাংশে 'প্রা'র 'খা' স্বরে বিকৃত শ্বাসাঘাত 'সা'র অনুনাসিক উচ্চারণে দৃশ্যের পরবর্তী সংলাপগুলিকে এই বাক্যাংশের সাথে সুসম্বন্ধ করুণ সুরে বেঁধে দিয়েছে। এখানেই লাহিড়ীর কৃতিত্ব।'[২]

নির্মলেন্দু করুণরসের অভিনয়েও যে নিপুণ ছিলেন তা দেবদাস নাটকের সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্ট বসন্ত চরিত্রটির অপূর্ব অভিনয়ে ফুটে উঠেছিল। বসন্তর ব্যর্থ প্রণয়ের সুগভীর বেদনা ও প্রচ্ছন্ন হতাশা তাঁর সংলাপ উচ্চারণের ভঙ্গিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। অপরদিকে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা থেকে জানা যায় বসন্তের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি, ব্যর্থ প্রেমিকের মর্মবেদনা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছেন।[৩]

১. বাংলা নাটকের অভিনয়—শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ জানুয়ারী ১৯৪৮)।

২. বাংলা নাটকের অভিনয়—শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৪৮)।

৩. দ্রঃ স্বাধীনতা পত্রিকা ২২ জুলাই ১৯৬২ (সাহজাহান নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে)

সিরাজদ্দৌলা ঐতিহাসিক নাটকে সিরাজের ভূমিকায় নির্মলেন্দুর অভিনয় তাঁকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। সিরাজের করুণ পরিণতি ফুটিয়ে তুলতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, এই সংগে গোলাম হোসেনের ভূমিকায় রবি রায় এবং আলেয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার সুললিত গলায় নজরুলের রচিত গান দর্শকদের অভিভূত করত।[১]

এইকালের আর একজন খ্যাতনামা অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদার পরিবারের সন্তান দুর্গাদাসের প্রথম আবির্ভাব চলচ্চিত্রে। নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁকে সর্বপ্রথম অভিনয় জগতে আনেন। কমনীয় কান্তি ও প্রিয়দর্শন অভিনেতা হিসাবে তিনি সেকালের বাংলা চলচ্চিত্র ও রংগমঞ্চে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।[২] নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শচীন্দ্রনাথ অনেক নাটকের নায়ক চরিত্র এঁকেছেন তাঁকে মনে রেখে। দুর্গাদাস সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে অভিনয় করতেন। এই বিশেষ রীতিটি ছিল গৈরিশরীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিছুটা চলচ্চিত্রধর্মী তাঁর বাচনভঙ্গি; দৃপ্ত গতি-ভঙ্গিমা ও উচ্চারণ ছিল মার্জিত ও সুস্পষ্ট। তাঁর দৈহিক লাবণ্য সর্বশ্রেণীর দর্শককে গভীরভাবে আকৃষ্ট করত।

২৪ পরগনার দক্ষিণ গড়িয়ার এক জমিদাব বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অভিনয়ের প্রীত আকর্ষণ ছিল। কিন্তু রঙ্গজগত সমাজের চোখে তখনো শ্রদ্ধার আসন পায়নি ফলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদের

১. বাঙলা থিয়েটারে সিরাজদ্দৌলা নামক প্রবন্ধে মধুসূদন মজুমদার লিখেছেন: 'এই অভিনয় এতদূরে প্রশংসা পেয়েছিল যে; স্বয়ং সুভাষচন্দ্র এবং আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহরু দেখতে এসেছিলেন। এবং অভিনয় দেখতে দেখতে সুভাষচন্দ্র কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।'

যুগান্তর সাময়িক, রবিবার ১৩ অগাষ্ট ও রবিবার ২০ অগাষ্ট ১৯৭৮

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরোক্ত ঘটনা রূপমঞ্চ সম্পাদক সাংবাদিক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়ের এক নিবন্ধে উল্লিখিত হলেও তাতে দর্শক হিসাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতির কথা তিনি উল্লেখ করেননি। —লেখক।

২. 'রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতের সবাই বলতেন ফুলের মালা আমরা অনেকেই পেয়েছি, পেয়েছি বহু হাততালি।...কিন্তু সোনার চুড়ির হাততালি দুর্গাদাসের মত আর কেউ পায়নি'—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় (শতবর্ষের স্মরণীয়, অমৃত। ১২ নভেম্বর, ১৯৭৬)।

কাছে তা একরকম রুদ্ধই ছিল। দুর্গাদাসকে এ জন্য প্রচুর আত্মত্যাগ করতে হয়। আর্ট স্কুলে তিনি চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করার পর অপরেশচন্দ্রের আর্ট থিয়েটারের সামান্য একজন দৃশ্য-সজ্জাকর হিসেবে যোগদান করেন। এই সময় অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন নাটকে 'বিকর্ণ' ভূমিকায় তিনি প্রথম মঞ্চাবতরণের সুযোগ পান। প্রথম রাত্রিতেই তিনি দর্শকহৃদয় জয় করেন। এরপর অভিনয় সাফল্যে একের পর এক নাটকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শচীন্দ্রনাথের বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেন—সতীতীর্থ, আবুলহাসান, প্রলয়, স্বামী স্ত্রী, সুপ্রিয়ার কীর্তি, কাঁটা ও কমল নাটক উল্লেখযোগ্য।

'আবুলহাসান'-এর নামভূমিকায় দুর্গাদাস অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই নাটকের পরিচালনায়ও তিনি ছিলেন। নাচঘর পত্রিকা তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে।[১] 'প্রলয়' নাটকে কুঞ্জের চরিত্রে তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য ও রূপসজ্জা সকলকে মুগ্ধ করে।[২] কিন্তু 'স্বামী স্ত্রী' নাটকে দুর্গাদাসের অভিনয়খ্যাতি বাংলা রঙ্গজগতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সেকালে দুর্গাদাস ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা, স্বামী স্ত্রী নাটকে অভিনয় সাফল্য তাঁকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়।[৩]

চলচ্চিত্রের নির্বাক ও সবাক যুগের অনেকগুলি চিত্রে তিনি নায়কের ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে প্রবোধ স্যান্যালের উপন্যাস প্রিয় বান্ধবীর চিত্ররূপেও তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশেরও বেশি। কিন্তু তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল অম্লান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর ছিলেন, তেমনি তাঁর প্রতিটি অভিনয়ের সজীবতায় ছিল তারুণ্যের স্পর্শ, সেখানে পৌঢ়ত্বের জীর্ণতা তাকে আচ্ছন্ন করেনি।

---

১. দ্রঃ ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (১ম খণ্ড)—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

২. শতবর্ষের স্মরণীয—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় (অমৃত, ১২ নভেম্বর, ১৯৭৬)।

২. 'স্বামী স্ত্রী' অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গাদাসবাবুর জনপ্রিয়তা সমধিকভাবে বাড়িয়া পড়ে। হিরোর ভূমিকায় সে সময়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অন্য কোন অভিনেতা এত তৃপ্তি দান করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।—ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (২য় ভাগ)—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃঃ ২৯২।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ নভেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে শচীন্দ্রনাথের কাঁটা ও কমল নাটকে তাঁর শেষ অভিনয়। এই নাটক চলাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

শচীন্দ্রনাথের নাটকে সমসাময়িক বহু অভিনেত্রী বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। নাট্যসম্রাজ্ঞী নীহারবালা ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। শচীন সেনগুপ্তের গৈরিক পতাকা, ঝড়ের রাতে, সতীতীর্থ, জননী, নরদেবতা, সিরাজদ্দৌলা নাটকে তিনি অভিনয় করেন। গৈরিকপতাকা নাটকে বীরাবাঈ চরিত্রে নীহারবালার অভিনয় খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় লিখেছেন ঃ '……প্রত্যাখ্যাতা, প্রণয়বঞ্চিতা, অথচ আভিজাত্যের গরিমায় আত্মস্থ, ভাগ্যবিড়ম্বিতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণা 'বীরাবাঈ'-র এর জটিল চরিত্রে নীহারবালার অভিনয় অতি মনোহর হইয়াছিল।'[১] ইনি সেযুগের একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীও বটে। শচীন্দ্রনাথের ঝড়ের রাতে, সতীতীর্থ, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটকে অভিনয় নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা তাঁরই কৃতিত্ব। নীহারবালা সুকন্ঠীও ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকে নজরুলের লেখা 'পথ হারা পাখী কেঁদে ফেরে একা', এছাড়া 'আমি আলোর শিখা' এবং 'পলাশী হায় পলাশী' গান তিনখানি তিনি এমন অপূর্ব সুরে গাইতেন যে প্রেক্ষাগৃহে আলোড়ন উঠত।[২]

নরদেবতা নাটকে নীহারবালার অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। 'শাশ্বতী' চরিত্রে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে খেয়ালী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ 'ইনি (নীহার-বালা) সারাক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ভূমিকা তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।……'[৩] আর বাতায়ন পত্রিকায় শ্রীঅখিল নিয়োগী লেখেন 'কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন 'নরদেবতা'য় সব চাইতে ভালো অভিনয় করেছেন কে, আমি বলব শাশ্বতীর ভূমিকায় নীহারবালা…'[৪]

১. বঙ্গবাণী (৫. ৭. ১৯৩০), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

২. বাঙলা থিয়েটারে সিরাজদ্দৌলা—মধুসূদন মজুমদার (যুগান্তর সাময়িকী ১৩ আগস্ট ও ২০ আগস্ট ১৯৭৮)।

৩. খেয়ালী ৫ম বর্ষ ৪৯ সংখ্যা।

৪. বাতায়ন ৫ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা।

শচীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনেত্রী রানীবালাও খ্যাতি অর্জন করেন। সতীতীর্থ নাটকে তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ। সতীতীর্থ নাটকে রানীবালার অভিনয় ভালই হয়েছিল। রানীবালার মুখশ্রী সুন্দর থাকায় সতীতীর্থ নাটকে নায়ক দুর্গাদাসের পাশে রানীবালাকে দারুণ মানিয়েছিল।

রানীবালার উচ্চাশা ছিল বড় অভিনেত্রী হবার। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কাছে চলে যান। পরে রঙমহলে শচীন্দ্রনাথের নতুন নাটক 'স্বামী স্ত্রী'তে রানীবালাকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সুধীন রাহার মোগল মসনদ নাটকে দিলারার ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। অবশ্য রানীবালাকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়ার পেছনে প্রযোজক কর্তাদের আশা ছিল রানীবালার সুন্দর মুখশ্রীর উপর, অভিনয়ে ব্যর্থ হলেও দুর্গাদাসের সঙ্গে রানীবালার জুটি দর্শকদের আকৃষ্ট করবে।[১] অভিনয়ে রানীবালা কিন্তু দর্শকদের খুশী করতে পেরেছিলেন। স্বামী স্ত্রী নাটকখানি অসাধারণ অভিনয় সাফল্যের মূলে যেমন দুর্গাদাস-রানীবালা জুটি তেমনি জহর গাঙ্গুলী-ঊষা জুটির সৌন্দর্যও নাটকখানির অভিনয়কে সমৃদ্ধ করেছিল।

রঙমহলের পরবর্তী নাটক তটিনীর বিচার অভিনয়কালে দুর্গাদাস নাটক পছন্দ না হওয়ায় রঙমহল ত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে অহীন্দ্র চৌধুরীকে আনা হয়। ডাঃ ভোস চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়-খ্যাতি যেমন তুঙ্গে উঠল তেমনি তটিনী চরিত্রে রানীবালার অভিনয়ও দর্শকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। তটিনীর বিচার নাটকেই তিনি প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হিসাবে স্বীকৃত হলেন। সংগ্রাম ও শান্তি, নার্সিংহোম নাটকেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেত্রী শ্রীমতী সরযূবালাকেও নাট্যসম্রাজ্ঞী বলা হয়ে থাকে। নাট্যসম্রাজ্ঞী নীহারবালার মত সৌন্দর্য এঁর নেই, খর্বাকৃতি এবং গায়ের রঙও কালো অথচ এমন উচ্চশ্রেণীর অভিনয় সেযুগের অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রায় দুর্লভই ছিল বলা চলে।

সরযূবালা ঐতিহাসিক নাটকে গৈরিশরীতিতে সংলাপ আবৃত্তি করেন।

১. বঙ্গরঙ্গালয়ের মধ্যযুগ। শ্রীমতী রানীবালা—শ্রীমার্কণ্ডেয় (নবকল্লোল শ্রাবণ ১৩৮০)।

তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। ভাবানুযায়ী চোখমুখের অভিব্যক্তিও লক্ষণীয়, ভ্রূযুগলের সাহায্যে তাঁর অভিনয়কে যেমন শৈল্পিক মর্যাদা দান করেন সেই সংগে তাঁর সবচেয়ে বড় ত্রুটি খর্বাকৃতিও শিল্পীসুলভ রূপসজ্জায় ঢাকা পড়ে যায়। তিনি ঐতিহাসিক সামাজিক উভয় শ্রেণীর নাটকেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নাট্য সমালোচক শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ সরযূবালা প্রসংগে লিখেছেন: '…প্রত্যেকটি অভিনয়ের পেছনে তাঁর যে চরিত্রোপলব্ধি ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা একেবারেই সুলভ নয় আমাদের কাছে।'[১]

এছাড়া বর্তমান ও অতীত যুগের বহু অভিনেতা অভিনেত্রী শচীন্দ্র-নাটকে অভিনয় করে একদা বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুশীলাসুন্দরী সুহাসিনী উষাদেবী ফিরোজাবালা বন্দনাদেবী ছায়াদেবী মলিনাদেবী সত্যেন সিংহ ছবি বিশ্বাস কমল মিত্র জহর গাংগুলী প্রভৃতি অন্যতম।

শচীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করে নির্মলেন্দু লাহিড়ী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অহীন্দ্র চৌধুরী রবি রায় প্রমুখ অভিনেতাগণ এবং অভিনেত্রীদের মধ্যে নীহারবালা রানীবালা শান্তি গুপ্তা সরযূবালা রংগমঞ্চে অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এর মূলে ছিল শচীন্দ্র-নাটকের বলিষ্ঠ সংলাপ কাহিনী-বৈচিত্র্য আংগিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তৎসহ 'আধুনিক' মঞ্চ-প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা।[২] এই প্রসংগে N.Cherkasov-এর উক্তিটি স্মরণীয়: 'A well-written play…fires the actor's imagination as its very first reading, offers great possibilities, stimulates his desire to bring out in detail all its motivating ideas and inspires him to creation…'[৩]

অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর অভিনয় জীবনের সাফল্যের মূলে শচীন্দ্র-নাটকের

১. 'বাঙলা নাটকের অভিনয়—শিল্পী'—শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ (আনন্দবাজার, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮)

২. 'শচীনদা সব সময় নাটক নিয়ে এক্সপারিমেন্ট করতে ভালবাসতেন। তাঁর একটি নাটক আর একটির মত নয়।…একটি নাটকের সঙ্গে আর একটি নাটকের তুলনা চলেনা…' শ্রীঅখিল নিয়োগী (নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, রূপমঞ্চ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৪)।

3. Notes of a Soviet actor—N, CHERKASOV (The actor and the play wright, P-80).

প্রভাব স্বীকার করেছেন।[১] তেমনি অভিনেত্রী বন্দনাদেবী এক জায়গায় স্পষ্ট বলেছেন—'তাঁর নাটকে অভিনয় করে শিল্পিগণ এত আনন্দ পান তার কারণ তাঁর মধুর সংলাপ, স্বচ্ছন্দগতি অথচ কষ্টকল্পিত নয়। তাঁর লেখার বিশিষ্ট ভঙ্গীটি আমাকে মুগ্ধ করে। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্রগুলি এত সুন্দরভাবে সমান তালে পা ফেলে চলে যে চরিত্রগুলি যে কাল্পনিক তা বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।'[২]

শচীন্দ্রনাথ 'যুগ নাট্যকার'। যুগোপযোগী নাটক রচনায় তাঁর সমতুল্য নাট্যকার সেযুগে আর দেখা যায়নি। আর সেই কারণে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী নাটকগুলিতেও যুগচেতনা রুচি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবনাকে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছেন।

---

১. 'বন্ধুবর শচীন্দ্রনাথ'—অহীন্দ্র চৌধুরী (আনন্দবাজার, ১০ মার্চ, ১৯৬১)।
২. রূপমঞ্চ—শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫৮।

ছয়

॥ নাটকে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ॥

পাশ্চাত্য-রীতি অনুসারে নাটক রচনার প্রদর্শক হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক মধুসূদনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, কেননা মধুসূদনের শিল্প-প্রকৃতিই ছিল ট্রাজিক রসাশ্রিত, সেখানে কমেডি বা মিলনান্তক পরিণতি হলো সংস্কৃত নাটকের বৈশিষ্ট্য। মাইকেল 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' রচনা করেন সংস্কৃত নাটকের আদর্শে কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' রচিত হয় পাশ্চাত্যের গ্রীক ট্রাজেডির আদর্শে। এরপর থেকে বাংলা নাটকের আঙ্গিক প্রকরণে পাশ্চাত্য-অনুসরণ আজ অবধি অব্যাহত।

মধুসূদন নাটক রচনায় সংস্কৃত নাট্যাদর্শকে গ্রহণ করেননি। ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধি সেদিন ভবিষ্যৎ বাংলা রঙ্গমঞ্চকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন। 'আমাদের প্রকৃত জাতীয় নাট্যশালার রূপায়ণ সম্ভব ইউরোপীয় নাট্যকলাকে অনুসরণ করে'—একথা মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন।[১]

মধুসূদন বাংলা নাটককে পাশ্চাত্য অভিমুখী করলেও বহুদিন পর্যন্ত এর সর্বাঙ্গে দেশীয় যাত্রার স্থূল প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কাহিনী বৃত্তগঠনে সংলাপে লিরিক্যাল-উচ্ছ্বাসে মঞ্চ ও যাত্রা নাটকে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়নি।[২] নাট্যকার

---

১. রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ : If I should like to write other drama, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of 'Sahitya Darpan'. I shall look to the great dramatist of Europe for models, That would be founding a real National Theatre'. (নগেন্দ্রনাথ সোম—'মধু স্মৃতি' পৃঃ ৩০১)

২. "মনোমোহনের নাটক যেমন 'বৌবাজারের বঙ্গনাট্যালয়ে' অভিনীত হইত তেমনি 'বো মাষ্টারের যাত্রাদলে'ও অভিনীত হইত।"—বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা। ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য।' 'দৃশ্য-সংযোগ এবং ঘটনা-সংস্থাপনের দিক দিয়া এইসব অপেরা বা গীতাভিনয় নাটকের সমধর্মী'। বস্তুত তৎকালীন অনেক প্রসিদ্ধ নাটক রঙ্গমঞ্চের বাহিরে গীতাভিনয় রূপে অভিনয় হইত।"—বাংলা নাটকের ইতিহাস : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১২৭।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যআঙ্গিকেও যাত্রার প্রভাব দেখা যায়। 'অপেরা' ধাঁচের নাটকগুলি গিরিশচন্দ্রের প্রথম দিকের পৌরাণিক নাটক রচনার আদর্শ ছিল।[১] 'রাবণবধ' নাটক থেকেই গিরিশচন্দ্রের নাটকরচনার রীতি সম্পূর্ণ নতুন পথ গ্রহণ করে।

দর্শকেরা যাত্রা ও থিয়েটারের পার্থক্য বুঝতে পারল। গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটকগুলি অবশ্য পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিক-আদর্শেই রচিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালও নাটকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আঙ্গিক অনুসরণ করেছেন। শেক্‌সপীয়ার এবং ইবসেন উভয় নাট্যরীতিই তাঁর নাটকে দেখা গেছে। নাটকে আবেগাত্মক সংলাপ দৃশ্য-অলংকরণ স্বগতোক্তি ও পৃথক পৃথক ঘটনার জন্য পৃথক পৃথক দৃশ্য রচনায় শেক্‌সপীয়ার-নাটকের আঙ্গিক যেমন অনুসৃত হয়েছে তেমনি আঙ্গিক নির্দেশের সাহায্যে চরিত্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া নাটকীয় বিরতি প্রভৃতি ইবসেনীয় রীতির দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাবিত। বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যআঙ্গিক তাঁর পরবর্তী যে সমস্ত নাট্যকারদের সর্বাধিক প্রভাবিত করে, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম।

যেমন ইউরোপে তেমনি এদেশেও নাটকের আখ্যানবস্তু ও আঙ্গিকের প্রভাব মঞ্চ-উপস্থাপনায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং সেইসঙ্গে চল্লিশোত্তর কালের নাটকগুলির মঞ্চরূপের কথা স্বভাবতই মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া মঞ্চ-ঘনিষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে যাঁরা নাটক রচনায় প্রচলিত ও গতানুগতিক নাট্যবিষয় এবং আঙ্গিকে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছিলেন, শচীন্দ্রনাথের কথা সেখানে সর্বাগ্রে মনে পড়বে।[২]

১. 'গিরিশবাবু প্রথমে আগমনী, অকালবোধন, শিবের বিবাহ, রাসলীলা যাত্রার ভাবে লিখিয়া মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইলেন।''—ভারতীয় নাট্যমঞ্চ। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১১৫

৪. 'রঙ্গমঞ্চের জন্যই নাটক রচনা করা তখনকার দিনে ছিল প্রথা—মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করেও অভিনয় চলতো...। এই সময় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা আবার রঙ্গালয়কে এক নতুন ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। আধুনিক নাট্যবচনার মূলসূত্র আবার ধরিয়ে দিলেন তিনি। কিন্তু শচীন্দ্রনাথও প্রথম প্রথম অতীত ধারাকেই অনুসরণ করতেন পরে তিনি নবধারার সূত্রপাত করেন।...' (পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কথা। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। শারদীয়া রূপমঞ্চ, ১৩৬১ চতুর্দশবার্ষিকী)

সময় সংক্ষেপ অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ এবং তার আয়তনের গতানুগতিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করা সঙ্গীতের যথাযথ ব্যবহার অকারণ ভাঁড়ামো দেখিয়ে লোক না হাসানো এবং কার্পেন্টার্স সিনগুলোকে যথাসম্ভব পরিহার করা সেইসঙ্গে শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপচাতুর্য যুক্ত হয়ে শচীন্দ্রনাথের নাটকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

তাঁর নাট্য-আঙ্গিক সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ অনুসরণ করেছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য-নাট্যাদর্শের অনুশীলন শচীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক রক্ত-কমল (১৯২৯) বাংলা নাট্যজগতে সম্পূর্ণ গতানুগতিকতাবিরোধী বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিল। নাটকটিতে মাত্র পাঁচটি দৃশ্য অভিনয়কাল সওয়া দু'ঘন্টা। নাটকটির অভিনয়ে প্রতিটি দৃশ্যের যবনিকা না ফেলে পরবর্তী দৃশ্যের 'মুড' নিয়ে একটি করে গান গাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। গায়িকা নাটকের কোন চরিত্র নয়—'একজন কল্পিত নারী, নিয়তির মতো। অথচ নিয়তি নয়। তার কাজ হবে অনেকটা সূত্রধরের মতো। নাটকের ইউনিটি ওই করে বজায় রাখা হবে এবং একটানা সওয়া দুই ঘন্টা অভিনয় করে নাটক শেষ করা যাবে।'[১] নাটকে যবনিকা (কার্টেন) না ফেলে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে অভিনয়, ধারা অব্যাহত রাখার ফলে যে গতিবেগের সঞ্চার হল তা এককথায় অভিনব। নজরুল রচিত নাটকের সাতখানি গানের চারখানা নাটকের কল্পিত চরিত্রটি প্রতি দৃশ্যের শেষে গাইবে এবং বাকি তিনখানা গাইবে নাটকের অন্য দুটি চরিত্র। এইভাবে রিভলভিং ও ওয়াগন মঞ্চের অভাবে নতুন নাট্য-আঙ্গিকের সাহায্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস শচীন্দ্রনাথের। এই নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য এর নাট্যবিষয়।[২] একজন পতিতাকে কেন্দ্র করে নাটকের

১. 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা'। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। 'আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২. ''রক্ত-কমল'' মাত্র সোওয়া দু'ঘন্টার নাটক। 'মুক্তির ডাকে'র আগে বা পরে প্রহসন বা নক্সা জাতীয় রচনা ছাড়া সত্যিকারের হ্রস্বকারের কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত এবং অভিনীত হয়নি। সেদিক থেকে এ নাটক ছিল প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে 'রক্ত-কমল'কে যথেষ্ট পরিমাণে, আধুনিক' 'বলতে দ্বিধা নেই।'' এক'শ বছরের বাংলা থিয়েটার। শিশির বসু, পৃঃ ৪১৩-১৪।

কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। এক মোহময় মুহূর্তের স্খলনে পতিতারা সমাজ-জীবন থেকে বিতাড়িত হলেও মানবিক স্নেহ ভালবাসায় ও করুণায় তাদের স্থান সমাজের বর্ণচোরা পুরুষদের চেয়েও অনেক উপরে। নাট্যকারের গভীর সহানুভূতি তাদের সেই মানবিক চেতনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

শচীন্দ্রনাথের নাট্যআঙ্গিককে বিশেষত সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের সর্বাধিক প্রভাব দেখা গেছে। বলাবাহুল্য চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং শিল্প-বৈশিষ্ট্য শচীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। শচীন্দ্রনাথ সামাজিক নাটকে ইবসেন, বিয়র্ণসন প্রভৃতি বিদেশী নাট্যকারদের প্রভাব যেমন স্বীকার করেছেন, পাশাপাশি মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকার ফলে নাটকের আঙ্গিকে নাট্যকারের মৌলিক চিন্তাধারাও সক্রিয় রয়েছে। সেখানে মঞ্চসাফল্য, বৈচিত্র্য-রসসৃষ্টি ও বাংলা রঙ্গমঞ্চকে সজীব সচল রাখার প্রবণতা থেকে নতুন নতুন আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের জন্ম হয়েছে। একারণেই শচীন্দ্রনাথের একটি নাটকের সঙ্গে আর একটি নাটকের আঙ্গিকগত মিল অত্যন্ত কম। প্রতিটি নাটকই সে সময় দর্শকদের কাছে সমানভাবে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। তৎকালীন সমালোচকদের কাছে প্রগতিশীলতার উদাহরণ-স্বরূপ এই সমস্ত নাটক রচনাকালে শচীন্দ্রনাথ যাত্রা অপেরা চলচ্চিত্র দূরদর্শন প্রভৃতি নাট্যবিষয়বস্তুর নাটকীয় গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন ; বাংলা নাটকের সমালোচনাকালে শচীন্দ্রনাথ একাধিক স্থানে তা উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য, সে সময় চলচ্চিত্র জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সঙ্গে পাল্লা রাখতে গিয়ে নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। কেবলমাত্র মঞ্চ-সফলতার কথা মনে রেখে শচীন্দ্রনাথ একথা সমসাময়িক নাট্যকারদের তুলনায় বেশি অনুভব করেছিলেন।[১]

তটিনীর বিচার (১৯৩৮) নাটকখানি শচীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চের আধুনিক কলা-কৌশল উন্নত আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মহানিশা নাটকে (১৯৩৩) সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তিত হলেও এর সার্থক ব্যবহার ঘটেছে 'তটিনীর বিচারে'। 'তটিনীর বিচার'ই সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উপযোগী নাটক হিসাবে

১. নাটকের ক্ষেত্রে ফিল্মের অনিবার্য প্রভাবের কথা স্বীকার করে শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সিনেমার প্রভাব যতই নাটকের উপর, অভিনয়ের উপর কাজ বেশী করেছে, ততই নাটকের ভাষা, সিনেমার সংলাপ, আর নাটকের অভিনয় সিনেমার অভিনয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' (রূপমঞ্চ : অষ্টাদশবর্ষ, ৭-৮ম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক)

জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর শততম অভিনয়ও অনুষ্ঠিত হয়। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পেছনে যে ইতিহাস আছে তাতে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ও নাট্য-প্রজ্ঞার পরিচয় ফুটে ওঠে। নাটকটির অভিনয়ে একটা 'আর্টিফিসিয়েল স্পীড' দেওয়ার কথা চিন্তা করে শচীন্দ্রনাথ 'তটিনীর বিচার' লিখেছিলেন। এর কোন কোন দৃশ্যের অভিনয় মাত্র দুই তিন মিনিট সময় লাগত এবং অধিকাংশ দৃশ্যেই শেষ সংলাপের সঙ্গে পরবর্তী সংলাপের শুরুর কথায় যোগ ছিল।

'তটিনীর বিচার' থেকেই শুরু করে শচীন্দ্রনাথের 'সংগ্রাম ও শান্তি' 'পথের দাবী' 'নার্সিংহোম' প্রভৃতি এবং সমসাময়িক নাট্যকারদের 'বিশবছর আগে' 'প্লাবন' 'কঙ্কাবতীর ঘাট' প্রভৃতি নাটকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের নাট্যরীতি অনুসৃত হয়। আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নাট্যআঙ্গিকেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হল: 'নাট্যকাররা অযথা 'রাজপথ', 'বনপথ', 'অলিন্দ' প্রভৃতি ফ্ল্যাট ড্রপে অভিনয়োপযোগী দৃশ্য লিখবার দায় থেকে মুক্তি পেলেন। অকারণ গানও নাটকে আর দিতে হোতো না। পরপর সেট সিন ব্যবহার করা চলত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'প্রেমালাপ' বা 'মন্ত্রণা' করবার অশোভন ব্যাপার লিখতে হোতো না। অভিনয়ও করতে হোতো না।'[১] 'তটিনীর বিচারে' সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উপযোগী নাটক রচনায় শচীন্দ্রনাথ যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সমসাময়িক ও পরবর্তী নাট্যকারগণ তাকে অনুসরণ করেছেন।

'তটিনীর বিচারে' নাট্যকার যে 'আর্টিফিসিয়াল স্পীডে'র কথা বলেছেন কেবল ওই নাটকেই নয় তাঁর অধিকাংশ সামাজিক নাটকেই (স্বাধীনতা পরবর্তী নাটকগুলি ছাড়া) সহজলভ্য। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে এসে বহু সফল নাট্যকারেরও এই 'আর্টিফিসিয়াল স্পীড' দেওয়ার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা দেখা যায়। এর কারণও তদনুরূপ অর্থাৎ চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নাটক ও মঞ্চ-আঙ্গিকে আলোর কারসাজি স্লাইড প্রজেকসন ও দ্রুতদর্শন রীতি যুক্ত হয়েছে, অভিনয়েও চলচ্চিত্রসুলভ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে শচীন্দ্রনাথকে 'আধুনিক নাটকে'র পথিকৃৎ বলে অভিহিত করা যায়।[২]

---

১. বাংলার নাটক ও নাট্যশালা—শচীন সেনগুপ্ত, 'নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারের পরবর্তীকাল' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২. প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক 'নতুন প্রভাত' নাট্যকার শচীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে লিখেছেন: 'যাঁর লেখনী থেকে সর্বপ্রথম আমরা আধুনিক পেয়েছি।'

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন এই স্পীড অর্থাৎ নাটকীয় গতিই নাটকের প্রাণ। একই নাটক মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অভিনয়ে নাটকীয় গতির ক্ষেত্রে প্রভেদ যে কত সুস্পষ্ট তার প্রমাণ আছে তটিনীর বিচার ও স্বামী স্ত্রী নাটকে। স্বামী স্ত্রী নাটকে চারটি দৃশ্যের চারটি অংক। শেষ দৃশ্য ছাড়া বাকি তিনটি দৃশ্যেই অভিনেতারা বসে অথবা দাঁড়িয়ে অভিনয় করে গেছেন।[১] মজার ব্যাপার মঞ্চাভিনয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেও মঞ্চের স্পীড এই দুই নাটকের চলচ্চিত্র-রূপে বজায় থাকেনি, অথচ চিত্র ও মঞ্চে উভয় নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছিলেন একই। ফলে চলচ্চিত্রে দুটি নাটকই মার খেয়েছে।

এ ধরনের আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শচীন্দ্রনাথ অনেক আগেই শুরু করেছিলেন। ঝড়ের রাতে (১৯৩১) নাটকে এর প্রথম সফল প্রয়াস। নাট্য-আঙ্গিকের সঙ্গে 'আধুনিক' মঞ্চ-আঙ্গিক যুক্ত হয়ে 'ঝড়ের রাতে' এক স্মরণীয় নাট্য-প্রযোজনারূপে ইতিহাসে চিত্রিত হয়ে আছে। নানাদিক থেকে ঝড়ের রাতে নাটকখানি তাৎপর্যপূর্ণ। ১৩৩৮ সালের ধূমকেতু পত্রিকায় নাটকখানির সমালোচনায় বলা হল: 'ঝড়ের রাতে'র কথা বলতে গিয়ে প্রথমে এই কথাটিই বলা প্রয়োজন মনে হয় যে এই বিশিষ্ট নাটকখানি হয়ত সর্বসাধারণের জন্য নয়। যাঁরা ঘন ঘন কামান গর্জন, মুহুর্মুহু পতন ও মূর্চ্ছা এবং বেগে প্রবেশ প্রস্থান দেখে অভ্যস্ত তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রযোজিত এই নাটকখানি দেখে বোধকরি একেবারে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরবেন।...প্রকৃত রস সৃষ্টিকে উপভোগ করার শক্তি এবং ধৈর্য যাদের আছে তারাই শুধু এই বইখানি দেখে আনন্দিত হবেন।'[২]

পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয়ে সময় সংক্ষেপের ব্যাপারে 'রক্ত-কমল' যেমন পথ-প্রদর্শক তেমনি 'ঝড়ের রাতে' 'দশের দাবী' এক অংকের তিন ঘন্টার নাটক ছিল। কিন্তু সময় সংক্ষেপের এই রীতি তখন সর্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি। মিনার্ভা

১. 'স্বামী স্ত্রী' অসাধারণ জমে গেল। অভিনয়? কসরত দেখাবার কোন প্রশ্নই নেই। হাল্কা ভাবে ঘরোয়া কথার আলোচনা করে যাওয়া শুধু। অবশ্য সেই বিশেষ ধরনের ঘরোয়া কথাগুলির আবেদন ছিল দুর্নিবার না হয়ে? সব কথাই যে ঘুরপাক খেয়ে মরছে সেই আদিম সমস্যাকে বেষ্টন করে। আদিম এবং শাশ্বত। অর্থাৎ নারী চিত্তে যৌন-চেতনার জাগরণ।'—রঙ্গালয়ে মধ্যযুগ—নবকল্লোল শ্রাবণ ১৩৮০—শ্রীমার্কণ্ডেয়।

২. দ্র. ধূমকেতু ১ম বর্ষ। ৯ম সংখ্যা, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

থিয়েটারে উপেন্দ্রকুমার মিত্রই সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে তিন ঘণ্টা-ব্যাপী নাটকের প্রচলন করেন।[১]

'ঝড়ের রাতে'র বৈশিষ্ট্য হল—একটিমাত্র সেট অর্থাৎ দৃশ্যসজ্জায় একই কাল-সীমার মধ্যে সমগ্র নাটকখানি অভিনীত। অভিনয় সময় তিন ঘণ্টা। কোন অংক ও দৃশ্যে বিভাগের দ্বারা অভিনয়গতি বিঘ্নিত হয়নি। ঝড়ের রাতে ও নাট্যকারের পরবর্তী নাটকগুলির আঙ্গিক বিষয়বস্তু ইউরোপীয় নাট্যকার ইবসেন বার্নাড'শ দ্বারা প্রভাবিত। পাশ্চাত্যে ইবসেন গলস্‌ওয়াদি' এবং পরে বার্নাড'শয়ের দ্বারা ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রচলিত আঙ্গিক বিষয়বস্তু ও ভাবনার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এঁরা রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে, সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নরনারীর সম্পর্ক—ন্যায় নীতি ধর্ম সম্পর্কে 'বৈপ্লবিক মত' প্রচার করেন। আমাদের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা গেল নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উপর। বিশেষত সামাজিক নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনের বৈপ্লবিক সূচনা তাঁর হাতেই সাধিত হল। শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় রঙ্গমঞ্চের বর্তমান এবং সম্ভাব্য দর্শকরুচিকে মনে রেখে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যরীতিতে নাটক লিখলেন তিনি।

'ঝড়ের রাতে' 'সুপ্রিয়ার কীর্তি' 'জননী' প্রভৃতি নাটকগুলিতে সামাজিক সমস্যার চেয়ে ব্যক্তিগত সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিচরিত্র অপরাধ মনস্তত্ত্ব এবং নারী পুরুষের পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব এইসব নাটকে মুখ্য ও লক্ষণীয় হয়েছে। এই কারণে এগুলিকে সার্থক সামাজিক নাটক বলায় বাধা আছে। জর্জ বার্নাড'শ এ ধরনের নাটককে সমস্যাপ্রধান নাটক বলেছেন।[২] যদিও সমস্যা ও সংকট ছাড়া নাটক ভাবাই যায় না। কোন কিছুর সমস্যাকে কেন্দ্র করেই ত নাট্যরস এবং নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। নাট্য বিষয়ে মানবজীবনের মিলনান্তক অথবা বিয়োগান্তক পরিধিতে সাময়িক অথবা স্থায়ী কোন সমস্যার নাটকীয় রূপই যথার্থ নাটকের স্বরূপ।

১. দ্রঃ নাটকের গতি—শচীন সেনগুপ্ত, রূপমঞ্চ। শারদীয়া ১৩৬৪।

২. সমস্যা নাটক সম্পর্কে বার্নাড' শ বলেছেন: 'It will be seen that only in the problem play, is there any real drama, because drama is mere setting up of the camera to nature, it is the presentation in parable of the conflict between man's will and his environments, in a word of problem.'

(Apology from 'Mrs. Warren's profession' 1902).

শচীন্দ্রনাথের নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পূর্বেকার বাংলা নাটকের সংগে এর স্পষ্ট পার্থক্য। শচীন্দ্র-নাটকের পটক্ষেপ, দৃশ্য সংস্থান, দৃশ্য পরিবর্তনের রীতি, নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে দৃশ্য অপরিবর্তিত রেখে নাটকীয় রসকে ঘনীভূত রাখা অথবা একই দৃশ্যে সমস্ত ঘটনাকে সাজিয়ে ও কাহিনী বর্ণনায় আড়ষ্টতা না রেখে নাটকীয় ভাব অক্ষুণ্ণ রাখা নাট্য আঙ্গিকের এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা মঞ্চ-নাটকের অনড় চিরাচরিত প্রথাগুলির (কনভেনশন) বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ ছিল। সেই সময় নাট্য আংগিকের প্রচলিত নিয়মগুলি ছিল যেন বিধিনির্দিষ্ট অলংঘ্য। যেমন (১) নাটকের অভিনয়কাল কমপক্ষে পাঁচ ছয় ঘণ্টা-ব্যাপী হতে হবে। (২) নাটকে পাঁচটি অংক এবং প্রতি অংকে ৫/৭টি করে গর্ভাংক থাকতে হবে। (৩) কোনও দৃশ্য নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বেশি হওয়া কিছুতেই চলবে না। (৪) অনাবশ্যক গান (বৈরাগী ভিখারী চরণ পাগল বা পাগলিনীর গলায়) এবং অযথা ভাঁড়ামো (ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী পল্লীরমণী বা নাগরিকগণের দ্বারা কিংবা একজন নির্দিষ্ট টাইপ চরিত্রকে উপস্থিত করে) দিয়ে 'রিলিফ্‌সিন্‌' থাকা চাই-ই। (৫) কার্পেন্টার্স সিন অর্থাৎ বনপথ অলিন্দ করিডর ফোয়ারা ফুলন্ত গাছ আঁকা বাগান ইত্যাদি নাটকের পক্ষে অপরিহার্য।

ঝড়ের রাতে নাটকে নাট্যকার এই প্রচলিত আংগিক সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। নাটকের আখ্যানভাগ এবং আংগিক উভয়ই কনভেনশন বিরোধী এবং অভিনব যা বাংলা রংগমঞ্চের ক্ষেত্রে একটা নতুন পর্বের সূচনা করল বলা যেতে পারে।

কেবলমাত্র নাটকের আংগিকের ক্ষেত্রে নয় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও শচীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। জননী নাটক (১৯৩৩) তার উদাহরণ। বস্তুত, সফল নাটকের ক্ষেত্রে বিষয় ও আংগিক পরস্পর অনেকখানি নির্ভরশীল। একটির পরিবর্তনে আর একটির পরিবর্তন সুনিশ্চিত। শচীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকে নানা জটিল বিষয়কে বিচিত্র দ্বন্দ্বের মধ্যে রূপায়িত করার জন্য নতুন নতুন আংগিক-বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছিলেন; জননী নাটক তার প্রমাণ।[১] নাটক-

১. The form of art can never be distinguished from its content. For convenience of analysis they may sometimes be discussed separately, but it must never be forgotten that in a work of art they ere indivisible from each ether.' (The art of Bernard Shaw : 'The critic of Shakespeare and Ibsen' p—160)—S. C. Sengupta.

খানি পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যনিকেতনে এর প্রথম অভিনয়ে মোট তেতাল্লিশজন স্ত্রী পুরুষ অভিনয় করেছেন। এত চরিত্রবহুল নাটক শচীন্দ্রনাথ আর রচনা করেননি; বাংলা নাটকের ইতিহাসেও সম্ভবত খুব বেশি নেই। 'জননী' নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এই নাটকেই প্রথম ওয়াগান মঞ্চ ব্যবহৃত হয়।

ওয়াগান মঞ্চের (শকট মঞ্চ) ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ তথ্য এখনও চোখে পড়েনি। তবে এটুকু জানা গেছে, এই মঞ্চ ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রায় আদিরূপ। ওয়াগান মঞ্চকেও ঘোরাতে হত বলপ্রয়োগে; বাঁশ বা লাঠির সাহায্যে। জননী নাটক চলাকালে স্বয়ং শচীন্দ্রনাথ এবং প্রবোধ গুহ মহাশয়ও এই মঞ্চ ঘোরানোর কাজে লেগে যেতেন। ওয়াগান মঞ্চের ব্যবহার দু-একখানি নাটকের পর সম্ভবত শ্রমসাধ্য বলে পরিত্যক্ত হয়। এরপর কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকা প্রত্যাগত সতু সেন উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রচলন করেন।

ঘূর্ণয়মান মঞ্চের নাটক ওয়াগান মঞ্চের নাট্য আঙ্গিককেই মোটামুটি অনুসরণ করেছে। এই বিশেষ আঙ্গিকের সূত্রপাত হয় জননী নাটকে। পরবর্তীকালে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উপযোগী নাটক রচনায়ও শচীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী। নাটকের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন 'জননী'র কাহিনী ও বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি একটা 'একসপেরিমেন্ট' করেছেন। ছোট ছোট দৃশ্য নিয়ে কাহিনীটি অগ্রসর হয়েছে, এর উপাদানেও প্রচুর চলচ্চিত্রসুলভ বৈচিত্র্য রয়েছে। একজন কুমারী জননীর সমস্যা নিয়ে নাটকের কাহিনী রচিত। অনেকেই এই কাহিনীতে ইউরোপীয় সমাজের সমস্যাকে ভারতীয়করণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলে মনে করেন।

শচীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের (স্বাধীনতাপূর্ব) সামাজিক নাটকগুলির আঙ্গিক বিচার করে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, তিনি নাটকের আঙ্গিক নির্মাণে দুটি উপাদান মঞ্চ-সাফল্যের উপায় রূপে যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। তার একটি হল চলচ্চিত্রসুলভ ছোট ছোট দৃশ্য এবং দ্বিতীয়টি যাত্রা-আঙ্গিকের অতিনাটকীয় সংলাপ। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন দর্শকের ভাল লাগা না লাগার উপরই নাটকের চূড়ান্ত সাফল্য অসাফল্য নির্ধারিত হয়। তাই নাটকের আঙ্গিক রচনায় দেশী বিদেশী সবরকম উপাদানই তিনি কাজে লাগাতে চান—'নাট্য সৃষ্টির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কোন কিছুর স্থান নাটকে নেই, আর প্রয়োজনীয় সবকিছুর স্থানই নাটকে আছে। এই প্রয়োজনের কোন সংজ্ঞা অথবা নিদর্শন দেওয়া যায় না। সৃষ্টির সময় স্রষ্টা যা অপরিহার্য বলে জানবেন তাই সেই নাটকের পক্ষে প্রয়োজন

তা যদি অবান্তর হয়, তাহলে নাটকই হবে না। অবান্তর কিনা তা প্রমাণিত হবে দর্শক-মনের প্রতিক্রিয়া বিচারে আর কোন বিচারে নয়।'[১]

নাটকীয়তা সৃষ্টিই ছিল শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাট্যরচনায় একমাত্র প্রবণতা। বহু নাট্য-বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন নাটকে বেশি সংখ্যক মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে গেলে নাটকীয়তা সৃষ্টি হবে নাট্যকারের প্রধান উপায় এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তা অবশ্য প্রয়োজনীয়। 'নাট্য-শালার সমস্যা' নামক প্রবন্ধে শচীন্দ্রনাথ যাত্রা ও থিয়েটার-নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় নবীন নাট্যকারদের যাত্রা থেকে কিছু জনপ্রিয় উপাদান সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছেন। যাত্রাভিনয়ে কম খরচে অধিকসংখ্যক শ্রোতাকে আকৃষ্ট করা যায়, এছাড়া আছে অনেক বাস্তব সুবিধা। যে উপাদানগুলি যাত্রাকে থিয়েটারের চেয়ে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শচীন্দ্রনাথ তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে থিয়েটার-নাটককে সেইভাবে গড়ে তুলতে চান— '[ক] দৃশ্যপটের ঝোঁক কমিয়ে দেওয়া, [খ] নাটকের ভাষাকে নাট্য প্রকাশের প্রধান বাহন মেনে নিয়ে অভিনয়কে গড়ে তোলা, [৩]......পাশ্চাত্য অনুকরণ সম্বন্ধে সংযত থাকা, [গ] নাটকের উপর এবং নাটকীয়তার উপর বেশি ঝোঁক দেওয়া, [ঘ] দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দের মনের স্তর অতিক্রম না করার সংকল্প।'[২] প্রকারান্তরে এই নাট্যআঙ্গিকগুলি শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে গৃহীত হয়েছে। বলাবাহুল্য জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রাঙ্গিকানুসরণ শচীন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'যুগনাট্যকার' শচীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের নাটকগুলি কিন্তু পূর্বোক্ত নাটকগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'গণনাট্য আন্দোলন' তখন বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' পেশাদারী রঙ্গ-মঞ্চের গৌরবময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটালো। তার জায়গায় অপেশাদারী নাট্য-দলগুলি নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিষয়বস্তুর বৈপ্লবিক রূপান্তরের দ্বারা নাট্যজগতের গতানুগতিকতার মধ্যে নতুন সম্ভাবনার

১. 'জাতীয় নাট্যশালা গড়বার মুখে ভাববার কথা', শৌভনিক নাট্যোৎসব স্মারকসংখ্যা ১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা, রচনাকাল ১৯৬০।

২. নাট্যশালার সমস্যা—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শারদীয়া রূপমঞ্চ ১৩৫৮, ভাদ্র-আশ্বিন।

দিক উম্মোচন করল। সমাজের অন্ত্যজ ও উৎপীড়িত শ্রেণীর মানুষেরা রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠে তাদের মনুষ্যত্ব ন্যায় ও সাম্যের দাবি নিয়ে উপস্থিত হল। নাটকে শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা গ্লানি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিবাদ গর্জে উঠল। নারীপুরুষের অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত অনুভূতি কাব্যময় গদ্যসংলাপে রচিত হল অ্যাবসার্ড নাটক। রবীন্দ্র-নাটকের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সাধারণ মানুষের নতুন নতুন নাট্যবৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ ও নাট্যদর্শকের ক্রমবৃদ্ধি বর্তমান দশকের বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নাটকের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের হাওয়া শচীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করে। তাঁর শেষ জীবনের অধিকাংশ নাটকেই বৃহত্তর মানবজীবনের নানা তাত্ত্বিক দিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের বিতর্কমূলক বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক—সবার উপর মানুষ সত্য, এই স্বাধীনতা, জয়নাদ ও আর্তনাদ প্রভৃতি। এই ধরনের নাটক সাধারণত এ্যাকশন প্রধান নয় আলোচনা প্রধান, আবেগ বা উত্তেজনা প্রধান নয় যুক্তি ও চিন্তা প্রধান। নাটকীয় সংঘাতকে সযত্নে পরিহার করে বুদ্ধি ও চিন্তাভাবনাকে অগ্রাধিকারদানের ফলে এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে কেউ কেউ স্থিতিশীল নাটক (Static drama) ও ভাবনাট্য (Drama of idea) অভিহিত করে থাকেন।

মিশরের পানামা খাল নিয়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের ওপর ভিত্তি করে শচীন্দ্রনাথ লিখলেন 'সবার ওপর মানুষ সত্য' (১৯৫৬)। নাট্যকার এটিকে অঙ্ক বহুল 'একাঙ্ক নাটক' বলেছেন। বস্তুত, একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা অনুযায়ী এ নাটক রচিত হয়নি। একাঙ্ক বিশিষ্ট হলেও নাটকের বক্তব্য বিষয়ের পরিধি বহু চরিত্রের সমাবেশ সর্বোপরি নাটকে Exposition, Development, Climex, Fall, Catastrophe (নাটক যেহেতু জীবনের প্রতিরূপ, জীবনটাকে নাটক হিসাবে ধরে নিলে উক্ত ইংরেজি শব্দগুলিকে ক্রমান্বয়ে সূত্রপাত, অভিব্যক্তি, সংকট, সমাধান এবং সিদ্ধান্ত এই বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে।) প্রভৃতি যা একাঙ্ক নাটকের স্বল্পায়তন বিশিষ্ট বৃত্তগঠনেও একান্ত প্রয়োজনীয়, এ নাটকে তা স্পষ্ট নয়।

'সবার উপরে মানুষ সত্য' নাটকে যুদ্ধ মানবতা প্রেম বিদ্বেষ মানবসভ্যতার উত্থান পতনের ইতিহাস—সব মিলিয়ে এক সুবিশাল পটভূমিকে অঙ্কিত

আবরণে স্বল্পায়তন নাট্যবৃত্তে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর গঠনরীতিতে নাটকীয় সংঘাত অস্পষ্ট, তবে নাটকের জীবন্ত ও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির কথোপকথন এক অসাধারণ সংলাপ-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নাটকের গতি শ্লথ হয়ে পড়ায় নাটকের ভাবনার (idea) দিকটি প্রধান হয়ে উঠেছে। নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি, তবে বেতারে অভিনীত হয়েছে একাধিকবার। নাট্যকার সম্ভবত আশাও করেননি এর মঞ্চরূপের। সেকারণে মিশরের উপর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আক্রমণ নাটকে না দেখিয়ে নেপথ্যে রণবাদ্য ও বোমারু বিমানের গর্জন শুনিয়ে নাট্যপরিবেশে ভয়ংকর যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। এই নাটকের আঙ্গিক রচনায় নাট্যকার যে প্রকরণটি গ্রহণ করেছেন তা বাংলা নাট্য সাহিত্যে সম্ভবত একেবারে নতুন; তা হল রহস্যবাদ (mysticism)। অবশ্য তিনি এ বিষয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প ইন্দ্রিয়াতীত ঘটনা ও কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত। শচীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ নাটকে বিষয়কে নাটকের আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর স্বাধীন মত ও ভাবনাকে প্রকাশ করে গেছেন। নাটকের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি তাদের নিজের নিজের দর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছে, কীভাবে পৃথিবীতে শান্তি আসবে, মানুষ পাবে সকল দাসত্ব লাঞ্ছনা আর অবমাননা থেকে মুক্তি।

মরনের পার থেকে একে একে আবির্ভূত সিজার ক্লিওপেত্রা হানিবল কনস্তান্তিন কার্লমার্কস শ্রীচৈতন্য, জীবননদীর এপারে দাঁড়িয়ে দুই কৌতূহলী যুবক যুবতীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন; মানব জীবনের মৌল সমস্যাগুলি নিয়ে তারা আলোচনা করছেন, সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। বস্তুত, এই অতীন্দ্রিয়বাদকে আশ্রয় করে বিপ্লবী মানবতাবাদী নাট্যকার সারাজীবনের উপলব্ধিকে নাটকের আধারে পরিবেশন করেছেন।

সম্ভবত, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাকে উপলক্ষ করে এবং মানবসভ্যতার ঐতিহাসিক মহামানবদের নিয়ে কোন নাট্যকার এর আগে কলম ধরেন নি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' কোনদিন মঞ্চস্থ না হলেও এর সাহিত্যিক মূল্য অক্ষয় থাকবে।[১]

১. 'শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সবার উপর মানুষ সত্য' সাম্প্রতিক একাঙ্ক নাটকটি বিশ্বনাট্যসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য'—মন্মথ রায়। (নাট্যসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ১৯৬১।)

স্বাধীনতা-উত্তর শচীন্দ্র-নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন সহজেই লক্ষণীয়। স্বাধীনতার ঠিক আগেই 'কালোটাকা' এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ঠিক পরেই তাঁর 'এই স্বাধীনতা' নাটক দুখানি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ নিয়ে রচিত হয়েছে।

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর সমসাময়িক প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক গণচেতনার উপর ভিত্তি করে নাটক রচনা বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে সম্ভবত শচীন্দ্রনাথই প্রথম। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে নাটক রচনার প্রচলনও তাঁর প্রথম কৃতিত্ব। প্রচারধর্মীতা এইসব নাটকের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট: '...পলিটিকসই আবার নতুন সংস্কৃতি সুতরাং নাট্যশালা যদি তা বর্জন করে চলতে চায়, তাহলে জাতির প্রয়াস থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেই এবং তার জীবনরস শুকিয়ে যাবেই, ডানলোপিলোর আসন অথবা অবিরত দুশ রাত্রির অভিনয় তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।'[১]

এই স্বাধীনতা নাটকখানি অভিনব, একটিমাত্র সেটে বারো ঘন্টার কাহিনী নিয়ে রচিত। পূর্ববংগের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের চরম দুর্দশা তাদের মরণপণ বাঁচার সংগ্রাম, চরম বিপদের দিনে নরনারীর সম্পর্ক সামাজিক সংস্কার জাতি-ভেদ মধ্যবিত্তসুলভ অনুভূতি—সব মিলিয়ে একটা জাতির পরিচয়, তাদের দুর্ভাগ্যের মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এটি একটি সার্থক রাজ-নৈতিক নাটক। পূর্ববাঙলার গৃহহারা মানুষের সামাজিক নৈতিক ও আর্থিক সমস্যা অন্যদিকে আদর্শচেতনা—স্বাধীনতাপ্রিয় যুবক-যুবতীর নতুন দেশ-গড়ার স্বপ্ন, সব মিলিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত নাটকখানির অন্তর্নিহিত সুর ও গতিবেগ উঁচুতারে বাঁধা আছে।

১৯৪৮ সালে শচীন্দ্রনাথ রচিত কালোটাকা নাটকখানিও বিষয় ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য। তিন অঙ্কের এই নাটক একটিমাত্র দৃশ্যেই অভিনীত। সমাজের বুকে কালো-কারবারীরা সাধারণ মানুষের শত্রু, আবার এরাই যখন দেশনেতা এবং সমাজ-সেবকের মুখোশ পরে দেশের বুকে সদর্পে বিচরণ করে তখন তাদের মত ভয়ংকর জীব আর হয় না। যুদ্ধের নিষ্ঠুর পরিণাম—

১. 'জাতীয় নাট্যশালা গড়বার মুখে ভাববার কথা,'—শৌভনিক নাট্যোৎসব স্মারক সংখ্যা ১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। রচনাকাল ১৯৬০।

মন্বন্তর মহামারীর ফলে কিছু মানুষের নৈতিকমূল্যবোধের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। বুভুক্ষ মানুষের অন্ন নিয়ে একজন কালোবাজারীর ষড়যন্ত্র হৃদয়হীনতা, বিদুষী সমাজসেবিকা স্ত্রীর সঙ্গে মনান্তর নাটকের উপজীব্য বিষয়। এখানে লক্ষণীয়, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ ক্রমশ বাস্তবনিষ্ঠ সমসাময়িক সমাজ-চিত্র নাটকে স্থান দিচ্ছেন। নাটকের আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুতে সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ এবং সাধারণ দর্শকদের রুচিমাফিক অবাস্তব কাহিনী কৃত্রিম সংলাপ রচনার প্রবণতাও দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। এই পরিবর্তন পূর্ণ সচেতন প্রয়াসেই ঘটিয়েছিলেন তিনি। এই স্বাধীনতা নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: 'এই স্বাধীনতা নাটকখানি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর আমার প্রথম নাট্য রচনা। ঠিক এর আগেই 'কালোটাকা' লিখেছিলাম। এই দুইখানি নাটকই আমার গৈরিক-পতাকা, সিরাজদ্দৌলা, স্বামী স্ত্রী, তটিনীর বিচার প্রভৃতির চেয়ে পৃথক ধরনের লেখা। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর আমার ধারণায় আসে যে, সমাজের বর্তমান প্রয়োজন বিবেচনায় এখন নাটকের রূপ পরিবর্তন আবশ্যক।'

পূর্বের সামাজিক নাটকগুলিতে তিনি যে ধরনের চলচ্চিত্রসুলভ দৃশ্য সমাবেশ আঙ্গিক ও কাহিনী অনুসরণ করেছিলেন, বর্তমান আলোচ্য নাটক-গুলিতে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূর্বেকার সামাজিক নাটক এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক নাটকের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। যে চলচ্চিত্র আঙ্গিকের উপাদান নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর শেষ জীবনে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এর বাড়াবাড়ি দেখে তিনি নবীন নাট্যকারদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন: 'নাটক যত সিনেমাধর্মী হচ্ছে ততই হাল্কা হয়ে যাচ্ছে, দর্শকদের মনের গভীরতর স্তরকে আলোড়িত করতে পারছে না। এক একখানা নাটক পাঁচ'শ, ছয়'শ রাত চলছে সত্য কিন্তু মঞ্চ থেকে একবার অপসৃত হবার পর স্মৃতি থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে ঠিক সিনেমারই মতো।'

স্বাধীনতাপূর্বে রঙ্গমঞ্চে জাতীয় মুক্তির প্রয়োজনেই ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার স্থান অধিকার করল ব্যক্তি ও সমাজের নানা সমস্যার দিক নিয়ে রচিত নাটকাবলী। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় জাতীয় প্রয়োজন যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে গেলেও দেশ ও জাতির চরম দুর্দিনে ও দুর্বার গণ-আন্দোলনের দিনে রচিত জনচিত্তজয়ী

উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক নাটকগুলির শিল্পমূল্যে নাট্যসাহিত্যে চিরদিনই আলোচিত হবে।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত বাংলা ঐতিহাসিক নাটকও পাশ্চাত্য অনুসরণে রচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় তবে বাংলা নাটকে তার কোন প্রভাবই নেই।

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের জনক মধুসূদন দত্ত। টডের রাজস্থান থেকে সংগ্রহ করে তিনি 'কৃষ্ণকুমারী' লিখেছিলেন বেলগাছিয়ার রাজাদের প্রেরণায়। এরপর ঐতিহাসিক নাটক রচনায় যিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দুমেলার জাতীয় নবজাগরণের ঢেউ বাঙালী শিক্ষিত যুবকদের স্বদেশবোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মন্ত্রে দীক্ষিত অন্যতম পুরুষ। বস্তুত, ইতিহাসকে আশ্রয় করে নাটক রচনার পেছনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশানুরাগের বলিষ্ঠ অনুভূতি সক্রিয় ছিল।[১]

একইভাবে বাংলা রঙ্গজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও তৎপরবর্তী সার্থক ঐতিহাসিক নাটকের স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক রচনার পেছনেও নবজাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমানবতাবোধের কাজ করেছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই ১৯০৬ সালে সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম নাটক লিখে তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রাখতে সহায়তা করেছিলেন।[২]

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। নাটকের আঙ্গিকগত পরিবর্তনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

১. 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতেই আমি 'পুরুবিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২. '....In fact, at the time of Swadeshi Movement what hundred lectures could not do, was accomplished by one single performance of Serajudeoula or Mirkasem'. (Indian Stage—Hemendranath Dasgupta Vol. IV/P. P. No. 8).

নাটকের বৃত্ত ও সংলাপ রচনায়, অংক ও দৃশ্য নির্দেশনায় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নাট্যকারদের অনুসরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের মত রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে তিনি নাটক রচনা করেননি, কিন্তু তৎসময়ে মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় যেমন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তেমনি নাটকের সাহিত্যমূল্যেও তিনি কালসীমা অতিক্রম করে অমর হয়ে আছেন।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্র-পরবর্তী জনপ্রিয় নাট্যকারদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অন্যতম। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের বিষয় ও ভাবনায় গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ্ম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গিরিশ-চন্দ্রের মত মঞ্চের প্রয়োজনেই নাটক রচনা করেছিলেন তিনি এবং সর্বকালীন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলির মত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকাবলী গৈরিকপতাকা সিরাজদ্দৌলা আবুলহাসান ধাত্রীপান্না প্রভৃতি জনপ্রিয়তায় বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্র-পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকে আঙ্গিকগত পরিবর্তন বিশেষ দেখা যায় না। বস্তুত, বাংলা সামাজিক নাটকের মত ঐতিহাসিক নাটকে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমাবদ্ধকালে সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের একই জাতীয় বীরদের নিয়ে বিভিন্ন নাট্যকারগণের রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলি কেবলমাত্র পরাধীনতার দাসত্ব থেকে জাতীয়মুক্তি এবং গণ-আন্দোলনকে দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে লিখিত, সেখানে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসর ছিল না বললেই চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের মত শচীন্দ্রনাথ নাট্য-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নাট্যকার ইবসেনকে অনুসরণ করলেও নাট্যবিষয়বস্তুতে শেকস্‌পীরিও ভাবাবেগ ও রোম্যান্টিকতা বর্তমান এবং নাটকের দৃশ্য ও বৃত্তগঠনে আকস্মিকতা অতিনাটকীয়তা ও নাটকে উপকাহিনী ব্যবহারে এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

যেমন, গৈরিক পতাকা (১৩৩৭) নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের মত শচীন্দ্রনাথও উপকাহিনীর ব্যবহার করেছেন তেমনি এলিজাবেথীয় যুগের পঞ্চাঙ্ক বিভাগও নাটকে অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য, গৈরিক পতাকার নবপর্যায়ের অভিনয়ে নাট্যকার পঞ্চাঙ্ক থেকে তিন অঙ্কে নাটকখানিকে পরিবর্তিত করেছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা নাটকটি তিন অঙ্কেই রচিত। নাটকের আঙ্গিকে প্রচলিত ঐতিহাসিক নাটকের ধারাকে অনুসরণ করা হলেও কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে

পড়ে। দৃশ্যাবলী বাস্তবানুগ করার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ শিবিরে ইংরেজ নর্তকীর ভূমিকায় সেইসময়ে কয়েকজন খাঁটি ইংরেজ নর্তকী আনা হয়েছিল (মাদাম ম্যাকনামারা ও মাদাম বার্ণার্ড ডো প্রমুখ)।[১] অতিনাটকীয়তা আকস্মিকতা এবং করুণরসসমৃদ্ধ নাটকখানির অবয়বে যে আবেগতারল্য সৃষ্টি হয়েছে তা দর্শক-উপভোগ্য হলেও প্রকৃত অর্থে ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা অনুসরণ করা হয়নি। আসলে সে যুগের জাতীয় চেতনা ঐতিহাসিক নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তা থেকে কোন বাংলা নাটককারই মুক্ত ছিলেন না।[২] শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে ইতিহাস নিষ্ঠার চেয়ে বাঙালীর জাতীয় গৌরবের চেতনাই গভীর। নাট্যকার নাটকটির নিবেদন অংশে নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে নাটক ইতিহাসের ঘটনা-পঞ্জী নয়। ঘটনার পিছনে যে কারণটি সক্রিয় তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যই ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান। সর্বশেষে নাট্যকারের পরিষ্কার স্বীকারোক্তি: '...জাতির পক্ষে যা চরম ট্রাজেডি, তাই আমি সিরাজ চরিত্র অবলম্বন করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।'[৩]

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের জনতা-দৃশ্যগুলি শেক্‌স্‌পীয়ারকে অনুসরণ করলেও তা নাটকের পক্ষে অপরিহার্য হয়নি। শেক্‌স্‌পীয়ারের জনতা-দৃশ্য নাটকে যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে[৪] শচীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলা নাট্যকারগণের ঐতিহাসিক নাটকে সে রকম হয়নি। সিরাজদ্দৌলা নাটকের জনতা-দৃশ্যে শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে সিজারের মৃত্যুর পর ব্রুটাস ও মার্ক অ্যান্টনির বক্তৃতা—রোমের সাধারণ জনতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া,

১. 'বাঙলা থিয়েটারে সিরাজদ্দৌলা' মধুসূদন মজুমদার। যুগান্তর সাময়িকী, রবিবার ১৩ অগাস্ট ও ২০ অগাস্ট ১৯৭৮।

২. 'বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে বাঙলার জাতীয় আন্দোলন এমন অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত হয়ে আছে যে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির আলোচনা কখন সম্পূর্ণ হয়না।' (নাটকের কথা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১৬)।

৩. সিরাজদ্দৌলা নাটক, ঊনবিংশ মুদ্রণ ১৩৬৯।

৪. '....He (Shakespeare) insists on the people's humanity and though he may use them as material for laughter, it is with kindness and sympathy. It was, of course, inconceivable to him that they could ever become rulers of the nation, but they were part of it; they were wounded, suffered and died in its wars. (Who needs Shakespeare'—by Sidney Finkelstein, P. 15).

তাদের সারল্য সততা হিংস্রতা সব মিলিয়ে দেশের সাধারণ নাগরিকের যে বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র দেখা যায় সিরাজদ্দৌলা নাটকে তার অনুকরণ থাকলেও উন্নত রোম সভ্যতার নাগরিক চরিত্রের সঙ্গে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত বঙ্গসন্তানদের চারিত্রিক সাদৃশ্য ও সংলাপগত মিল খুঁজতে যাওয়া হাস্যকর। এদিক থেকে সিরাজদ্দৌলা নাটকে নাট্যকারের ইতিহাস নিষ্ঠার চেয়ে অনুকরণ-প্রিয়তাই বড় হয়ে উঠেছে।

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির অন্যতম 'ধাত্রীপান্না'। নাটকত্বের দিক দিয়ে বাংলায় মুষ্টিমেয় সার্থক যেকটি ঐতিহাসিক নাটক আছে ধাত্রীপান্না তার মধ্যে একটি। মাত্র দুটি অঙ্কে ও পাঁচটি করে মোট দশটি দৃশ্যে নাটকটি শেষ হয়েছে। অঙ্ক ও দৃশ্য ভাবনায় শচীন্দ্রনাথ তাঁর মঞ্চসফল নাটকগুলিতে যে 'আধুনিক' পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাতে নাটকের গতিকে দ্রুততর করে তোলার চেষ্টাই স্পষ্ট হয়েছে। ধাত্রীপান্না নাটকটি তার ব্যতিক্রম নয়। তবে অতিনাটকীয় দৃশ্য ও সংলাপে নাটকখানির গঠনরীতিকে হাল্কা করে ফেলেনি। এই উৎকৃষ্ট নাটকটি বাংলা নাট্যজগতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে এবং শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাট্য প্রতিভারও উদাহরণ স্বরূপ বটে।[১]

১. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পান্নার গৌরবময় আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে অনেক নাটকই রচিত হয়েছে। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত প্রফুল্লময়ী দেবী রচিত ধাত্রীপান্না নাটকটি পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত এবং এর কিছু সংলাপ কাব্যে রচিত। ১১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের লেখা পান্না নাটকটির কাহিনী অংশ টডের বর্ণনাকে অনুসরণ করেছে।—লেখক

সাত

॥ সংলাপ ॥

নাট্যআঙ্গিকে 'সংলাপ'-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংলাপ হলো নাটকের প্রাণ। চরিত্রের ভাব ও ভাষা অনুযায়ী সংলাপের ভাব ভাষা স্থির হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে চরিত্র সংগ্রহ করে তাদের সামাজিক অবস্থান শিক্ষা সংস্কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যুগের ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রেখে নাট্যকার সার্থক সংলাপ রচনা করেন। অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'নাটকের কথা' গ্রন্থে বলেছেন: 'সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক। আর সংলাপ যেখানে শুধু কেবল ভাষার অহেতুক আড়ম্বর মাত্র, স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে সংগতিহীন সেখানে তা চরিত্রকে কলের পুতুল করে মাত্র, সজীব মানুষে পরিণত করিতে পারে না।'[১]

এ ছাড়াও নাটকের সংলাপে তার একটি বস্তু অবশ্যই থাকা দরকার তা হল নাটকীয়তা ও কবিত্ব। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের ভাষা আর শিল্পের ভাষা এক হতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবেশ অশিক্ষা ও সংস্কারবশতঃ আমরা সুখ-দুঃখ মান-অভিমান হতাশা ইত্যাকার জটিল মানসিক অবস্থাকে ভাষায় অনেক সময় প্রকাশ করতে পারি না। নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য—রসসৃজনের তাগিদে চরিত্রকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করতে গেলে উপযুক্ত সংলাপের মাধ্যমে মানুষের মনোজগতের ভাবনা ও অনুভূতিগুলিকে নাটকীয় সংলাপে মূর্ত করা আবশ্যক। কিন্তু এই নাটকীয় সংলাপ কখনো কখনো অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত হয়। অতিনাটকীয়তা নাটকের কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলে, সমগ্র কাহিনীকে অবাস্তব করে তোলে এবং নাটকের শিল্পরস যথার্থই ক্ষুন্ন করে। তবে অতিনাটকীয়তাও প্রতিভাবান নাট্যকারের হাতে কখনো কখনো নাটকের একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকরীতি হয়ে ওঠে।

---

১. 'নাটকের কথা'। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ৩০।

আর্থার সিমনস-এর মতে অতিনাটকীয়তা এবং কবিত্ব নাটকের অবয়ব এবং প্রাণ।[১] কবি ও নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলিতে অতিনাটকীয়তাই নাটকের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য। আমাদের নাট্যসাহিত্যে অধিকাংশ নাট্যকারই শেক্‌স্‌পীয়ারকে অনুসরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল ও শচীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটক অতিনাটকীয়তায় চিহ্নিত।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের মঞ্চসফল সামাজিক নাটকের সংলাপ ও দৃশ্য রচনায় অতিনাটকীয় উপাদান প্রচুর। কিন্তু সামাজিক নাটকে অতিনাটকীয়তা রসোত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই নাটকের আখ্যানভাগ অবাস্তব হয়ে উঠেছে এবং চরিত্রগুলি কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশেষত স্ত্রী-চরিত্রের সংলাপ বর্তমান যুগের 'অত্যাধুনিক' স্ত্রীলোকদের মুখেও তেমন বাস্তবসম্মত মনে হয়না। কিন্তু এই ধরনের সংলাপই শচীন্দ্র-নাটকের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। নাটকীয়তা সৃষ্টিতে এর মূল্য অসাধারণ। অভিনয়ের সাহায্যে কোন ভাবাদর্শ সহজে সঞ্চারিত করার একমাত্র উপায় নাটকীয়তা। এইজন্যে নাটকের সংলাপকে আবেগধর্মী ও অলংকৃত করা নিতান্তই প্রয়োজন।[২]

বাংলা নাটকে সংলাপেরও একটি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আছে। বাংলা নাটকের আদি-পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত নাটকের সংলাপের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-

১. 'Life and beauty are the body and soul of great drama. Mix the two as you will, so long as both are there, resolved into a single substance. But let there be, in the making, two ingredients, and while one is poetry, and comes bringing beauty, the other is a violent thing which has been scornfully called melodrama, and is the emphasis of action. The greatest plays are melodrama by their skeleton and poetry by the flesh which clothes the skeleton'. (A theory of stage—Arther Symons.

২. নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য অনেক সময় নাটকের ভাষাকে অবিকল বাস্তবের ভাষা করে চলেনা। তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া, তাহাতে রং চড়াইয়া আবেগধর্মী করিয়া তুলিতে হয়। শিল্পজগতে ইহাই স্বাভাবিকতা, ভাষা কিছুটা অলংকৃত কিছু অসাধারণ হইবেই।... বাস্তবের অন্ধ অনুকরণে ভাষা সুবোধ্য হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে নীচতা ও নিছক গদ্যময়তা হইতে রক্ষা করিতে হইলে কিঞ্চিৎ সালংকরা করিয়া প্রকাশ করিতেই হয়।

এই সালংকারতাই সংলাপকে সাধারণের উর্ধ্বে উন্নীত করে এবং এই অসাধারণত্বই রসত্বের হেতু হয়। অভিনয়ের হাব-ভাব-ভাষা ও কণ্ঠস্বরে এই অসাধারণত্ব বহির্জগতের নিয়মে অবাস্তব মনে হইতে পারে, কিন্তু মনোজগতের নিয়মে ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব।' (ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, পৃঃ ২৬৮-৬৯—ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়)।

নিরীক্ষা হয়েছে। নাটকের আঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংলাপ কখনও গীতিধর্মী, সংস্কৃতানুসারী গদ্যভঙ্গী অথবা একেবারে সাদা সরল কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করেছে।

মাইকেল মধুসূদনের প্রথম দিকের নাটকে প্রাচ্য-আঙ্গিক পুরোপুরি অনুসৃত না হলেও এর সংলাপ-অংশ সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ও তৎসম শব্দের আড়ষ্টতায় নির্মিত হয়েছে। অবশ্য প্রহসনগুলির ক্ষেত্রে মধুসূদন যে অনবদ্য নাট্য-আঙ্গিক সংলাপ ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন বাংলা নাটকের ইতিহাসে তা আজও অতুলনীয় বললে অত্যুক্তি হয়না।

দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম গ্রাম্য কথ্যভাষার অবিকৃত রূপ দেখতে পেলাম। নীল সাহেবের অত্যাচার গ্রামবাংলার সহজ সরল মানুষগুলোকে কি অসহায় ও দুঃসাহসী করে তুলেছিল, দীনবন্ধু হুবহু সেই দৃশ্যগুলি তাঁর নীলদর্পণে নাটকায়িত করে তুলেছেন, সংলাপ এখানে চরিত্রের দর্পণ হয়ে উঠেছে।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পর প্রতিভাবান নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাটক রচনায় পাশ্চাত্য আঙ্গিককে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন। পৌরাণিক নাটকের সংলাপে গদ্যের পরিবর্তে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত 'গৈরিশ' পদ্য-ছন্দের উদ্ভাবনের ফলে নাটকীয়তা ও পৌরাণিক ভাবের ব্যঞ্জনায় তাতে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের সংলাপেও পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে। সামাজিক নাটকে কথ্য-ভাষাশ্রয়ী গদ্য-সংলাপ সফল হয়েছে। সেখানে দীনবন্ধু মিত্রই ছিলেন তাঁর আদর্শ। প্রয়োজনবোধে এইসব গদ্য সংলাপে চরিত্র ও ঘটনার গভীরতা আনার জন্য গিরিশচন্দ্র 'বাগবাজারী বুলি' বা 'ককনি' নাটকে ব্যবহার করেছেন।

সংলাপের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কবিত্বধর্মী, ধ্রুপদী অঙ্গের চর্চা গীতিকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকেই দেখা গেল। ভাষা এবং ভাবের ক্ষেত্রে তিনি দেশ ও কালের সীমাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রে স্থানগত বৈশিষ্ট্য অথবা ক্ষণস্থায়ী ঘটনানুযায়ী ভাষাকে তিনি নাটকে স্থান দেননি।

বাংলা নাট্যজগতে প্রতিভা-জ্যোতিপুঞ্জের মধ্যে রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আছে। অনন্যসাধারণ শিল্পী-অন্তঃদৃষ্টির বলে দুরূহ তত্ত্ব নির্বাচিত দেশজ শব্দের প্রতীকীর মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। রবীন্দ্র নাটকের

সংলাপ সহজিয়া এবং বাউল সংগীতের কথা ও সুরে বাঁধা। রবীন্দ্র-নাটক বাংলা মঞ্চনাটকের গতানুগতিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র মূল্যায়নের দাবি রাখে। নাট্যসংলাপের বিবর্তন অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকগুলি সর্ববিষয়ে 'আধুনিকতা'র মাপকাঠি বলে গ্রহণ করা যায়। সুদীর্ঘ বক্তৃতাধর্মী সংলাপ তাৎপর্যহীন অহেতুক বাগাড়ম্বর রবীন্দ্র-নাটকে দেখা যায় না।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পূর্বসূরী নাট্যকারগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরীতিকে অনুসরণ করেছেন। সংলাপের ক্ষেত্রে অতিনাটকীয় প্রবণতা ঐ দুইজন নাট্যকারেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব। বাংলা মঞ্চ-নাটকের জনপ্রিয়তার মূলে অতিনাটকীয় কাহিনী ও সংলাপের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে, শচীন্দ্রনাথও এই ধারার ব্যতিক্রম নন। বস্তুত, মঞ্চঘনিষ্ঠ নাট্যকারের দর্শকরুচি অনুসরণ এর অন্যতম কারণ। এ প্রসঙ্গে বাংলা নাটকের চরিত্র ও প্রকৃতি সম্পর্কে ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মূল্যবান অভিমতটি অনুসরণীয়। তিনি 'নাটকের কথা' গ্রন্থে বলেছেনঃ 'বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রেও দেখি দর্শকদের রুচি ও প্রবণতা নাটকের বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। বাঙালী-প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে যেগুলি বাঙলা নাটকের কয়েকটি অনিবার্য লক্ষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা বাঙলীচিত্তের একটা প্রধান ধর্ম তা বাঙলা নাটকের সংলাপের মধ্যে অনেক স্থলেই পরিস্ফুট হয়েছে। দীর্ঘ বক্তৃতা, তরল আবেগের অনর্গল প্রবাহ, অসংযত ভাবের অপরিমিত উচ্ছ্বাস বাঙলা নাটকে অত্যন্ত সুলভ। সংহত ট্র্যাজিক গাম্ভীর্য অপেক্ষা ক্রন্দনসিক্ত কারুণ্যের মাত্রাতিশয্যের দিকেই বাঙালী চিত্তের আকর্ষণ বেশি।'[১]

সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকের যে যে বৈশিষ্ট্য, তাকে অনুসরণ করে সংলাপের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। শচীন্দ্রনাথের এই দুই ধরনের নাটকের সংলাপে অতিনাটকীয় ঝোঁক বর্তমান। তবে তাঁর স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক রাজনৈতিক ও তত্ত্বপ্রধান নাটকগুলিতে এই ধরনের অতিনাটকীয় সুলভ উপাদান বিশেষ নেই; সংলাপ ও নাটকের চরিত্র কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়নি।

শচীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা-পূর্ব অধিকাংশ মঞ্চসফল নাটকই নগর-কেন্দ্রিক,

১. 'নাটকের কথা', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ১০০।

পাত্র-পাত্রীরাও সমাজের সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীর—শিক্ষা দীক্ষায় 'অত্যাধুনিক' আচার আচরণে চিন্তায় মননে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে তারা অনেক দূরে। এদের ইংরেজি শব্দবহুল কথাবার্তা কৃত্রিমতায় ভরা। সাধারণ দর্শকদের কাছে নাটকের এইসব চরিত্রের রীতি-প্রকৃতি জীবনযাপন ধ্যানধারণা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আবার এদেরই মধ্যে কোন প্রসাধনচর্চিতা প্রগতিশীল ও স্বাধীনচেতা নারীর বুক ভেঙে যখন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অথবা স্যুট-কোট-টাই ধারী বাঙালী সাহেবরা দুঃখে ও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে, সাধারণ দর্শকেরা তখন এইসব অচেনা মানুষের তুচ্ছ দুঃখবেদনার প্রতিও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এই ধরনের পাত্র-পাত্রীর মুখে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গতিবেগসম্পন্ন মার্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ বসিয়েছেন, ফলে নাটকের গতি হয়েছে দ্রুততর।

একই সময়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেও শচীন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে যে সংলাপগত বৈশিষ্ট্য, তাকে মনে রেখে অত্যন্ত সচেতনভাবেই তিনি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন।[১] বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সব চরিত্রের সংলাপই নাটকের একটি বিশেষ সুরে বাঁধা; সেখানে সম্রাট সেনাপতি প্রজাবৃন্দ নাটকের এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চিত্রিত, সব চরিত্রই এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে রত, তারা এক বিশেষ উত্তেজনাময় ঘটনার সাক্ষী।

সামাজিক নাটকে সমসাময়িক যুগ ও সাধারণ মানুষের আচার আচরণ যত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায় ঐতিহাসিক নাটকে তার বেশির ভাগই কল্পনার সাহায্য নিতে হয়—এ কারণে ঐতিহাসিক নাটকের পাত্রপাত্রীদের সংলাপ ঘটনা বা কাহিনী মুখ্য উদ্দেশ্য ও পরিণতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্রের বিস্তার ঘটাতে হয়। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপে 'আবেগ' ও 'নাটকীয়তা' হল মুখ্য উপাদান। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের মত শচীন্দ্রনাথও ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ রচনায়

১. 'সিরাজদ্দৌলা নাটক রচনার সময় তাঁর সেই বলিষ্ঠ সংলাপের কথা ভুলতে পারবো না। লিখে তিনি মাঝে মাঝে ডেকে শোনাতেন। বলতেন নাটকের যে মূল সুর ঠিক সেই ভাষায় সংলাপ রচনা করতে হবে। কাজেই সামাজিক নাটকে যে সংলাপ ঐতিহাসিক নাটকে সেই সংলাপ কিছুতেই চলতে পারে না।' (নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত—শ্রীঅখিল নিয়োগী রূপমঞ্চ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৪।

একই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের মত রোম্যান্সাক্রান্ত নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপ ঐতিহাসিক ঘটনাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, শচীন্দ্রনাথ ঘটনাতেই আবদ্ধ থাকেন। তাঁর সংলাপের বলিষ্ঠতা তাৎক্ষণিক উদ্দীপনার সঞ্চার করে, ঘটনা সহসা জীবন্ত আলেখ্য হয়ে ওঠে। শচীন্দ্রনাথের এই সংলাপগুণেই তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার উৎস।

সংলাপ বিচারে ভাষার একটি বিশেষ স্থান আছে। ভাষার বিশ্লেষণের সাহায্যে সংলাপের চরিত্র-প্রকৃতি নাটকীয়তা উপযুক্ততা নির্ণয় করা যায়। শচীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে সংলাপের ধ্বনিমাধুর্য ও গতিশীলতার মূলে আছে এর ভাষাসম্পদ। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপে সাধু ও চলিত শব্দের মিশ্রণ ও বাক্যের গঠনে ক্রিয়াপদ ও বিশেষণের প্রাধান্যদানের ফলে ভাষার অনায়াস গতিবেগ সঞ্চারের মধ্যে সংলাপগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এছাড়া পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ নাটকের দৃশ্যে স্বগতোক্তি জনান্তিক, স্বগত-ভাষণ প্রভৃতি ব্যবহার করলেও শচীন্দ্রনাথ সেগুলি বর্জন করেছেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এবং কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রলালও নাটকের রচনায় পদ্য-অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। শচীন্দ্রনাথের নাটকে তাও পরিত্যক্ত হয়েছে।

ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ রচনায় শচীন্দ্রনাথের ওপর দ্বিজেন্দ্র-নাটকের প্রভাব তেমন বিস্তার করেনি বলেই মনে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়, এর বাক্যগঠনে কবিত্ব ও ধ্রুপদী-আঙ্গিক অনুসৃত। শব্দালংকার ব্যঞ্জনা উপমা ব্যবহারে সংস্কৃতানুগ কাব্য ভাবনাই স্পষ্ট হয়েছে।[১]

১. দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গদ্যভাষায় যে কবিত্ব দেখা যায় তাতে তাঁর সচেতন প্রয়াসই লক্ষিত হয়। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'বাঙ্গালা ভাষায় নাট্যসাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' এই বিষয়ে তাঁহার আদর্শ ছিল ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও নাট্যকার Schiller—এর গদ্যভাষা ও সংলাপ। তিনি ঐ আত্মজীবনীতেই লিখেছেন: 'বঙ্কিমের গদ্য অনেকস্থলেই পদ্য। Schiller, Lesseng, Ibsen, Moliere ইত্যাদি মহানাট্যকারগণের বহু মহানাট্য গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। Schiller এর গদ্যের ভাষা ও রূপক অনুপ্রাসে গদ্যের সৌন্দর্য্য।'

আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, নাটকের সংলাপ রচনায় পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের বিষয় রচনারীতি ও ভাষার প্রভাব একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কমবেশি সকল নাট্যকারের উপর পড়েছে। দ্বিজেন্দ্র-নাটকের সংলাপেও সাহিত্যক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অনসৃত হয়েছে বলেই মনে হয়।[১] বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে নাটকের জন্মলগ্ন ও তার বিবর্তন যেহেতু বাংলা গল্প-উপন্যাসসাহিত্যকে অনুসরণ করেছে, সে কারণে নাট্য-সংলাপের ভাষা ও রচনারীতিতে সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়।[২]

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপে কবিত্বভাব কোন কোন স্থানে ফুটে উঠলেও তা সরল গদ্যশৈলীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। শচীন্দ্র-সংলাপে কবিত্বের চেয়ে মনন ও শাণিত বুদ্ধিবৃত্তিই প্রধান হয়ে উঠেছে। ভাব অনুযায়ী তা কখনো শব্দের ঐশ্বর্যে উঁচু তারে বাঁধা, কখনও তা সরলগামী হয়ে উঠেছে—

রামদাস ঃ ভারতের ইতিহাসে তুমি কি শুধু দেখেছ মা বৈরাগ্যের প্রভাবে শক্তির অপচয়? ঐশ্বর্যের অনাচার দেখনি? তামসিকতার জড়তা দেখনি? মদ-মাৎসর্যের উচ্ছৃংখলতা উদ্দামতা দেখনি? বৈরাগ্য মানুষকে খর্ব করে না মা, বৈরাগ্য মানুষকে অতিমানব করে তোলে।··· (গৈরিক পতাকা। ৩ অংক ৪ দৃশ্য)।

---

১. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাসে' বলেছেন ঃ 'রমেশ দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বীরত্ব ও শৌর্যের বর্ণনায় তাঁহার (ডি. এল, রায়) চিত্ত উল্লসিত থাকিত। তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলির কথায় এবং আচরণে সর্বত্র একটা দৃপ্ত পৌরুষ এবং অটল গাম্ভীর্যের ভাব প্রকাশিত।'

২. বঙ্কিমচন্দ্রের ও দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার সমধর্মীতার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—"কখন দেখিতাম আকাশমার্গে অষ্টশশি সমন্বিত শনৈশ্বর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহসকল খন্ড খন্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া দাহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমন্ডলের চতুর্দিকে প্রধাবিত হইতেছে···" (রজনী-বঙ্কিমচন্দ্র) / "এই প্রধূমিতা প্রজ্বলিতা, প্রবাহিত রক্তস্রোতস্বতী ভৈরব ভারত ভূমির পরিবর্তে এক রত্নালংকারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীতমুখরা, হাস্যময়ী জননী। জলধি হইতে জলধি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য। (চন্দ্রগুপ্ত-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১।৪)

ঐ একই দৃশ্যে সংলাপের ভাষা সরল ও সাবলীল কিন্তু আবেগ বর্জিত নয়—

রামদাস ঃ 'রাজ্য তোমার নয় তা আমি জানি। মহারাষ্ট্র তার রাজার নয়, মহারাষ্ট্র সমগ্র জাতির। রাজার নয় বলেই তুমি রাজ্য কাউকে দান করতে পার না। মহারাষ্ট্র যেদিন বলবে যে, সে তার রাজাকে চায় না, সেইদিন রাজ্যভার ফেলে তুমি আমার কাছে চলে এসো। মনে রেখো রাজ্যি তোমার বিলাস নয় তোমার ধর্ম।'

বলাবাহুল্য, শচীন্দ্রনাথের এই ধরনের নাট্য-সংলাপগুলি বারবার আবৃত্তি করলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অর্ধতৎসম শব্দের সঙ্গে মিলিত কথ্য চলিত শব্দ দ্বারা নির্মিত ভাবোদ্দীপনাময় বুদ্ধিদীপ্ত ভাষার কথাই মনে পড়বে। যেমন—

'হয়ত একথা তোমার সত্যি বন্দনা, এ আমার সংস্কার—সুদৃঢ় সংস্কার, কিন্তু মানুষের ধর্ম যখন এই সংস্কারের রূপ ধরে বন্দনা, তখনি সে হয় যথার্থ, তখনি হয় সে সহজ। জীবনের কর্তব্যে আর তখন ঠোকাঠুকি বাধেনা, তাকে মানতে গিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করে মরতে হয়না। তখন বুদ্ধি হয়ে আসে শান্ত, আবার জলস্রোতের মতো সে সহজে বয়ে যায়। বুঝি একেই বলেছিলুম সেদিন, এ হলো বিপ্রদাসের অত্যাজ্য ধর্ম—এর আর পরিবর্তন নেই।' (বিপ্রদাস)

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু কাহিনী চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষত শরৎচন্দ্রের সুষমামণ্ডিত ভাষা-রীতিকে শচীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সংলাপ রচনায় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নাট্যজগতে প্রবেশের আগে সাংবাদিক জীবনের শুরুতে তিনি যে তিনখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তার বিষয়ভাবনা ভাষা ও রচনাশৈলীতেও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের প্রভাব আমরা দেখতে পেয়েছি।[১] তাঁর সামাজিক নাটকের প্রগতিশীল বিষয়বস্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা শিক্ষিত মার্জিত স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ স্বভাবতই শরৎ-উপন্যাসকে মনে পড়িয়ে দেয়। শচীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের অসামান্য প্রভাবের ফলশ্রুতি একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যেই প্রমাণ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে 'দেবদাস' উপন্যাসের নাট্যরূপদানে শচীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' চরিত্রটির উল্লেখ করা যেতে পারে। বসন্ত উপন্যাসের বহির্ভূত চরিত্র। একদা এই বিতর্কিত চরিত্রটি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলেও দেবদাস

১. পরিশিষ্ট (অন্যান্য রচনা) দ্রষ্টব্য

নাটকের মঞ্চ-সাফল্য বিশেষ করে নাটকে বসন্ত চরিত্রটির অনিবার্য সংযুক্তির স্বাভাবিকতা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। এই চরিত্রটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এর সংলাপ রচনায় এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। বলাবাহুল্য, বসন্তর ভাববিলাসী ভবঘুরে চরিত্র শরৎসাহিত্যে সুপরিচিত। এর মার্জিত ব্যবহার নিরহংকার আত্ম-উদাসীনতা বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ শরৎচন্দ্রের বহু চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া, শচীন্দ্রনাথের নাটকে শরৎচন্দ্রের প্রভাব অন্য ভাবেও দেখা যায়। শরৎ-উপন্যাসের মত শচীন্দ্রনাথের সুপ্রিয়ার কীর্তি, জননী, রক্ত-কমল, ঝড়ের রাতে, স্বামী স্ত্রী, তটিনীর বিচার, ধাত্রীপান্না, এই স্বাধীনতা প্রভৃতি নাটকগুলিতে স্ত্রী-চরিত্র কমবেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। এই সমস্ত নারীর আচার আচরণ, কথোপকথন সর্বদা বাস্তবসম্মত না হলেও স্ত্রী-চরিত্র রূপায়ণে শরৎচন্দ্র 'অবলা' নারীদের মুখে যে প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে শচীন্দ্রনাথের নারীদের সংলাপে।

কেবল আধুনিক নরনারীদের কথাবার্তাতে নয় শচীন্দ্র-নাটকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার যে পরিচয় পাওয়া যায়, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায়, এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইঙ্গিতে যা ফুটে উঠেছে, নিঃসন্দেহে তিনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে তা গ্রহণ করেছেন। মাটির মায়া নাটকে (১৯৪৩) কৃষক-সন্তান রূপান্তরিত হয়েছে শ্রমিকে, তেমনি একটি চরিত্র নবু তার কৃষক-পিতাকে বলছে : 'কারখানা ছাড়া আমাদের ভিন দেশ নেই বাবা, জাতেরও আমাদের কোন তফাৎ নেই। আমরা চাষী নই, বামুন কায়েত, ভদ্দর অভদ্দর নই, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নই।...আমরা সব এক দেশের, এক জাতের এক কুলের মানুষ—মজদুর, আমরা মজদুর।' পথের দাবী উপন্যাসে এই শ্রমিক চেতনার সুর বহু স্থানে বর্তমান। শুধু তাই নয় সংলাপের ভাষার ঐ বিশেষ শৈলীটি শরৎ উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত।

শরৎচন্দ্রের ভাষা-রীতিকে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ কতখানি অনুসরণ করেছেন তা উভয়ের সংলাপ পাশাপাশি রেখে বিচার করলে স্পষ্ট হয়। ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে না বসিয়ে বাক্যের মাঝামাঝি বা প্রথম দিকে নিয়ে আসার ফলে বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত গতির সঞ্চার হয়, এবং অর্ধতৎসম শব্দের ছন্দে মিল রেখে কথ্য চলিত

শব্দের প্রয়োগে আবেগধর্মী বাক্য গঠিত হয় যা শরৎচন্দ্রের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—শচীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপে এর প্রভাব অসামান্য। বলাবাহুল্য, শরৎচন্দ্রের ভাষা-রীতি আবার রবীন্দ্রনাথের দ্বারা গভীর প্রভাবিত। শচীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকে কিছু সংলাপে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বপূর্ণ ভাষার প্রভাবও দেখা যায়।

শচীন্দ্রনাথের প্রথম সামাজিক নাটক 'রক্ত-কমল' (১৯২৯)-এ কিছু সংলাপ স্থানে স্থানে কাব্যিক হয়ে উঠেছে। যেমন, রক্তকমল নাটকের ১ম দৃশ্যে—

দাদামশায়ঃ 'তোর যখন দশ বছর বয়েস, তখন ওই গাছটি এনে লাগিয়েছিলুম। ও যখন প্রথম ফুল দিয়েছিল, তখন তুই এসে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতিস—কিছুতেই আর তোকে ঘরে নিয়ে যেতে পারতুম না। তখন তুই কাপড় পরতিস লাল, জামা পরতিস লাল, সকালের আর সন্ধ্যার লাল আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতিস আর কেন যেন তোর চোখ দুটোও লাল হয়ে উঠত। দেখে আমার ভয় হোতো।...'

এই ধরনের সংলাপে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই প্রতিফলিত। এমনি কিছু ঐতিহাসিক সংলাপেও শচীন্দ্রনাথের কাব্যিক অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—'দারা, রঙদিল, দুর্ভাগ্যের মরু মাঝে পথহারা দিশেহারা আমি ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছিলাম দুনিয়ায় এখন আর স্নেহের শীতলধারা বয়ে যায়না। প্রেমের প্রবাহ তপ্ত বালির তলে চাপা পড়ে গেছে। তুমি রঙদিল, তুমিই আমার সে ভুল ভেঙে দিলে, তুমিই বুঝিয়ে দিলে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা··· ।' (রাষ্ট্রবিপ্লব, ২ অঙ্ক, ১ দৃশ্য)

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংলাপ শচীন্দ্রনাথের চেয়ে বরং মন্মথ রায়ের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়। অন্যদিকে শচীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা দ্বিজেন্দ্র-পরবর্তী-যুগে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই ভাষার সহজ সাবলীল প্রবহমান ঝংকারের সঙ্গে যে ওজোগুণ সম্পৃক্ত আছে তাতে সহজেই ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের সংলাপ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রীদের কথোপকথন, মার্জিত ও কেতাদুরস্ত। সংলাপ সেখানে সাজানো শব্দের উদ্যান—সযত্ন ও সুপরিকল্পিত। সমাজের সর্বশ্রেণীর নারীপুরুষের মুখে হৃদয়ানুভূতির বাহন হিসাবে নির্বিচারে ব্যবহৃত এই শাণিত সংলাপ বলাবাহুল্য বহুস্থানে কৃত্রিম,

অবাস্তব ও অসামঞ্জস্য বলে মনে হয়েছে, তথাপি সংলাপের ওজোগুণে আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না। এর স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতে, কান কেড়ে নেওয়া শব্দের কারুকার্যে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হয়ে ওঠে। সংলাপ রচনায় শচীন্দ্রনাথ আধুনিক রীতির প্রয়োগ করেছেন। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের দ্বারাও তাঁর কিছু কিছু নাট্যসংলাপ অসাধারণ শিল্প মননের সৃষ্টি করেছে যা সে যুগের প্রকৃত নাট্যরসিক দর্শককেও মুগ্ধ করেছে। মানবতা বিশ্বপ্রেম সমাজ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর স্বাধীন মতামত নাট্যচরিত্রগুলির মুখে আশ্চর্য মাধুর্যে পরিস্ফুট হয়েছে, সেগুলি সর্বদা স্বাভাবিক না হলেও এর শিল্পমূল্য অপরিসীম।

তবে শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের সংলাপে শিল্পমূল্য কিছুমাত্র থাকলেও তা কখনো কখনো চরিত্রোপযোগী ও বাস্তবানুযায়ী হয়নি। সাজানো গোছানো সাহিত্যের ভাষায় মানুষ কথা বলে না। মানুষের অতি তুচ্ছ সাধারণ কথ্য ভাষার মধ্যে যে অসাধারণ নাটকীয়তা লুকিয়ে থাকে, সার্থক ও দক্ষ নাট্যকারের হাতে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চল্লিশোত্তর বাংলা নাটকে এর সুন্দর রূপ দেখা গেছে। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের (মহাযুদ্ধ পর্ব) সামাজিক নাটকের সংলাপ বহুলাংশে আপাত শ্রুতিমধুর হলেও স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। এ ধরনের সংলাপের বৈশিষ্ট্যই হল ভাষার ঋজুতার গুণে সংলাপের তীক্ষ্ণতা ও অতিনাটকীয়তা শ্রোতৃ ও দর্শকমণ্ডলীকে সাময়িক-ভাবে অভিভূত করতে সক্ষম।

অবশ্য প্রথম পর্বের 'দেশের দাবী' নাটকখানি ছিল শচীন্দ্রনাথের ব্যতিক্রম প্রয়াস। নাটকখানিতে ঘটনাদ্বন্দ্ব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, ঘটনার গতিও মন্থর। কিন্তু এর সংলাপ-অংশ অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং অতিনাটকীয়তা, যা তাঁর অধিকাংশ নাটকের বৈশিষ্ট্য, এ নাটক সে ত্রুটি থেকে মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে নাটকখানিতে তেমন কৌতূহলোদ্দীপক নাটকীয় কাহিনী স্থান পায়নি। একটা 'আইডিয়া' বা ভাবাদর্শ এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়, সেখানে ঘটনা মুখ্য নয় একটা সমাজ-রাজনৈতিক সমস্যাই এর উপজীব্য। এই নাটকের সংলাপ অত্যন্ত 'আধুনিক' স্বাভাবিক ও সংস্কারমুক্ত, যা সে যুগের পটভূমিকায় আশ্চর্যজনক অভাবিত। নাটকখানির মঞ্চ-অসাফল্য প্রমাণ করে সে যুগের দর্শকরুচি তা অনুমোদন করেনি। যেমন—

অমরেশ ঃ······এগারো আর এগারো করে দু'জন তরুণীর ঠাসবুনোনি বাইশ হাত জেনুইন খদ্দরের শাড়ী জলে ভিজলে, ওজনে কত দাঁড়াবে একবার হিসেব করে দেখুন। তার সঙ্গে যোগ করুন ব্লাউজ সেমিজ এবং আরো কিছু যার নামোল্লেখ আনপার্লামেন্টারী এবং আপনাদের বিচারে অশ্লীলও হতে পারে। কিন্তু তারও ওজন আছে। এখন বিবেচনা করুন, বাচ্চা ওই বনমালীকে দিনে দু'বেলা করে না হলেও অন্তত একবেলা সেগুলো কাচতে হবে, নিংড়োতে হবে, রোদ দিতে হবে। হয়ত তার হাত ফুলে একেবারে কলাগাছ হয়ে উঠবে, আমাদের চা দিতে পারবে না, জুতো সাফ করতে পারবে না, এমন কি মহিমদার পা পর্যন্ত টিপে দিতে পারবে না।

খাঁটি নাগরিক বৈদগ্ধ্য শচীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ; যেটি দেখতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। এছাড়া প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির প্রভাবও তার ওপর পড়েছে। তাঁর সামাজিক নাটকের সংলাপে ইংরেজি অংশগুলিও নাট্যকারের ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের নিদর্শন। শচীন্দ্র-নাটকের এই ইংরেজি সংলাপগুলির বলিষ্ঠতা তীক্ষ্ণতা মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলিতে ইয়ংবেঙ্গলদের মুখে ইংরাজি সংলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। শচীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক নাটকে 'অত্যাধুনিক' নরনারীদের মুখে সময়ে অসময়ে যে ইংরেজি সংলাপগুলি বসিয়েছেন তাতে যে নাটকীয় নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে তা তাঁর সমসাময়িক বাংলা নাটকে দুর্লভ।

ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে মুগ্ধ ছিলেন শচীন্দ্রনাথ। সেকারণে তাঁর সামাজিক নাটকের পাত্র-পাত্রীরা বিদ্রোহী পাশ্চাত্য আলোকে উদ্বুদ্ধ—তাদের আচার আচরণ ও মতবাদ সমাজের কুসংস্কার ও প্রচলিত ধ্যানধারণাকে একেবারেই তুচ্ছ করে দিয়েছে। তাদের মুখে বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত সংলাপ ধারালো ও ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। শচীন্দ্রনাথের সৃষ্ট স্ত্রী-চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তারা ইবসেনের বিদ্রোহিনী নারীদের অনুসরণে অঙ্কিত হয়েছে। তাদের সংলাপে মূর্ত হয়ে উঠেছে বিবাহ ভালবাসা দৈহিক সচেতনতা সম্পর্কে স্বাধীন মতামত। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি সংলাপের উল্লেখ করা যায়—

ননদ ঃ······দেখুন বিবাহ হচ্ছে বন্ধন। সে বন্ধনে যারা বাঁধা পড়ে তারা নিজেদের মনুষ্যত্ব বিকাশের বিঘ্ন ঘটায়।

বৃদ্ধ ঃ কিন্তু মা, আমি যে চল্লিশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করলুম।

কখনো ত তা বন্ধন বলে মনে করলুম না।

ননদ ঃ ভারতবর্ষ সাত'শ বছর শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু আজও তার জন্যে এদেশের লোকের বেদনাবোধ নেই। কেন বলতে পারেন?

অথবা দাসত্বের পাশ ছিন্ন করে কামনাময়ী নারী পুরুষদের প্রভুত্বকে দলিত করার রহস্যময় উপায় খুঁজে পায়—

সন্ধ্যা ঃ……আমি জানি আমার ভিতরে যদি আগুন থাকে, তাহলে পুরুষ পোকার মতই তাতে আত্মাহুতি দেবে। আমি তাই ইন্ধন জুগিয়ে জুগিয়ে সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। (ঝড়ের রাতে)

ইংরেজি ও বাংলা মিশ্রিত সংলাপ শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে কখনো কখনো অসাধারণ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে। 'তটিনীর বিচার' নাটকের এমনই একটি মুহূর্ত—

ডাঃ ভোস ঃ No doctor can save me, may lord. আইনকে ফাঁকি দিযে বেড়িয়েছি, কিন্তু মৃত্যুকে আমি ফাঁকি দিতে চাই না। আর সময় নেই। Now gentlemen of the jury, pronounce your verdict. দয়া করে বলুন তটিনী নিরাপরাধ। এখনও শোনবার শক্তি আছে। বলুন, বলুন আপনারা Is she guilty or not guilty?

ব্যর্থ ভালবাসা জনিত হতাশা সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তরের বিচিত্র অনুভূতি রূপ পেয়েছে নাট্যকারের বলিষ্ঠ হাতে রচিত ইংরেজি ও বাংলা মিশ্রিত সংলাপে যা শচীন্দ্রনাথের সমসাময়িক নাট্যকারদের হাতে সম্ভব হয়নি, পরবর্তীকালেও তার তুলনা মেলা ভার। এই ধরনের সংলাপগুলি তৎকালীন শিক্ষিত দর্শক সমাজে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। এর শিল্পমূল্যেও কম নয়। 'দেবদাস' নাটকে বারাঙ্গনা চন্দ্রমুখীর প্রতি ভবঘুরে বসন্তের অব্যক্ত ভালবাসা বিদ্যুৎ চমকের মত পাঠকের হৃদয় ঝলসিয়ে যায়। ত্রিমুখী প্রেমের অবহেলিত নায়ক বসন্ত। চন্দ্রমুখীর ঘরে দেবদাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে অপাংক্তেয় হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে তার অন্তরের বেদনা ফুটে ওঠে নিম্নলিখিত সংলাপে—

বসন্ত ঃ The show is now on, and the show boy should have a clean fadeout আমে দুধে মিশে গেল, আঁটি এখন গড়িয়ে গড়িয়ে চলল আস্তাকুঁড়ে। ('দেবদাস')

দেববাসের অধঃপতনে চন্দ্রমুখী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলে অভিমানাহত বসন্ত চন্দ্রমুখীর দুঃখে ঈর্ষান্বিত হয়েও তাকে কলকাতায় গিয়ে দেবদাসকে

উচ্ছৃংখলতার হাত থেকে রক্ষা করার পরামর্শ দেয়। চন্দ্রমুখী তার মনোমত পরামর্শ পেয়ে বসন্তের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করলে বসন্ত অভিমান-খিন্ন স্বরে বলে ওঠে—

'না—না, চন্দ্রমুখী পরামর্শ আমি দিইনি, কিছুই আমি বলিনি। আমি তো পাষাণ, পাষাণ। A dead stone that knows neither life nor love' (দেবদাস, ৪ অংক)

শচীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা-পরবর্তী নাটকগুলি বিষয় ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে পূর্বের নাটকগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। নাটকের সংলাপেও বিপুল পরিবর্তন আসে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে রচিত অধিকাংশ নাটকেই তিনি বাস্তবসম্মত চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টি করতে পারেন নি। তার কারণ, মঞ্চ ও দর্শক রুচিই ছিল নাট্যরচনার মূল প্রেরণা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে নাটক সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা পরিবর্তিত হয়ে যায়। 'নবান্ন' বাংলা নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। পরিবর্তন ঘটে গেল সংলাপেও। চরিত্র ও সংলাপ যেহেতু পরস্পরের পরিপূরক, চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে নানাভাবের নিপুণ সংলাপের যেমন প্রয়োজন তেমনি চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ না হলে চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টি উভয়ই ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বাধীনতা-পূর্বে শচীন্দ্রনাথের মূলত শহরকেন্দ্রিক সামাজিক নাটকে এই দুয়ের সামঞ্জস্যহীনতা প্রকট হয়েছে। তখনকার গ্রাম-অর্থনীতি বর্তমান দিনের মত ভেঙে পড়েনি—শহর গ্রামগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে শহর সংস্কৃতির উপর গ্রাম-সংস্কৃতির প্রভাব ছিল অসামান্য। সে সময়ের শচীন্দ্রনাথ রচিত নগরকেন্দ্রিক সামাজিক নাটকগুলির 'অত্যাধুনিক' নরনারীর সংলাপ তুলনামূলকভাবে কৃত্রিমই ছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর শচীন্দ্র-নাটকে বাস্তবের স্বাদ পেলাম। সংলাপ চরিত্রানুসারী ও বাস্তবভিত্তিক হল। শিল্পরসে আপ্লুত আদর্শ চলিতভাষা ও আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কয়েকখানি সার্থক নাটক শচীন্দ্রনাথ বাংলারঙ্গমঞ্চকে উপহার দিয়েছেন। মঞ্চসফল না হলেও বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য তাতে কিছুমাত্র কম ছিল না। সবার উপর মানুষ সত্য, এই স্বাধীনতা, জয়নাদ ও আর্তনাদ প্রভৃতি নাটকগুলি শিল্পমূল্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানবতাবোধ সাম্য মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ এইসব নাটকের বিষয়বস্তু।

শচীন্দ্র-নাট্য-সংলাপের শিল্পরস মাধুর্য নিহিত এর মননশীলতায়। সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ 'আদর্শ চলিত ভাষা'য় (Standard colloquial) রচিত সংলাপের উক্ত গুণটি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ আহরণ করেছেন সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক জনপ্রিয় কথাশিল্পী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় রচনাশৈলী থেকে। অবশ্য সংলাপে মননশীল ও শ্লেষাত্মক রচনারীতি অনুসরণে তিনি বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তার মূলে সংলাপের ভূমিকা ছিল অসামান্য, কেবল দর্শকেরা নয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছেও তা ছিল পরম আকর্ষণীয়।

নাটকীয় সংলাপ উত্তম অভিনয়ে সাহায্য করে থাকে। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনেত্রী বন্দনা দেবী রেখা চট্টোপাধ্যায় ও সরযূ দেবী প্রমুখ শচীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১] এছাড়া সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে অনতিদীর্ঘ সংলাপ রচনাতেও গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছেন তিনি। এ ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তাঁকে প্রভাবিত করে। কিছু নাটকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে সংলাপের মধ্যে একটা কৃত্রিম গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। একটা দৃশ্যের শেষ সংলাপ পরবর্তী দৃশ্যের প্রথম সংলাপে প্রতিধ্বনিত হয়েছে নতুন ব্যঞ্জনায়। এই ভাবে সংলাপের টানে নাট্যকাহিনীকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটিতে যে নিরবচ্ছিন্ন গতির সঞ্চার হয় তাতে নাটক হয়ে ওঠে আরো নাটকীয়। দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করার এ এক অভিনব আঙ্গিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শচীন্দ্রনাথের আবেগধর্মী সংলাপ। এই সংলাপগুলিও খুব ছোট ছোট এবং এর ভাষাও খুব তীক্ষ্ন। ছোট ছোট সংলাপ নাটকের গতিকে শতগুণ বর্ধিত করেছে। তাঁর নাটকের এই গতিবেগ চলচ্চিত্রসুলভ নাটকীয়তা সৃষ্টিতেও পারদর্শী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা নাটকে যে সমস্ত মুখ্য পরিবর্তন ঘটেছে শচীন্দ্রনাথের নাটকে তার বহুলাংশই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে একথা নিশ্চিত বলা যেতে পারে।

১. "শচীনবাবুর অন্যতম নাটক 'এই স্বাধীনতা'য় প্রভাবতীর ভূমিকাটি অভিনয় করে আমি আমার মনে পরম আনন্দ ও চরম উৎকর্ষ লাভ করি এবং আমার এই সাফল্য শুধু সম্ভব হয়েছিল শচীনবাবুর অনবদ্য লেখনীপ্রসূত সংলাপ ও তাঁর নিপুণ পরিচালনায়।"—বন্দনা দেবী। (রূপমঞ্চ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৮)।

আট

।। চরিত্রাঙ্কন রীতি ।।

ঘটনা ও কাহিনীতে থাকে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ। ঘটনার নাটকীয় গতিতে জীবনের দ্বন্দ্ব যুক্ত হয়ে চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি হয়। নাটকের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব মোটামুটি মনুষ্যজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্ব অথবা উভয় রূপেই প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র-পূর্ব এবং রবীন্দ্র-সমসাময়িক নাট্যকারগণের অধিকাংশ পেশাদারী মঞ্চনাটকে বহির্দ্বন্দ্ব মুখ্য হওয়ার ফলে অতিনাটকীয়তা অবাস্তবতা ও রোম্যান্টিক ভাবাবেগ প্রধান হয়ে উঠেছে। এই ধরনের নাটকে চরিত্রের দ্বন্দ্ব মূলত বহির্ঘটনামুখী, আত্মজিজ্ঞাসা এবং অন্তরমুখী চেতনার সংগ্রাম প্রায় অনুপস্থিত! আবার রবীন্দ্রনাথের নাটকে বহির্দ্বন্দ্ব গৌণ হওয়ায় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীর হয়েছে, ফলে নাটকের ক্রিয়া ও কাহিনীর গতিবেগ হ্রাস পেয়েছে। তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে চরিত্রধর্মে আত্মিক ও সাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রাধান্যের ফলে সেখানে ঘটনার গতিবেগ মন্থর কখনও অ-নাটকীয়।[১]

নাটকের বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী নাট্য-চরিত্রের দ্বন্দ্বরূপও বিভিন্ন হয়ে থাকে। পৌরাণিক নাটকের আধ্যাত্মিক চরিত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের চরিত্র-দ্বন্দ্বের যেমন কোন মিল নেই তেমনি ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে সামাজিক চরিত্র-দ্বন্দ্বের রূপও ভিন্ন। জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যবহারও সামাজিক নাটকের মত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সম্ভব হয় না।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক যেহেতু অঙ্গাঙ্গ, মনস্তত্ত্বের ব্যবহার তাই সার্থক

১. এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধন ভট্টাচার্যের অভিমত অবশ্যই স্মরণযোগ্য—'ক্রিয়া দীপ্তত্বের (Energy) অভাবে নাটকীয়ত্বের হানি ঘটার আশংকা থাকে বটে কিন্তু হানি ঘটা বা না ঘটা নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত অভিনয় এবং দর্শকের বোধশক্তির ও রসরুচির উপরে একথাও ভুলে গেলে চলবে না।'—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার। পৃঃ ১০৭।

সামাজিক নাটকেরই অংশবিশেষ। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম কারুকার্য কমবেশি স্থান পেয়েছে। তবে সমগ্রভাবে তাঁর নাটকে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ তেমন সার্থক হতে পারেনি সমসাময়িক দর্শকরুচি ও চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে। এই সময়ের মঞ্চসফল সামাজিক নাটকের এটাই ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়কে তখনো প্রভাবিত করতে পারেনি। সাধারণ দর্শকের রুচি ও মনন উন্নত শিল্প ও অভিনয়কলার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। এতদ্‌সত্ত্বেও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ দর্শকের সস্তা রুচির কাছে একেবারে নতিস্বীকার করেননি। তিনি 'আধুনিক' সমাজের শিক্ষিত নরনারীদের কামনা-বাসনা উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোভ হিংসা আদিম মনোবৃত্তি রোম্যান্টিক ভাবাবেগে রঞ্জিত করে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করলেও তাঁর নাটকে মননদীপ্ত সংলাপ, প্রেমের দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত নেই।

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক সামাজিক নাটকের চেয়ে কোন অংশেই কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র চিত্রণেও শচীন্দ্রনাথ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

ইতিহাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় অঙ্কিত হয় বলে তাদের অন্তর্জীবনের পরিচয় ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া সংকুচিত হয়ে যায়, কেননা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সাধারণত তাদের ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে ফেলে দেশ ও জাতির প্রতীক হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক নাটক যেহেতু বর্তমান সমাজের বাস্তবতাকে অনুসরণ করে না, সেই কারণে নারী ও পুরুষের চরিত্রাংকনে নাট্যকার যথেষ্ট স্বাধীনতাও পেয়ে থাকেন। নাটকে নরনারীদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তাদের মুখে যে কোন ভাবের জোরালো সংলাপ ব্যবহার করা যায়। এই সংলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভাষার ওজোগুণ ও হৃদয়মথিত আবেগ যা অনায়াসে দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এই প্রকার চরিত্রে সর্বত্র পরিস্ফুট হয় না। আসলে ঐতিহাসিক নাটক রচনার পেছনে সর্বদা একটা নীতি আদর্শ ও সমসাময়িক জাতীয় ভাবাবেগ থাকায় চরিত্রগুলি অনেক সময় বাস্তবানুসারী হয়ে ওঠেনা। তথাপি দক্ষ নাট্যকারের সৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটকে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান কোথাও কোথাও চোখে পড়ে।

শচীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা মূলত রোম্যান্টিক। তাঁর নাট্যচরিত্রগুলিও প্রধানত রোম্যান্সধর্মী তাতে যুগধর্ম এবং সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন থাকলেও বস্তুত তা নাট্যকারের কল্পনাশক্তির পরিচয়ই বহন করে। অনেক সময় রোম্যান্সের আধিক্যের দরুন এই ধরনের চরিত্র একান্তই অবাস্তব বলে মনে হয়। পুরুষ চরিত্রের তুলনায় শচীন্দ্রনাথের নায়িকারা রোম্যান্টিকধর্মে উজ্জ্বল, তাদের উদ্দাম জীবনাবেগে ব্যর্থতার ম্লান স্পর্শ থাকলেও কালিমার গ্লানিতে পর্যবসিত নয়। তাদের স্পর্ধিত আবেগে জীবনের স্পন্দন স্পষ্ট।

শচীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা বাঁধাধরা ও গতানুগতিক পথে অগ্রসর হয়নি। নাটক নিয়ে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর মত অন্য কোন পেশাদারী মঞ্চের নাট্যকার আর করেননি। তাঁর প্রতিটি নাটক বিষয়বস্তু চরিত্র ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্যে অভিনব। তাঁর নাটকের স্ত্রী পুরুষ চরিত্র কখন রোম্যান্টিক অত্যাধুনিক কখন বা অপরাধপ্রবণ, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণাসুলভ এবং দেশপ্রেমিক—শচীন্দ্র-নাটকের মঞ্চ সাফল্যের পেছনে এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা সক্রিয় ছিল।

নাটকে চরিত্র বিচার প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথের চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য বিশ্লেষণ করে তাঁর নাটকের শিল্পমূল্য নিরূপণ করা যেতে পারে।

রোম্যান্টিক চরিত্র

জীবনের গভীর রহস্যময় অনুভূতির মধ্যেই আত্মমগ্ন রোম্যান্টিক চরিত্রের সার্থকতা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছন্দে তাকে বেঁধে রাখা যায় না। পার্থিব বস্তুর মধ্যেই তার অনবরত রসের সন্ধান। তাই রোম্যান্টিক মন সহস্র দুঃখ ও আসন্ন দুর্যোগের মধ্যেও পাখা মেলে দেয় সুদূর কল্পনার জগতে।

আবুলহাসান নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আবুলহাসান সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক চরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছে। জানা যায়, গোলকোন্ডার শেষ স্বাধীন সুলতান আবুলহাসানের জীবনে সুরা আর নারী ছিল প্রধান উপচার। কিন্তু তার চরম ভোগের মধ্যে ছিল পরম বৈরাগ্য, গভীর আসক্তির মধ্যে অসাধারণ অনাসক্তি একটি বহিরঙ্গ অপরটি তার অন্তর্নিহিত রূপ। হাসানের চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার রহস্যময় মানবচরিত্রের এই বিরল দিকটিকে তুলে ধরেছেন।

সৈয়দ আবুলহাসান সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। সাধারণত ধর্মীয় গোঁড়ামি এঁদের খুবই কম। তার অধ্যাত্মচেতনা তাই কোন কঠোর আচারা-

নুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। রোম্যান্টিক সহজিয়া প্রেমের দৃষ্টিতে সে জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে।

কুতুবশাহী বংশের শেষ কুতুবশাহী সৈয়দ আবুলহাসান সৈয়দ আবদাল্লা কুতুবশাহীর রাজ্যশাসন কালে বহুদিন আগে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়। বয়সে তখন সে নবীন। ফকির সৈয়দ সাহেব তাকে আশ্রয় দেন। এই সময় সৈয়দ সাহেবের শিষ্যা আশ্রমকন্যা মমতাজের সঙ্গে তার গভীর প্রণয় জন্মে। সেও ফকির গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জীবনকে দেখতে পায় নতুন আলোকে। তাই সুলতানের প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হাসানের মনে কোন খেদ নেই। বরং কুতুবশাহীর সহস্র ষড়যন্ত্রপূর্ণ রাজপ্রাসাদের কথা স্মরণ করে ভীত হয়ে ওঠে; মমতাজকে ঘিরে সে এখন স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভবের।

হাসান ঃ···তোমার মুখ অমন ভারি কেন? তুমি ত জান আমি কাজ করতে শিখেছি। তুমি ত দেখচ লোহার শাবলের মত শক্ত আমার এই বাহুতে কতখানি শক্তি রয়েচে। তুমি ত দেখচ আমার হাতে চষা জমি সোনার ফসল দেয়, আমার রোয়া গাছ ফলের ভারে নুইয়ে পড়ে, আমার সেবায় খুসী হয়ে গাভীরা অপর্য্যাপ্ত দুধ দেয়।

(বলিতে বলিতে হাসান হাঁটু গাড়িয়া বসিল, স্থির দৃষ্টিতে
মমতাজের দিকে চাহিয়া রহিল)

আমাদের কিসের অভাব মমতাজ?

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া মঞ্চের পিছন দিক নির্দেশ করিয়া কহিল) ওই পাহাড়ের নিচে আমরা আমাদের সুখের ঘর গড়ব, ওই ঝরনার কলতানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তুমি গান গাইবে—আমি তোমার কোলে মাথা রেখে দিনের শ্রান্তি, জীবনের ক্লান্তি, পৃথিবীর অবিচার, সব ভুলে স্বর্গের সুখ উপভোগ করব। তাজ!

তার রোম্যান্টিক প্রেমের স্বপ্নসৌধ বিলীন হয়ে যায় সৈয়দ সাহেবের নির্দেশে। গুরুর আদেশে গোলকোণ্ডার হিতসাধনে মমতাজকে ত্যাগ করে সুলতান জামাতা হওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে প্রাসাদে চলে যেতে হয়। কর্তব্যকঠিন মমতাজও অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

রোম্যান্টিক হাসান রঙীন কল্পনার জগৎ থেকে কঠোর বাস্তবের জগতে প্রবেশ করল। তার প্রেমিক মন হাঁফিয়ে ওঠে এই ইট কাঠ পাথরের তৈরি

নিষ্প্রাণ প্রাসাদের মধ্যে। সহজিয়া প্রেমে দীক্ষিত সুলতান জামাতা আবুল-হাসান তাই বেরিয়ে পড়ে রাজপথে। আভিজাত্য অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে চায় সে। 'গুরু বলেছেন, প্রাসাদ আর পথ এক করে দিতে হবে'—হাসান তাই নেমে আসে জনতার মধ্যে; সুরায় গানে হাসির বন্যায় সে সকলের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয়। অপরদিকে শূন্য কুতুবশাহীর সিংহাসন অধিকারে তীব্র প্রতিযোগিতা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। সুলতানের মনোনীত উত্তরাধিকারী হাসানের সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

হাসান ঃ গুরুর আদেশ···গোলকোণ্ডার দুঃখ দূর করতে হবে···তাই আমি বলছি···আমি···আমি···আবুলহাসান···আমি আবুলহাসান বলছি···দুঃখ কেউ করো না···কেউ না···মজাদার এই দুনিয়া দেখে···দুলে দুলে ফুলে ফুলে হাস···হাস···মনের আনন্দে সব হাস।

হাসানের রোম্যান্টিক মন কখনো প্রেমের কল্পনাসুখে নিমগ্ন, কখনো বা অধ্যাত্মচেতনায় আচ্ছন্ন। ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তার স্বাধীন দেশপ্রেমিক মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। শিবাজীর আলিঙ্গনলাভ করে বলে ওঠে—'আমি ধন্য মহারাজ।'

কিন্তু নাটকে দেশপ্রেমিক হাসান তত উজ্জ্বল নয়; প্রেমিক হাসানই সেখানে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কুতুবশাহী সুলতানের সিংহাসনে আরোহন করে সে দেখছে সর্বত্র গোপন ষড়যন্ত্রের আভাস। গুরুকে তা জানায়।

হাসান ঃ ···শান্তিময় আশ্রম থেকে টেনে আপনি আমাকে ফেলেছেন এমন একটা জায়গায় যেখানে হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যাচার, মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে; যেখানে কারুর মুখের কথায় বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না; যেখানে হাসির আবরণে লুকানো থাকে দারুণ দুরভিসন্ধি। যেখানে নিঃশ্বাস নিতেও ভয় হয়, পাছে বাতাস থেকে বিষ এসে শরীরে প্রবেশ করে।

মৃত্যু বিশ্বাসঘাতকতা কৃতঘ্নতা এখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে! সে ক্ষুব্ধ বেদনার্ত অসহায়। হাসানের রোম্যান্টিক মন অধ্যাত্মচেতনার মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। তার কাছে সম্রাট একজনই; তিনি সৌর-বিশ্বের নিয়ন্তা, রক্তমাংসের মৃত্যুশীল কোন মানুষ নন। কিন্তু পার্থিব অহংকারে নিমজ্জিত সম্রাট ঔরংগজেবের কাছে তা বাতুলের প্রলাপ বলে মনে হয়।

ঔরঙ্গজেব : তুমি তোমার সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়েছ। সেকথা দেখছি কেউ তোমাকে বলে দেয়নি।

হাসান : আমার সম্রাট!

ঔরঙ্গজেব : হ্যাঁ, তোমার সম্রাট।

হাসান : আমার সম্রাট পার্থিব সিংহাসনে বসেন না।

ঔরঙ্গজেব : তোমার সম্রাট কোথায় বসেন?

হাসান : যখন যেখানে তাঁর ইচ্ছে হয়; আকাশের মেঘ থেকে সাগরের তরঙ্গ; পাহাড়ের চূড়া থেকে পথের ধুলো—সর্বত্রই তাঁর আসন বিছানো রয়েচে। আপনি যদি সম্রাট, পারেন সেইসব আসনে বসে রাজ্য পালন করতে? যদি পারতেন, তা'হলে আমার সম্রাট বলে আপনাকে অভিবাদন করতে পারতুম। আপনি এঁদের সম্রাট—আমার নন!

হাসানের আধ্যাত্মিকতায় ভোগের মধ্যে বৈরাগ্যের সুর; সুফী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হাসানের অন্তরে 'বিশ্বস্রষ্টা' আনন্দ-স্বরূপে অধিষ্ঠিত। নারী সুরা সৌন্দর্য প্রেম তার কাছে 'তাঁর'ই শাশ্বত বাণী বহন করে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছে বন্দী হাসান তাই নির্ভয়ে বলে ওঠে—

আঙুর বধূর অধর-সুধা আপন হাতে গড়ল বিধি
রসাললতা-তন্তুকে ফাঁদ বলবে রে কোন মন্দ হৃদি
নয় কি সে তার স্বাদু আশিস? আঙুর কি তার অভিশাপই,
তাই যদি হয়; এই অভিশাপ তাঁরই দেওয়া আমূল নিধি।

কঠোর ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন সংকীর্ণ চিত্ত ঔরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে রোম্যান্টিক ভাবুক হাসানের বিধর্মীসুলভ ভাবনায়। কিন্তু পৃথিবীকে আশ্রয় করে হাসানের প্রেম-কল্পনার জন্ম হলেও তার পরিণতি ঘটেছে সীমাহীন অপার্থিব প্রেম-চেতনার মধ্যে। সুরা ও নারীবিলাসী হাসান সম্রাটের দন্ডাদেশের সামনে দাঁড়িয়ে তাই নির্ভীক; যেকোন শাস্তিই সে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কেননা এর মধ্যেই সে অনুভব করে 'করুণাময়ে'র অসীম অনুগ্রহ; তমোবুদ্ধিনাশকারী তাঁরই কোন অদৃশ্য ইঙ্গিত।

ঔরঙ্গজেব : তুমি ত্যাগী সন্দেহ নাই, তুমি নির্ভীক তাও দেখতে পাচ্ছি, তবু কেন তোমার এই পাপবুদ্ধি?

হাসান : এও যে তাঁরই দেওয়া। হয়ত এই বুদ্ধি নাশ করবার জন্যই তিনি

আমাকে আপনার হাতে সঁপে দিলেন। কি যে তিনি করেন—কেন করেন, তা কেউ বলতে পারেনা…

হাসান চরিত্র অংকনে নাট্যকারের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে হাসান চরিত্রে 'গৈরিকপতাকা'র শিবাজীর প্রভাব আছে বলে মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে শিবাজী থেকে হাসান সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের। দুইজনই গুরুর আদেশে সিংহাসনে বসেছে রাজ্যের মংগলের জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য; কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও আধ্যাত্মিক-স্বরূপে উভয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একজন ন্যায় নীতি ও কঠোর জীবনযাপনের কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন, অন্যজন নারী ও সুরার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করেছে। রাজনীতি ও রণনীতিতে সুতীক্ষ্ন একজন ভারতবর্ষের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন নৃপতিরূপে চিহ্নিত, অপরজন তার একেবারে বিপরীত। একজনের ঈশ্বরচেতনা ত্যাগ ও সংযমের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর একজনের ঈশ্বর বিশ্বজনীন সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজিত। সামাজিক বন্ধন ও সংস্কারকে তাই সে উপেক্ষা করে অনায়াসে। সুখ আর দুঃখের মধ্যে কোন পার্থক্য তার কাছে নেই বলেই চরম ভোগের মধ্যে সে যেমন ঈশ্বরকে অনুভব করে তেমনি চরমতম দুঃখের মধ্যেও অনুরূপ অনুভূতি সক্রিয়।

ঝড়ের রাতে নাটকের 'বিজলী' সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক নারী-চরিত্র। বিজলী নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ও গবেষক প্রশান্ত চৌধুরীর সুন্দরী তরুণী স্ত্রী। তার স্বাধীন মতামত ও আচরণের মধ্যে অবাধ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। সে জীবনকে মুক্ত-বিহঙ্গের মত উপভোগ করতে চায় এবং গতির আনন্দে যৌবনের আবেগ প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু স্বামীটি একেবারেই তার বিপরীত প্রকৃতির। মড়ার খুলি আর কংকালের মধ্যে দিবারাত্র নতুন নতুন সূত্র সন্ধান করে, বহির্জগতের রঙ-রূপ-রস-গন্ধ তাকে স্পর্শ করে না।

বিজলী আর প্রশান্তের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে যে বিরোধের কাজ করছে তা'হল প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের বিরোধ। জীবনকে দেখে একজন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে; জ্ঞানার্জনের স্পৃহা তাকে সংসারের সাময়িক সুখভোগ থেকে দূরে সরিয়ে

রেখেছে। অন্যজনের কাছে উত্তেজনাই জীবনের প্রেরণা। বিজলীর প্রতি প্রশান্তর ভালবাসায় উত্তেজনার একান্ত অভাব থাকায় তার রোম্যান্টিক হৃদয় তৃপ্ত নয়। এইভাবে স্বামী ও স্ত্রীর মনের ব্যবধান ক্রমশ দুস্তর হয়ে যায়, বিজলীর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া জটিলপথ অবলম্বন করে।

নীরব জ্ঞানতপস্বী প্রশান্তের জীবনে যেমন কোন তরঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনা তেমনি স্ত্রীর কাছে স্বামীর উষ্ণ-সান্নিধ্য দানেও সে ব্যর্থ। বিজলী তার সন্তানহীনা নারী-জীবনে ব্যর্থতার জন্য প্রশান্তকে দায়ী করে। বিবাহ-বার্ষিকীর উৎসব-সন্ধ্যায় পলাতক খুনী আসামীকে নিয়ে যখন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে সেসময় নিঃসঙ্গ বিজলীর মনে প্রতিক্রিয়ার দৃশ্যটি বড় সুন্দর।

বিজলী ঃ সত্যিকারের খুনে ডাকাতের মুখ থেকে সত্যিকারের কাহিনী শোনায় আমাদের যা লাভ হবে, তার তো একটা দাম দিতে হবে? আমরা তারই মূল্য স্বরূপ তাকে দোব মুক্তি।……তারপর আমরা যখন বুড়ো হয়ে যাবো, আমাদের ছেলেমেয়ে…না না—

সন্ধ্যা ঃ না, না, কেন বউদি

বিজলী ঃ তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও যখন ছেলে হবে, তখন তাদের কোলে নিয়ে আসল খুনে ডাকাতের এই গল্পটা যখন করব, তখন আশ্চর্য হয়ে তারা আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে।

বিজলীর প্রথম সংলাপের শেষভাগে তার নিঃসন্তান নারী-জীবনের যে হতাশা ফুটে উঠেছে, দ্বিতীয় সংলাপ তাতে করুণরসের সঞ্চার করেছে। সেইসঙ্গে তার দুরন্ত জীবনাবেগের পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রয়োগে সংলাপের অন্তর্নিহিত ভাববস্তু বিজলীর চরিত্রপ্রকৃতি ও দ্বন্দ্বের ছবিটিকে স্পষ্ট করেছে।

কাহিনীর দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজলীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘটনাচক্রে পুলিশের তাড়া খেয়ে যে লোকটি উৎসবমুখর গৃহে ঢুকে পড়ল, সে বিজলীর পূর্বপ্রেমিক এবং প্রশান্তর কলেজ জীবনের বন্ধু এবং ঐদিন নিমন্ত্রিতও বটে। বিজলীর অন্তর্দ্বন্দ্বও চরমে উপনীত হল। বর্তমান জীবনের অতৃপ্তির মধ্যে অতীতের বন্ধনহীন জীবনের স্মৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে প্রভঞ্জনের আবির্ভাবে। কিন্তু সংস্কার থেকে বিজলীও মুক্ত হতে পারে না। প্রভঞ্জনকে দেখে অতীত জীবনকে ফিরে পাওয়ার বদলে সে প্রশান্তকেই বেশি করে

জড়িয়ে ধরতে চাইল। তবু অবচেতন মনের রুদ্ধ আবেগকে বাধা দেবে কেমন করে! গভীর রাতে প্রশান্তর নৃতত্ত্ব গবেষণায় মগ্ন থাকার সুযোগে সে প্রভঞ্জনের মুখোমুখি হয়। অতীতের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তারা উভয় উভয়কে ফিরে পেতে চাইল। এমনি সময় ওদের অগোচরে প্রশান্ত দুজনের মগ্নতা লক্ষ্য করে বুঝল তার সরল বিশ্বাসের তলায় শক্ত ভিত নেই। প্রথম উত্তেজনায় বন্দুক বের করে পরক্ষণেই সে এক গভীর বিষাদে ক্লান্ত হয়ে চলে যায়।

বিজলীর অভিমান আহত হয়। প্রশান্তর ঔদাসীন্য দেখে সে আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নাট্যকার অসাধারণ নৈপুণ্যে তার স্বন্দ্বকে মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগে সার্থক করে তুলেছেন। বিজলী অসুখী, নিরুত্তাপ প্রশান্তের মধ্যে সে তাপ সঞ্চারে অক্ষম। নৃতত্ত্বের অনড় প্রাচীর পেরিয়ে তার নাগাল পাওয়াও কঠিন। সেই সময় প্রভঞ্জন পুরনো দিনগুলোকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে বিজলী দুই পথের মাঝখানে পা রেখে বিভ্রান্ত হয়ে দেখল—একদিকে জীবন-অনভিজ্ঞ অসহায় শিশুর মত স্থির প্রশান্ত, অপর দিকে দাঁড়িয়ে বীরের বেশে বেহিসেবী জীবনের দূত প্রভঞ্জন। নারীর হৃদয়রহস্য ঘনীভূত হয়। সে প্রশান্তর কাপুরুষতা নির্বীজ অপদার্থতাকে বাক্যের কষাঘাতে জর্জরিত করে তোলে। প্রশান্ত সব অপরাধ নত মস্তকে স্বীকার করে। এতদিন স্ত্রীর প্রতি অবহেলা উপলব্ধি করে সে দুঃখে ভেঙে পড়ে—নিদারুণ আঘাত সহ্য করেও তার নতুন জীবনে সে শুভ কামনা জানায়।

বিজলীর সহিষ্ণুতা এবার সীমা অতিক্রম করে। কিন্তু দুর্যোগঘন রাত্রিতে প্রভঞ্জনের হাত ধরে বেরিয়ে যেতে গিয়েও স্তব্ধ হয়। 'স্বামীর ভিটে' ত্যাগ করে সে আর পথে নামতে পারেনা।

অবশেষে 'ঝড়ের রাতে'র অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দুর্জয় অভিমান ঠেলে ফেলে বিজলী প্রশান্তর বক্ষলগ্না হয়; কামনাময়ী নারীর মত বলে ওঠে—'আমায় বেঁধে রাখ, জুলুম কর, পীড়ন কর। তাতে আমার ভালই হবে।'

বাংলা সামাজিক নাটকে ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্বের ছোঁয়া সর্বপ্রথম বিজলী চরিত্রে পাওয়া যায়।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের 'আলেয়া' আর একটি রোম্যান্টিক চরিত্র। চরিত্রটি

সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—একই বিষয় নিয়ে দুই যুগের দু'জন নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। একজন সুপ্ত ইতিহাস থেকে সিরাজদ্দৌলাকে উদ্ধার করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন অপর নাট্যকার ঐ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ণ সিরাজ-চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলা-চরিত্র রূপায়ণের উদ্দেশ্যে করিমচাচাকে হাজির করেছিলেন। শচীন্দ্রনাথ তাকে আরো সুন্দরভাবে চিত্রিত করার জন্য গোলামহোসেন ও পাশাপাশি আলেয়া চরিত্র অঙ্কন করলেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা অপেক্ষা শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা তুলনামূলকভাবে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার কারণই হল করিমচাচা কেবল সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের শাসক ও রাজনীতিক রূপ তুলে ধরতে সাহায্য করেছে, কিন্তু ব্যক্তি-সিরাজের বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বোপরি তার চারিত্রিক দুর্বলতা ও কবিত্ব তাতে ফুটে ওঠেনি। শচীন্দ্রনাথ-এই অপূর্ণতাকে অপসারণ করেছেন আলেয়া চরিত্র অঙ্কন করে। প্রেমিক-সিরাজদ্দৌলাকে ফুটিয়ে তুলতে আলেয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন নাটকে অস্বীকার করা যায় না।

আলেয়া স্বদেশপ্রেমের আবেগদীপ্ত শিখা। একদা পর্তুগীজরা তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অপবাদে সমাজ-সংসার পরিত্যক্তা এই নারী স্বদেশব্রতে দীক্ষা নিয়েছিল। দেশের সর্বত্র যেখানেই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আয়োজন চলছে সেখানে সে মোহিনী নারীরূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। কৌশলে শত্রুর পরিকল্পনা জেনে নিয়ে সে ছুটে গেছে প্রতিপক্ষের কাছে, যেখানে দেশপ্রেমিক এক নবাব সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাত থেকে দেশ রক্ষার জন্য সর্বস্বপণ করে লড়াই করছে।

চারিদিকে বৈরী আত্মীয়, মিত্রের ছদ্মবেশে দেশীয় শত্রুর ষড়যন্ত্র, তারমধ্যে গুটিকয়েক বিশ্বস্ত সৈনিক নিয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা একান্ত অসহায়ের মতন ছটফট করছেন। এই চরম সংকটের দিনে সিরাজদ্দৌলা পরম বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সংগীরূপে পেয়েছেন গোলামহোসেনকে। সে কেবল সংগ দেয়নি কিছু কিছু কঠিন প্রশ্নের সমাধানও নির্দেশ করেছে। কিন্তু এই সময় তার দেশপ্রেমের আবেগকে তীব্র করতে যে নারী ধূমকেতুর মত তার জীবনে আবির্ভূত হয়েছে সে আলেয়া। নিয়ত অনুপ্রেরণাদায়িনীর মত সিরাজের দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করে রেখেছে সে।

সিরাজের কাছে সে যেমন একদিকে মানসপ্রতিমা অপরদিকে কর্তব্যের প্রতি সদাজাগ্রত প্রহরিণী। পলাশীর যুদ্ধশিবিরে সে অনায়াসে নবাবকে সতর্ক করে দেয়—'যুদ্ধ করবার ভার অপরের উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি যদি এই শিবিরে কেবল আমার সঙ্গেই কথা বলেন, তা হলে মরণ ছাড়া আর গতি কি আছে।'

পলাশীর যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় উপলব্ধি করে সেই মুহূর্তে অসহায় নবাবকে শেষবারের মত যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেয়—'জাঁহাপনা আপনার যুদ্ধ আপনাকেই জয় করতে হবে। আর কারুর উপর নির্ভর করলে চলবে না।'

নাটকে নারী-রূপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সিরাজের অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি স্বীকার করেছেন আলেয়াকে দেখার আগে নারী ছিল তাঁর জীবনের ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও হারেমে অবসর বিনোদনের সামগ্রী। নারীর প্রদীপ্ত ও প্রেরণাদায়িনী রূপ তাঁর অজ্ঞাত ছিল, আলেয়া জীবনে এল সেই মানসপ্রতিমারূপে। তাই সিরাজের একান্ত আপসোস '......আমার শুধু এই ক্ষোভ যে, কটা বছর আগে কেন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো না। তা যদি হতো, তা হলে নারীকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারতাম।'

আলেয়া চরিত্রে নাট্যকার কোন দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে তোলেননি, তথাপি কিছু কিছু জায়গায় একটু ইঙ্গিত রয়ে গেছে। বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট অসহায় নবাবের প্রতি অনুরাগ ক্রমশ ভালবাসায় পরিণত হতে চলেছে। এ দুর্বলতার কথা আলেয়ার বোধকরি অজানা ছিল না।

দেশের সংকটময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শেষ চরম বিপদের দিনে সে সিরাজদ্দৌলার জীবনে এসেছে প্রার্থিত নারীর রূপ নিয়ে—যে প্রকৃতপক্ষে দুঃখের দিনের সাথী। আলেয়ার স্বদেশপ্রেম ও বিচক্ষণতায় সিরাজ মুগ্ধ, তার নারীরূপের স্নিগ্ধতায় নবাব দেখেছেন পরম শান্তির আশ্রয়। দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষভাগে নবাব সিরাজদ্দৌলা আলেয়ার কাছে কার্যত আত্ম-দুর্বলতাকে প্রকাশ করে ফেললেন—'আলেয়া! জীবনে বহু নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখিনি।'

আলেয়ার সংযম ভেঙে যায়। আকস্মিক ধরা পড়ার সম্ভাবনায় সে বলে ওঠে—'বড্ড কষ্ট হচ্ছে জাঁহাপনা, আমাকে একটু কালের জন্য অবসর দিন। আমি

নিজেকে সুস্থ করে আসি।'

ঠিক পরমুহূর্তে আলেয়া নিজেকে সামলে পুনরায় ফিরে এসে নবাবের একান্ত অনুরোধে যে গানটি গেয়ে শোনায়, প্রতি ছত্রে তার বঞ্চিত জীবনের হাহাকার ফুটে ওঠে—'পথহারা পাখী কেঁদে ফিরি একা। আমার জীবনে শুধু আঁধারের লেখা……'।

আলেয়া কেবল নবাবের হৃদয়েই দোলা জাগায়নি, গোলামহোসেনরূপী পুরন্দরের প্রচ্ছন্ন ভালবাসাকেও সে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু সমাজ-পরিত্যক্তা আলেয়া, শত্রুদের কাছে যে কেবল নর্তকীমাত্র, তার জীবনতরী কোন ঘাটেই বাঁধা পড়েনা। নবাব সিরাজদ্দৌলা অথবা নফর গোলামহোসেন—দু'জনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও ভালোবাসার অর্ঘ্য রচনা করেও সে থেকে যায় অলক্ষ্যে, উভয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সুপ্রিয়ার কীর্তি নাটকের 'শ্যামা' আর একটি বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক চরিত্র। শ্যামা শিশুকাল থেকে পিতার স্নেহচ্ছায়ায় পালিত, সে জানে তার মা মৃত। কিন্তু কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে সে জানতে পারে তার মা জীবিত, পিতার ব্যভিচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামী-কন্যার সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী জীবন অবলম্বন করেছে।

নাটকে শ্যামা চরিত্রটির গুরুত্ব কেবল নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য। কাহিনীর বৃত্তগঠনে চরিত্রটির অবদান প্রত্যক্ষ হলেও সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু নীলাম্বর ও কল্যাণীর অতীত দাম্পত্য জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি। নাটকে উল্লিখিত না হলেও শ্যামাকে সুশিক্ষিতা ধরে নেওয়া যায়। পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা উন্নত পরিবেশ তাকে আধুনিক মননশীলা করে তুলেছে। শ্যামার প্রণয়ী অনুপম। উভয়ে পরস্পর আকৃষ্ট। উভয়েরই স্বপ্নিল চোখ কল্পনার আবেশে বিভোর। কিন্তু শ্যামার কল্পনা মুক্ত প্রকৃতির রাজ্যে পাখা মেলে দেয়। অনুপমের প্রতি তার গভীর অনুরাগ, কিন্তু বিবাহের নিগড়ে ধরা দিতে রাজী নয়। অনুপম যখন বলে—'বিয়ে ভালবাসাকে গাঢ় করে, শ্যামা তার যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে বলে ওঠে—'মিথ্যে কথা—গিন্নীর কাজের ভার চাপিয়ে ভালবাসাকে নষ্ট করে ফেলে। তোমার চাই একটি গিন্নী, যাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে বলতে পার, মা, তোমার দাসী এনেচি। খুঁজে পেতে তাই একটা জোগাড় করে নাও।'…

শ্যামা গ্রাম্য তরুণী কিন্তু আচার-আচরণে বাক্যালাপে সে রোম্যান্টিক, আধুনিকা। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ আধুনিক চরিত্র রূপায়ণে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ঔচিত্যবোধের বিশেষ পরিচয় দেননি। কখনো কখনো অল্পশিক্ষিতা গ্রাম্য তরুণীর মুখেও অত্যন্ত মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ বসিয়েছেন অনায়াসে।

গ্রামের পটভূমিকায় শ্যামাকে মনে হয় সহরের কোন আলোকপ্রাপ্তা তরুণী, কিন্তু সুপ্রিয়া যখন শ্যামাকে সহরে নিয়ে এল সেখানে সে গ্রাম্য তরুণীর মতই অনভিজ্ঞা সরল, তার আচরণ ও বাক্যালাপে গ্রাম্য প্রগল্‌ভতা ফুটে ওঠে। তার কল্পনা প্রকৃতির রাজ্য ছেড়ে বায়স্কোপের হিরোকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত হয়। অনুপমকে ভালবেসেও সে তাকে অস্বীকার করে, কেননা বায়স্কোপের পর্দায় হিরোদের বন্ধনহীন জীবনের স্বাদ তাকে হাতছানি দেয়—'দেখতে পাওনা পুকুর পাড়ে (বায়স্কোপের হিরো) দাঁড়িয়ে থাকে, জল আনতে গেলেই হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়, বাপ-মাকে কলা দেখিয়ে মোটরে তুলে দেয় ছুট্—কানে কানে কত কথা, কত গান, চোখে ঠোঁটে কত হাসি।'

শেষপর্যন্ত, সুপ্রিয়ার চক্রান্তে শ্যামার রোম্যান্টিক স্বপ্ন অদৃশ্য হয়। বায়স্কোপের ভিলেনের ছদ্মবেশে মেয়ে চালানকারীর ফাঁদে পড়ে সে বাস্তবকে চিনতে শেখে। অনুপমকে বিয়ে করতে সে আর গররাজী হয় না। চরিত্রটিতে কোন দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায় না। নিছক কাহিনীর নাটকীয় গতি সৃষ্টির প্রয়োজনে চরিত্রটি আঁকা হয়েছে।

অত্যাধুনিক চরিত্র

শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সামাজিক নাটকই নগরকেন্দ্রিক। আধুনিক নগর-সভ্যতার সবচেয়ে উচ্চশ্রেণীর নরনারীকে নিয়ে এর কাহিনী। তাঁর প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রীদের সংলাপ ও আচার-আচরণে বহিরঙ্গের যে হাল্কা চাপল্য আমরা লক্ষ্য করি তাতে আমাদের কাছে নাটকের চরিত্র কাহিনী তথা সমগ্র পটভূমিকাই কৃত্রিম বলে মনে হয়।

তবে একথা সত্য যে, বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যা 'কৃত্রিম' বলে মনে হয়, সে যুগে এটাই হয়ত বাস্তব সত্য; এই 'কৃত্রিমতা'ই সে সময়ের তথাকথিত সোফিস্টিকেটেড নাগরিক জীবনযাত্রার বাস্তব দলিল। কেবল নাটকে নয়, সে সময়ের চলচ্চিত্রে ও সাহিত্যে এই কৃত্রিমতা ফুটে উঠেছে যা পাশ্চাত্য অনু-

করণেরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে সমাজ-অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার ক্রমবিস্তারের ফলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই নারীরা সামাজিক সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন করে বহির্জগতের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো। এক অভ্যস্ত জগত থেকে আর এক অনভ্যস্ত জগতের মাঝখানে এসে পড়ায় আচার-আচরণ কথাবার্তায় যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয় সে সময়ে 'আধুনিক' নব্যশিক্ষিতা নারীদের ক্ষেত্রে ছিল তাই। সর্বোপরি সেকালের নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতাই হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উগ্র অনুকরণের ইচ্ছা থেকে। শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রীরা বিশেষত স্ত্রী চরিত্রগুলি এবং সমগ্র নাটকের নাগরিক সমাজের পটভূমিকাটি এই কারণেই কৃত্রিম বলে মনে হয়। তবে এক যুগের মানুষের কাছে যা কৃত্রিম সমকালীন মানুষের কাছে তা একান্তই স্বাভাবিক।

শচীন্দ্রনাথের নাটকে পুরুষ চরিত্রগুলির তুলনায় স্ত্রী চরিত্র কৃত্রিম বলে মনে হলেও নাট্যকাহিনীতে রয়েছে নারীদের প্রাধান্য। নারী এখানে বিদ্রোহিনী, প্রচলিত বাঁধাধরা পথে সে চলে না। নতুন যুগের স্ত্রীরা পুরনো দিনের মত একান্নবর্তী পরিবারের স্বামীদের রাতের সঙ্গিনীরূপেই শুধু সন্তুষ্ট নয়, তারা প্রতিদিনের বহুমুখী জীবনের শরিক হতে চায়। বাঙালী নারীর প্রাচীন রূপ শচীন্দ্রনাথের কোনো নায়িকা চরিত্রে নেই, আমাদের অভ্যস্ত ধারণায় তাই শচীন্দ্র-নাথের নায়িকাদের কৃত্রিম বলে মনে হয়।

শচীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অত্যাধুনিক অধিকাংশ নারী ও পুরুষ চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তেমন স্পষ্ট নয়। নাট্য-ঘটনার বহির্দ্বন্দ্বও মূলত অত্যাধুনিক জীবনযাত্রাসম্ভূত। তটিনীর বিচার, সুপ্রিয়ার কীর্তি, নার্সিংহোম প্রভৃতি নাটকের পাত্রপাত্রী বিদেশী যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের ভাবছায়া মাত্র। শচীন্দ্রনাথ প্রচুর ইংরেজী গল্প উপন্যাস পড়তেন। তাঁর পক্ষে ঐ সমস্ত নায়িকাদের মডেল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল না। তবে এইসব অত্যাধুনিক নারীরা বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে এতই অপরিচিতা ও সহজাত সংস্কার বিরোধী যে খুব সহজেই শচীন্দ্রনাথের নাটকে এদের বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

তটিনীর বিচার নাটকে তটিনী ও বসন্ত অত্যাধুনিক যুবক যুবতী। উভয়েই কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং যেহেতু তারা দু'জনেই তাদের বিধবা মায়ের

বিপুল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী সুতরাং তাদের ভোগ-বিলাস এবং যথেচ্ছাচারিতার শেষ নেই। তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিবাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু অচিরেই তাদের জীবনের স্বপ্নামিনার ভেঙে পড়ে যখন তটিনী জানল, সে অনাথা। অসহায় অবস্থায় মায়ের মৃত্যু, এবং পিতার ফেরারী আসামী হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার কথা শুনে তার নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাল। বসন্তকে তার পিতৃপরিচয় এবং অনাথা জীবনের কাহিনী জানাতে পারল না। অপরদিকে বসন্তের জীবনেও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

বসন্ত ব্রাহ্মণ এবং তটিনী যেহেতু কায়স্থ কন্যা সুতরাং এ বিয়ে অসম্ভব। বসন্তর প্রয়াত পিতা সম্পত্তির উইলে বর্ণাশ্রম মেনে বিয়ের শর্ত আরোপ করে গেছে, নইলে সম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত হবে। বসন্ত সম্পত্তির তোয়াক্কা না করেই তটিনীকে বিয়ে করতে চাইল. কিন্তু পারিবারিক লজ্জার ইতিহাস গোপন করে তটিনী এ বিয়েতে সম্মতি জানাতে পারল না। অতঃপর দুজনের দুই ভিন্নমুখী পথ অবলম্বন। বসন্ত বিয়ে করল তার পূর্ব প্রেমিকা ললিতাকে কিন্তু সুখী হতে পারল না। তটিনীর প্রতি ললিতার ঈর্ষা প্রশমিত না হয়ে দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে। ফলে, চরম অশান্তি এবং বসন্তের মাত্রাধিক্য মদ্যপান। বসন্ত তটিনীকে ভুলতে পারেনা। তটিনীকে নিয়ে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল তার ব্যর্থতার জ্বালায় সে প্রতিমুহূর্ত জ্বলতে থাকে।

অপরদিকে তটিনী প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা নিয়েছে। 'অত্যাধুনিকা' উচ্ছৃঙ্খল তরুণী পরিবর্তিত হয়ে যায় আদর্শ-নারীতে। তার আচার-আচরণে চিন্তায় মননে প্রগতিশীল ইঙ্গিত ফুটে ওঠে—'দুদিনের হাসি, গান, উৎসব, আমোদ ত নারীর সারা জীবনকে সার্থকতায় ভরে দিতে পারবে না। আর তা পারবে না বলেই আমি মেয়েদের জীবনে বাস্তবতার পরশ এনে দিতে চাই। যে শিক্ষা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াবে না, মনে এনে দেবে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ, সেই শিক্ষার প্রচার আমি করতে চাই!'

এর আগে আধুনিকা বলতে সে বুঝত উগ্র সাজসজ্জা, রেস্তোঁরা বারে নতুন নতুন যুবক সঙ্গী নিয়ে উদ্দাম স্ফূর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে তার প্রাতিদিনের সুর ছন্দ তথা জীবন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। আধুনিকতার সংজ্ঞা সে নতুন করে উপলব্ধি করে—'আপনারা এতদিন পরগাছার রূপ দেখে মুগ্ধ হতেন। মাটিতে

আমার শিকড় ছিল না বলে আমি হাওয়ায় দোল খেতুম। কিন্তু একদিন আপনাদের সকলের অজানায় আমাকে ঘিরেও ঝড় উঠল। সে ঝড়ে আমি মাটিতে পড়ে গেলুম, বাস্তবের পরশ পেলুম। এইবার হয়ত সত্যিকারের মডার্ন হতে পারব।'

বসন্ত একজন 'আধুনিক' শিক্ষিত যুবক। পাশ্চাত্যের কৃত্রিম জীবনযাত্রার সুদূরপ্রসারী ফল আধুনিক যুবমানসে কিভাবে সংক্রামিত হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বসন্ত চরিত্র। বসন্ত মদ্যপান করে এবং নিত্যনতুন সঙ্গিনী নির্বাচন করে উদ্দাম জীবনযাপন করে। তটিনী ও বসন্তের জীবনযাত্রা প্রথম দিকে একই খাতে প্রবাহিত ছিল। ঘটনাক্রমে তটিনীর নতুন জীবনোপলব্ধি হয়। স্বপ্নভঙ্গের আঘাত তার অন্তরতম প্রদেশে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, তারফলে চলার পথটাই গেল পাল্টে, নবতম আদর্শে সে উদ্বুদ্ধ হল। কিন্তু বসন্তের জীবনে যে আঘাত এল তাতে তার হতাশাই বড় হয়ে উঠল। মদ্যপানের মাত্রা গেল বেড়ে। বিয়ের আগে তটিনীর সঙ্গে মেলামেশার সময় সে ললিতার আবেগকে এইবলে নিরস্ত করেছিল—'তুমি আর আমি বিরোধী প্রকৃতির লোক। তুমি শান্ত আমি চঞ্চল, তুমি বিশেষ একটা নীতি মেনে চলতে অভ্যস্ত, আমি কোন নীতিকেই বরদাস্ত করতে পারি না, তুমি ধর্ম মান, আমি তা মানিনা। কাজেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হলে তুমি বা আমি কেউ সুখী হতুম না।' বসন্ত চরিত্রের এই হল প্রকৃতি, কিন্তু বিয়ের অব্যবহিত মুহূর্তে ভালবাসা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল নরনারীর মিলনে, সেইজন্য তটিনীর পরিবর্তে ললিতাকে পেয়ে তার জীবন ব্যর্থ মনে হয়নি। সে ললিতাকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে—'……তটিনীর বদলে তুমি আমার জীবনে এলে, জীবন যে আমার ব্যর্থ হবে একথা মনে করবার কোন কারণ নাই। আসল কথা হচ্ছে man and woman, নর আর নারী।' কিন্তু খুব শীঘ্রই তার ভুল ভেঙে যায়। নরনারীর মনের মিলটাও যে বড় দরকারী সে কথা বসন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করল।

বসন্ত চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে। সে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ কেবল মদ্যপানে এবং ললিতাকে নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ করায় নয়। ললিতা যখন তার নতুন সৌভাগ্যের প্রতি তটিনীকে ঈর্ষান্বিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিয়ের পর তারই উদ্যোগে বাগানবাড়িতে আয়োজিত জমকালো পার্টিতে তটিনীকে নিমন্ত্রণ করল,

সেসময় তাকে পেয়ে বসন্ত অতীতের আবেগ ফিরে পায়। তটিনীর অভাব সে নতুন করে উপলব্ধি করে। কিন্তু 'অত্যাধুনিক' হলেও প্রচলিত সমাজ সংস্কারের ঊর্ধ্বে সে যেতে পারেনি। বিবাহিত বসন্ত পূর্বের মত তটিনীর সংগে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। তার মানসিক দ্বন্দ্ব তাই চরমে উপনীত হয়।

বসন্ত ঃ আমার মনে হচ্ছে তটিনী একটা কাঁচের দেয়াল যেন তোমাকে আমাকে পৃথক করে রেখেছে। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার অনুরাগের স্পর্শ পাচ্ছিনা।

তটিনী ঃ Hold it (তটিনী হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত হাত চাপিয়া ধরিল তারপর ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিল)

বসন্ত ঃ It is all over now! All over! সবশেষ!

ভ্রষ্টানারী চরিত্র

'পুরুষের বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছ নারীর বেলা'—রক্ত কমল নাটকের আলোচনা প্রসংগে স্বয়ং নাট্যকার উক্ত প্রবচনটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা' গ্রন্থে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ছিল পরিবারের কর্ত্রী। মায়ের পরিচয়ে ছিল সন্তানের পরিচয়। সভ্যতা বিকাশের সংগে সংগে নারী পুরুষের শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে এবং স্বাধীনতা হারিয়ে সে পুরুষের বিলাস-সামগ্রীতে পরিণত হয়। নানা সংস্কার ও সামাজিক অনুশাসন আরোপ করে নারীর কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও পুরুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন নিয়মনীতি প্রযোজ্য ছিল না। পুরুষ ব্যাভিচারী হলে তার ক্ষমা আছে, সমাজ তাকে ত্যাগ করবেনা কিন্তু নারীর সাময়িক পদস্খলনকে সমাজ নির্মম শাস্তি বিধান করেছে।

বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রষ্টা নারী চরিত্র এঁকেছিলেন কিন্তু শিল্পীর নিরপেক্ষতা ও সমবেদনা তাতে ছিল না। শরৎচন্দ্রের কলমেই এই শ্রেণীর নারীদের সপক্ষে বলিষ্ঠ সমর্থন মিলল। এতদিন যারা ছিল অবহেলিত, সভ্য লোকালয় থেকে বহুদূরে চির-নির্বাসিত, শরৎচন্দ্র তাদের সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এনে হাজির করে দেখালেন এদের মধ্যে মানবিক স্নেহ করুণা ভালবাসা যেকোন

সামাজিক নারীর মতই বর্তমান, কোথাও কোথাও তাদের আত্মত্যাগ মহার্ঘ নিঃস্বার্থ প্রেম শ্লাঘার বিষয়। সম্ভবত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করে শচীন্দ্রনাথ নাটকে এই ধরনের চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

রক্ত-কমল নাটকের 'মমতা' ভ্রষ্টা নারীদের প্রতিভূ। যারা মোহান্ধবশত সাজানো ঘর-সংসার ত্যাগ করে নতুন সুখের সন্ধানে পথে নামে। অন্ধকার পিচ্ছিল পথে যখন তাদের মোহভঙ্গ হয় তখন আর ফিরবার উপায় থাকেনা। অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সারা-জীবন ধরে। তবে, পঙ্কিল জীবনযাত্রার মধ্যেও এদের পারিবারিক শিক্ষা সংস্কার ও সুকুমারবৃত্তি একেবারে ধুয়ে মুছে যায় না, সুযোগ ও সহায় পেলে আত্ম-সংশোধনের মাধ্যমে শুচি হয়ে উঠতে পারে। উপরন্তু, গ্লানিময় জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পোড়খাওয়া সোনার মতই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলা-বাহুল্য, বারাঙ্গনার সাথে ভ্রষ্টানারীদের মূলগত প্রভেদ হল, শেষোক্ত শ্রেণীর নারীদের কৃতকর্মের অনুশোচনা তাদের নতুন জীবন-অভিজ্ঞতার আলোকে মহীয়সী করে তোলে যা অনেক সময় সংকীর্ণ সামাজিক পরিমন্ডলের অনেক ঊর্ধ্বে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

পতিতপ্রসন্ন মমতার জীবনে ঝড় তুলেছে। সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে সংসার স্বামী পরিজন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তাকে অনাচারের পঙ্কিল স্রোতে ঠেলে দিয়েছে। একদিন মুখোশের অন্তরালে পতিতপ্রসন্নের ভয়ঙ্কর স্বরূপ জানতে পেরে তার অসহায়জীবন হতাশা ও অনুশোচনায় ভরে উঠল। মমতাকে সে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, রক্ষিতা নারীর মত তাকে মদ্যপান ও উচ্ছৃংখলতায় অভ্যস্ত করিয়েছে। ফিরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ। সামনে অনন্ত নরকের পথ। মমতা নিঃশেষে আত্মবিনষ্টির উপায় অবলম্বন করে।

পতিতপ্রসন্ন মমতাকে কেবল অন্ধকারময় জীবনেই টেনে নামাল না, তাকে এক গভীর চক্রান্তে অংশগ্রহণে চাপ দিতে থাকে। বহুদিন আগে সে তার স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়ে যায় একমাত্র শিশু-কন্যাকে ফেলে রেখে। দীর্ঘ ষোল বছর বাদে বিপুল সম্পত্তির লোভে ফিরে এসে তার কন্যা দাবি করে। এই সময় ঘটনাচক্রে মমতার জীবন যখন দুঃস্বপ্নে ভরে উঠেছে তখন এক সহৃদয় বৃদ্ধের সাহায্যে সে দাদামশায়ের গৃহে আশ্রয় পায়, পতিতপ্রসন্নেরই এতদিনের পরিত্যক্ত কন্যা তরুণী কমলের সঙ্গিনী হিসাবে।

পতিতপ্রসন্ন যখন পিতৃত্বের অধিকারে কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, একান্ত নিরুপায় দাদামশায় কমলের মুখ চেয়ে তার বাবার জঘন্য অপরাধ প্রকাশ করতে যখন অসমর্থ, সেই চরমক্ষণে মমতা পতিতপ্রসন্নের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয়, সেইসঙ্গে দাদামশায়ের বিপুল সম্পত্তির লোভে কমলকে তারই হাতের এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেবার চক্রান্ত ফাঁস করে দেয়। কিন্তু, সামাজিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে যাওয়ার ক্ষমতা আনন্দময়ের থাকলেও দাদামশায়ের নেই। তাই দাদা-মশায়ের গভীর স্নেহ আকর্ষণ করেও মমতাকে তার গৃহ ত্যাগ করতে হয়। আনন্দময় মমতাকে মায়ের শূন্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে আশ্রয় দান করল।

মমতা সাধারণ নারী নয়। পথভ্রষ্ট হলেও সে নারীত্বকে বিসর্জন দেয়নি। সুখের হাতছানিতে যে ভুল একদিন করেছে, সে-সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন সে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, পতিতপ্রসন্নের সান্নিধ্য আর তার কাঙ্ক্ষিত নয়। তার আত্মসচেতন নারীত্ব এই চক্রান্তের বিরোধিতা করে বলে ওঠে—'একবার সুখের কথায় মজিয়ে ঘরের বার করেছ……আবার সেই সুখের কথা শুনিয়ে নারীত্বের অবশিষ্ট যেটুকু আছে তাও নষ্ট করে পুরোদস্তুর পিশাচী করে তুলতে চাও? কিন্তু সুখ আর চাইনে। অনেকবার চেয়েছি……মনপ্রাণ ঢেলে চেয়েছি……মানসম্ভ্রম বিকিয়ে……কুলশীল বিসর্জন দিয়ে চেয়েছি। অমন করে চাওয়ার ফলে যা পেয়েছি, তাতেই আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেছে… আর তা চাইনে।'

শচীন্দ্রনাথ তাঁর বহু নাটকে নামের তাৎপর্যের সঙ্গে মিল রেখে চরিত্র অঙ্কন করেছেন। সাময়িক ভুলের হিসাবে মানুষের বিচার নয়, তার অন্তরের পরিচয়েই চরিত্রের আসল রূপ ফুটে ওঠে—শচীন্দ্রনাথ চরিত্রের নামকরণে সেই ইঙ্গিতই দেন। মমতা ভ্রষ্টা হয়েও তার দয়ামায়া স্নেহকে বিসর্জন দেয়নি। দুর্ঘটনায় আহত আনন্দকে স্বগৃহে এনে সেবা শুশ্রূষায় তাকে সুস্থ করে তোলে, কিন্তু দাসী করুণার কাছে মমতার পরিচয় পেয়ে যখন আনন্দ চলে যান, তখন সে দুঃখে ভেঙে পড়ে '……ওরে আমার লজ্জা, দুঃখ হচ্ছে না। কিন্তু অসুস্থ ওই বৃদ্ধকে এ সময়ে তুই কেন আমার পরিচয় দিলি? তা যদি না দিতিস, তাহলে হয়ত আর একটু অপেক্ষা করে ভাল করে সুস্থ হয়ে তবে যেতেন।… হয়ত চলতে গিয়ে আবার পড়ে গেছে, হয়ত রাস্তার একটি লোকও নেই যে সাহায্য করবে। করুণা। তুই কি করেছিস—কী করেছিস। যা এখুনি রাস্তাটা

আর একবার দেখে আয়।'

মমতা চরিত্রে দ্বন্দ্ব তেমন পরিস্ফুট নয়। দীর্ঘদিন ধরে পঙ্কিল জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত কোন নারীর মন একেবারে নির্মল থাকাও অবাস্তব। সুতরাং পতিতপ্রসন্নের চক্রান্তের প্রস্তাবে তার মানসিক ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব দেখাবার সুযোগ ছিল। বিশেষত পতিতপ্রসন্নের ছদ্ম-আন্তরিকতার সুরে হলেও মমতাকে তার নতুন করে ভালবাসার তাৎক্ষণিক প্রতিশ্রুতি, অর্থ-অনটনের সুরাহার ব্যাপারটিও তাকে দ্বন্দ্বমুখর করে তুলতে পারত।

নাটকে মমতাকে প্রথম থেকেই অনুশোচনারত নারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। নিতান্তই সাময়িক ভ্রান্তিবশত পদস্খলনটা যেন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নাট্যকার ভ্রষ্টা নারীর চরিত্র আঁকতে গিয়ে কেবল মদ্যপানের ব্যাপারটাই যুক্ত করেছেন, চরিত্রের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একান্তই অবহেলিত হয়েছে। ফলে চরিত্রটিতে অবাস্তবতার স্পর্শ লেগেছে।

জননী নাটকে 'মায়া' আর একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রষ্টা নারী চরিত্র! নাট্যকারের ভাষায় 'কুমারী জননীর জীবনসংগ্রাম'ই মায়া চরিত্রের সম্পদ। কুমারী-মাতৃত্বের সমস্যা নিয়ে শচীন্দ্রনাথের আগে কোন নাট্যকার সম্ভবত নাটক লেখেননি। যৌবনের প্রারম্ভে অসতর্ক আবেগের মর্মান্তিক পরিণতি অবৈধ কুমারী-মাতৃত্বের বোঝা মায়ার যৌবনে দুঃসহ যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে। বিলাস নামে এক নষ্ট চরিত্রের যুবক তার সন্তানের জনক। মায়াকে বিয়ে না করে তাকে বিপদের মাঝখানে রেখে পালিয়ে গেছে।

নাটকের নিখিল একজন উদার প্রকৃতির যুবক, যে মায়াকে ভালবেসে এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করতে চায়। কিন্তু মায়া নিরুপায়, সমাজের বুকে তার সন্তানের পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিলাসের অপেক্ষায় সে ধৈর্যধারণ করে আছে। ক্ষণিকের মোহ তার জীবনকে পাঁকে টেনে নামিয়েছে, তার এখন একমাত্র কর্তব্য নিজের সুখ ভবিষ্যৎ নয়, সন্তানের নাম-গোত্র-পরিচয়কে উদ্ধার করা। চরিত্রটিতে নাট্যকার একাধিক দ্বন্দ্ব-মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

শচীন্দ্রনাথের অন্যান্য চরিত্রের মতই 'মায়া' নামকরণের মধ্যে চরিত্রের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। নাট্যকার মায়া চরিত্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন— জননী জায়া ও প্রেমিকা। নারীর এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব যথাযথ রক্ষা করা

সাধারণ নাট্যকারের পক্ষে সহজ নয়—শচীন্দ্রনাথ সে লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছেন। এক দুর্ভাগা নারী জীবনের শুরুতে যে ভুল করেছে, তার মাসুল গুনতে গুনতে জীবনটাই গেল শেষ হয়ে। না পেল জায়ার স্বীকৃতি, জননীর সাধ না হল পূর্ণ, যে পবিত্র প্রেম তার জীবনে এসেছিল তাও সার্থক হয়ে উঠল না মিলনে।

একটা চরিত্রে এতগুলো নাটকীয় উপাদান স্বাভাবিক ভাবেই তাকে অবাস্তব করে তোলে। শচীন্দ্রনাথ নাটকের ভূমিকায় খোলাখুলি স্বীকার করেছেন টকির উপদ্রব থেকে বাংলা নাট্যশালাকে বাঁচাবার জন্য তিনি বর্তমান নাটকটিকে 'এক্সপেরিমেন্ট' হিসাবেই রচনা করেছেন এবং 'প্রচুর বায়স্কোপসুলভ ঘটনার' সমাবেশ করেছেন।

জননী নাটকে মায়া চরিত্রের ত্রিমুখী রূপকে ফুটিয়ে তুলতে বহুমুখী ঘটনাস্তরের সঙ্গে চারিত্রিক পারম্পর্য রক্ষার দুরূহ প্রচেষ্টায় নাট্যকার মোটামুটি সফল বলা চলে। বিলাস মায়ার উপর অবৈধ মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে চলে গেল। সমাজ সংসার থেকে নির্বাসিতা তার জীবনে নিখিল এল নিঃস্বার্থ প্রেমের ডালি হাতে নিয়ে। এর প্রত্যেকটি ফুল নিখিলের গভীর প্রেমে সিক্ত। মায়ার শৈশবের খেলার সাথী, প্রাপ্তবয়সে তারই প্রণয়-প্রত্যাশী। কিন্তু সে নিরুপায়। যে কলংক ও বন্ধন তার জীবনকে বেষ্টন করে আছে, সেই নাগপাশ থেকে মুক্ত না হলে তাদের মিলন সম্ভব নয়। মায়া প্রথম যৌবনের ভুল আর নিষ্পাপ শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিখিলের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। নিঃস্বার্থ প্রেমকে উপেক্ষা করা যেমন যায় না, জননী-হৃদয়ে সন্তানের মঙ্গলকামনাকে তেমনি খাটো করা যায় না। সমাজের চোখে অবৈধ হলেও তারই পুষ্টিতে বর্ধিত এক নিরপরাধ শিশুর ভবিষ্যৎ রচনার দায়িত্ব জননীর হাতে। প্রেম আর বাৎসল্যের দ্বন্দ্বে জয়ী হয় মাতৃত্বের বেদনা। নিখিলের প্রতি মায়ার ভালবাসা শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে পরম নির্ভরতায় সার্থক। মায়া তার শিশু-সন্তানের ভার প্রণয়ীর হাতে অনায়াসে তুলে দিয়ে অতীত দিনের চরম ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে কারান্তরালে বসে, সন্তানের থেকে দূরে নির্বাসিত জীবনযাপন করে—'তুমি আমাকে কত ভালবাস, তা আমি জানি নিখিল। আর তা জানি বলেই ত বিনা দ্বিধায় বিনা সঙ্কোচে আমার খোকার সকল ভাল তোমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারচি।'

মাতৃত্বের পূত কর্তব্য সকল কিছুর উপর। তাই, নিখিলের প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েও মায়া চিরদিন তার ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। নিখিলের শত অনুনয়ে সহস্র যুক্তিতেও তার ব্রত ক্ষুণ্ণ হয় না।

সত্যকামের প্রেমকে যেমন সে মাতৃত্বের চেয়ে বড় মনে করেনি, সন্তানের পিতৃ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নরাধম বিলাসের স্বরূপ জেনেও সে তার হৃদয়ে স্বামীর বিশ্বাস ও ভালবাসার আসনটি তাকে উৎসর্গ করে বসে আছে। নিখিলের প্রতি ভালবাসার প্রকৃতি এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাট্যকার নারীর অন্তরের বিচিত্রমুখী মানসিক ভাবের ইন্দ্রজাল রচনা করেছেন। শৈশবের খেলার সাথীর প্রতি যে আকর্ষণ ও প্রেমানুরাগ তার রূপই আলাদা। বাল্যের প্রেমে থাকে একটা জেদ একটা দাবি যা অনায়াসে উভয়ের মাঝখানে পরস্পর দূরত্ব সৃষ্টি করেও বয়ে যায় অব্যক্ত বেদনা।

কিন্তু, বিলাসের প্রতি মায়ার প্রেম ইহলৌকিক সংস্কারের মত দৃঢ়। তাই বার বার আঘাত পেয়েও ক্ষণমাত্র আশ্বাসের ইঙ্গিতে বিলাসের কাছে সে ধরা দেয়, তার সকল চক্রান্তের দায় মাথা পেতে নেয় বিনা অভিযোগে। তার পাশবিক আচরণ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহার মায়াকে পীড়িত করলেও স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে পারে না, এমনকি প্রিয়তম নিখিলের কাছেও নয়। নিখিল যখন বিলাসের উদ্দেশে কটূক্তি করে তখন সে দৃঢ় প্রতিবাদ করে বলে—'নিখিল। তুমি ভুলে যাচ্ছ নিখিল, সে আমার সন্তানের জনক, ঘৃণার পাত্র নয়।' মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের এমন বহিঃপ্রকাশ, নারী চরিত্রের এমন বৈপরীত্য বাংলা নাটকে খুব সুলভ নয়।

সুদীর্ঘদিন বাদে বিলাস ফিরে আসে নতুন চক্রান্তের পরিকল্পনা নিয়ে। মিথ্যা অভিনয়ে মায়া ভুলে যায় তার অতীতের অপরাধ। মায়ার সামনে তখন আরো বড় সমস্যা অপেক্ষা করছে, তা হল সন্তানের পিতৃপরিচয়কে সমাজের বুকে তুলে ধরা। আর সেই কারণেই অতিসহজে বিলাসের ফাঁদে আবার ধরা দিল। নিখিলের কাছে যার বাক্য শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিনিষ্ঠ, বিলাসের কাছে সে একেবারে অসহায়, বিচারহীন আবেগে তার নিষ্ঠুরতার কাছে অতি সহজে পরাজিত হয়। এটাই হয়ত ভারতীয় নারীর শাশ্বত সংস্কার—স্বামীর কাছে সন্তানের পিতার কাছে শর্তহীন নিবেদন। বিলাস লম্পট জমিদারকে হত্যার পর অসহায় মায়াকে সেখানে ফেলে-রেখে টাকা নিয়ে পালিয়ে

আসে, পরে মায়ার অভিযোগকে সে এক মনোরম মিথ্যায় ভূষিত করে তাকে সান্ত্বনা দেয়। মায়া বুঝতে চেষ্টা করল না কি ভয়ংকর বিপদের মধ্যে তাকে নিয়ে গিয়েছিল সে। জমিদারের কামনার আগুনে তাকে নিবেদন করার চক্রান্তও সে বুঝল না। উপরন্তু, পুলিশের ভয়ে বিলাস যখন পালিয়ে যেতে চাইছে, *মায়ার কণ্ঠ থেকে একরাশ উদ্বেগ ও আবেগ ঝরে পড়ে*—'না, না তুমি যেয়ো না। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

চরম বিপদ যখন ঘটে গেল, জমিদারের মৃত্যুতে অভিযুক্ত বিলাস বিচারস্থলে যখন মায়াকে বারাঙ্গনা বলে চিহ্নিত করল, তার হৃদয় গেল ভেঙে। কিন্তু বুক বাঁধল সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে। সে বিলাসের অভিযোগকে মাথা পেতে নিল। নিখিলের ক্ষোভের বিরুদ্ধে মায়া বলে—'মায়ের নয়, বাপের পরিচয়েই ছেলে পরিচিত হয়। একথা কি তুমি জান না? জান যদি, তা হলে কেন বুঝতে পারচ না ওর বাপের চরিত্র লোক-দৃষ্টিতে নিষ্কলংক রাখবার জন্য কেন আমি কলঙ্কের পসরা মাথায় বইতে পারব না?'

পিতৃ-পরিচয়ের কলংক থেকে সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা—পরিণতি কারাবরণ। সমাজের নিন্দা ও অখ্যাতি তাকে আর বিচলিত করেনা। শেষ দৃশ্যগুলিতে মায়ার মানসিক সংঘাত তীব্র রূপ নেয়। তার শিশুপুত্র এখন যুবক, শিক্ষাদীক্ষায় উপযুক্ত। সে তার পিতামাতার পরিচয় জানতে চায় পালক নিখিলের কাছে। নিখিল তা জানাতে অসমর্থ হয়। ঘটনাক্রমে অজয়ও এক তরুণীর সংগে প্রণয়াবদ্ধ। সে পিতৃমাতৃপরিচয় ছাড়া বিয়েতে অস্বীকার করে। মায়া এ খবর জানতে পেরে, সন্তানের নৈতিক অধঃপতন আশংকা করে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তার সংগে মেশে বহুদিনবাদে পুত্রের প্রতি উদ্বেল মাতৃস্নেহ। অজয়ের বাকদত্তা শুভার মায়ের আকুলতাকে আশ্বস্ত করে বলে—

মায়া ঃ তার বাপের পরিচয় আমি জানি।

দামিনী ঃ জান? তাহলে তাকে ডেকে পাঠাই।

মায়া ঃ ডেকে পাঠাবে? (আপনমনে) কতদিন তার মুখখানি আমি দেখিনি, কতদিন, কতদিন।

মায়া কি তার যুবক পুত্রের মুখখানি দেখতে চায়, নাকি বিলাসের? এই রহস্যময় মনের ঠিকানা নাট্যকারেরও বুঝি অজানা। তাই পূর্বকৃত পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ বিলাস যখন আবার আশ্রমে মায়াকে খুঁজে পায়, মায়াও কম

বিচলিত হয়নি।

বিলাস ঃ হাসপাতালে তোমার কথা শুনে মনে হয়েছিল আর কখনো আমার কথা তুমি ভাববে না।

মায়া ঃ না ভেবে যে পারিনা। অতীতকে যে একেবারে ভুলতে পারি না।

নারী মনের এই হলো স্বরূপ। দুর্জন ব্যক্তির জন্যও কেউ কেউ স্মৃতির কাঁটায় প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয়। সে যন্ত্রণায় নিছক দুঃখই থাকে তা নিশ্চয় করে বলা অসম্ভব। শেষপর্যন্ত মায়ার জেদের কাছে পরাজিত হয়ে বিলাস ফিরে যায়, মায়ারই বুক ভেঙে দিয়ে।

সমাপ্তি দৃশ্যে, সকল দুঃখের অবসানে যে সময় তার প্রিয় সন্তানের সঙ্গে বাকদত্তা শুভার মিলন হয়, তখন সকলের অজান্তে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল। এই সুখের দিনে মায়ার চিরবিদায়, একি বিলাসের সঙ্গে বাঞ্ছিত মিলন সম্ভব হল না বলে; তবে কি শৈশবের নির্মল প্রেমের তুলনায় মোহজ প্রেমের শক্তি এতই দুর্জয়—এই চির অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নাট্যকার কেবল মানুষের জীবনরহস্যের একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

অপরাধপ্রবণ চরিত্র

শচীন্দ্রনাথ সামাজিক নাটকে অপরাধপ্রবণ চরিত্র সৃষ্টিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তার মঞ্চসফল নাটকের এই বিশেষ শ্রেণীর চরিত্রগুলি সেকালের নাট্যরসিক দর্শকেরও দারুণ প্রশংসা অর্জন করেছে। বলাবাহুল্য, শচীন্দ্রনাথ এই ধরনের চরিত্র চিত্রণে তাঁর সমসাময়িক যেকোন নাট্যকারের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

অপরাধপ্রবণতা মানুষের সহজাত ধর্ম। শিক্ষা পরিবেশ এবং অনুষঙ্গ মানুষের অপরাধপ্রবণতাকে দূরে সরিয়ে রাখে, আবার এর প্রকারভেদ মানুষকে গুরুতর অপরাধী করে তোলে। সর্বদেশে সর্বকালে সকল সমাজেই অপরাধ-প্রবণ চরিত্র ছড়িয়ে আছে, তাদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন, বহু বিচিত্রপথগামী।

মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের রোমাঞ্চ-উপন্যাস অনুসরণ করে শচীন্দ্রনাথ বাংলানাটকে অপরাধপ্রবণ চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এইসব অপরাধীদের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান। সমাজের উঁচুতলায় এদের প্রকাশ্য ঘোরাফেরা, কিন্তু তলে তলে তারা অন্ধকার রাজ্যের এক

একজন অধীশ্বর। এদের অতীত জীবনের পটভূমিকায় প্রত্যেকের এক একটি সামাজিক অপরাধ বর্তমান, যা কাহিনীর পরিণতি-দৃশ্যে সংঘাত ও চরম নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে।

তটিনীর বিচার নাটকে ডাঃ ভোস এমন একটি চরিত্র। স্ত্রী-কন্যাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে একদিন সে বিদেশে ভেষজ-বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে সাতবছরবাদে দেশে ফিরে এল এবং ব্ল্যাকমেলিং ধরনের অপরাধজনক কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের রাস্তা খুঁজে পেল। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় এবং মানুষের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত সুশিক্ষিত ডাঃ ভোস তার অপরাধের পরিকল্পনা ছক বেঁধে অগ্রসর হয়। এইসব অপরাধীরা পারতপক্ষে খুনী হয়না, কিন্তু প্রয়োজনবোধে তাতে তাদের হাত কাঁপে না। ডাঃ ভোস বেকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের মধ্য থেকে সহকারী নির্বাচন করে তাদের দিয়েই নিজের কাজ উদ্ধার করে।

ডাঃ ভোস চরিত্রের অতীত ও বর্তমান জীবনযাত্রায় দ্বন্দ্ব মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই। ললিতাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে তটিনীকে যখন অভিযুক্ত করা হয়েছে, ডাঃ ভোস তখন জানতে পারে সে তারই মা-হারা কন্যা। ডাঃ ভোস তার অন্যতম সহকারী সমরকে চেপে ধরল। যে দুর্লভ বিষ সে আবিষ্কার করেছিল, 'elixer of life' ভেবে সমর ললিতার খাবারজলে তা মিশিয়ে দিল যাতে বসন্তর কাছে ললিতা আরও আকর্ষণীয় সৌন্দর্যে বিকশিত হতে পারে। তাহলে সমরের পক্ষে তটিনীকে লাভ করা সহজ হবে।

ডাঃ ভোস সমরকে চাপ দিয়ে তার স্বীকারোক্তি আদায় করল। তাকে আদালতে হাজির করিয়ে তার অপরাধ কবুল করাতে বাধ্য করলেও তটিনীর মত সুন্দর মেয়ের ক্রিমিনাল পিতা হওয়ার লজ্জা ও অনুশোচনা তাকে আচ্ছন্ন করল। যদিও এর আগে তার কথায় ও আচরণে কোন দ্বন্দ্ব বা দুঃখ ফুটে ওঠেনি, কিন্তু পরিণতি-দৃশ্যে সে নিজে প্রকৃত দোষী না হয়েও দুর্লভ বিষ নিয়ে বেআইনি এক্সপেরিমেন্ট করার অপরাধ স্বীকার করে এবং প্রকাশ্য আদালতে নিজের জীবনের বিনিময়ে তৈরী বিষের পরীক্ষা দিয়ে কন্যা তটিনীকে মুক্তি দিয়ে যায়।

ডাঃ ভোস একটা খাঁটি অপরাধপ্রবণ চরিত্র। দয়ামায়া স্নেহ প্রভৃতি কোমল অনুভূতি নিয়ে সে কোনদিন বিশেষ মাথা ঘামায়নি। তার কাছে স্নেহ-মায়া-

মমতা দুর্বলের গুণ, শক্তিমানের লজ্জা—'জীবনে সফল হতে হলে অর্থাৎ যাকে বলে successful man তাই হতে হলে মন থেকে স্নেহমায়া দয়া সবই বিসর্জন দিতে হয়। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, দুঃস্থকে অভাব থেকে মুক্ত করা, নিজের অন্নের ভাগ অপরকে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করা হয়ত ভাল কাজ—কিন্তু সে আমার নয়, তোমার নয়, ভোগীর নয় লোভীর নয়।......'

ডাঃ ভোস চায় নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। পৃথিবীতে এই দুর্লভ ক্ষমতা অর্জন করতে হলে তার মতে '......শক্তির মূলাধার motive force হচ্ছে টাকা। এই টাকা আমরা হাজারে হাজারে লাখ কোটিতে সংগ্রহ করব।' এই টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে তার কোন বাছবিচার নেই, টাকাপয়সায় তার গভীর আসক্তি। এই কারণেই যৌবন বয়সে এক অপরাধে ফেরারী হয়ে স্ত্রী শিশুকন্যাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছিল। আবার বহুবছর বাদে যখন স্বদেশে ফিরল, ভুলেও তার স্ত্রী কন্যার কথা মনে পড়ল না। তবে অর্থলোলুপ স্বার্থপর হয়েও সে সকলের সংগে মিশতে পারত, রসিকতাও করতে পারত। যদিও এই রসিকতায় থাকত ব্যঙ্গ অপরের তুলনায় নিজের অভিজ্ঞতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রচেষ্টা।

শচীন্দ্রনাথ ডাঃ ভোসের মধ্যে মানবিক চেতনার স্পন্দন না দেখিয়ে কতকটা যান্ত্রিক ও কৃত্রিম করে তুলেছেন। সুদীর্ঘদিনবাদে জন্মভূমিতে ফিরে আসার পর কোন ব্যক্তির স্ত্রী-কন্যার কথা মনে না পড়ার অর্থ নির্মম হৃদয়হীনতা, আবার তটিনীর বিরুদ্ধে আদালতের রায়দানের আগেই সে অনুতপ্ত হয়ে কন্যার মুক্তি প্রার্থনা করে, সমরও তার অপরাধ অকপটে স্বীকার করল। হঠাৎ এই বাৎসল্যের সঞ্চার ও নৈতিক চেতনার উদ্বোধন আকস্মিক মনে হয়। নাটকীয় ভাব প্রকাশের আগে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, এই চরিত্রে তা দেখা গেল না। ফলে আদালতে সর্বসমক্ষে নাটকীয় স্বীকারোক্তি এবং কন্যা তটিনীর কাছে তার জীবন-ভর অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা আবেগের সঞ্চার করলেও কৃত্রিম হয়ে পড়ে—'ক্রিমিনাল বাপের সন্তান বলে তোমার মনে যে ঘৃণা রয়েচে তা দূর করে দেবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু তুমি যে নিরপরাধ সেই প্রমাণ আমি দিয়ে যাচ্ছি। জানি, জীবনে তুমি তোমার ক্রিমিনাল বাপকে মার্জনা করতে পারবে না। কিন্তু তারজন্য যদি দু ফোঁটা চোখের জলও ফেল, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, অথচ তার অভিশপ্ত আত্মা শান্তি পাবে।'

ডাঃ ভোস চরিত্রটিতে শচীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রথমদিকের লেখা

একখানি রহস্যোপন্যাস 'মরণ-মহল'-এর কূট ও ব্যভিচারী চরিত্র ডাঃ রাঘবেন্দ্র সামন্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। ডাঃ ভোসের মত সেও স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তাকে ত্যাগ করেছিল। ডাঃ ভোসের যেমন 'elixer of life' তেমনি রাঘবেন্দ্রকে অনন্ত জীবন-এর সন্ধানে এক দৈব পাথর (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যার কণায় কণায় রেডিয়াম) লাভের উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষীর গভীরে রক্ষিত ত্রিশটি কল্পিত কফিনের জন্য ত্রিশজন লোকের হত্যা এবং চারটি ক্রুশে চারজন নারীর ক্রুশবিদ্ধ করার (যার মধ্যে তার প্রেমিকা-স্ত্রী অন্যতম) কাজ সম্পন্ন করতে হবে তাকে। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাঃ ভোস যেমন তার কন্যা তটিনীকে নিজের অজ্ঞাতসারে বিপদে জড়িয়েছিল, তেমনি ডাঃ রাঘবেন্দ্র জ্ঞাতসারেই প্রেমিকা-পত্নীর পুত্র অমিয়কে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি।

অবশ্য ডাঃ ভোসের তুলনায় ডাঃ রাঘবেন্দ্র আরও নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর চরিত্রের। ডাঃ ভোস তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে, খুনের অভিযোগ থেকে তার আত্মজাকে উদ্ধার করার জন্য আত্মঘাতী হয়। অন্যদিকে ডাঃ রাঘবেন্দ্রের মনে কোন অনুশোচনা নেই।

জননী নাটকের 'বিলাস' আর একটি উল্লেখযোগ্য অপরাধপ্রবণ চরিত্র। ডাঃ ভোসের মতই সে উচ্চশিক্ষিত, সমাজের উঁচুতলার মানুষ। আদালতে তার স্বীকৃতি—'মাষ্টারীও করেছি, সাহিত্য চর্চাও করেছি।' আবার এরই হাতে জমিদার খুন হয় এবং নিরপরাধ নারীর ওপর নিজের সকল অপরাধ চাপিয়ে আদালতে তাকে বারবণিতা বলে ঘোষণা করে। অথচ মায়া তার পূর্ব প্রেমিকা। বিলাস একদিন তাকে কুমারী-মাতৃত্বের গ্লানিতে কলঙ্কিত করে সমাজ-সংসার থেকে টেনে নিচে নামিয়েছিল। বহুদিনবাদে সে আবার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মায়াকে সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

এমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা নিম্নস্তরের অপরাধীর চিত্রকেই তুলে ধরে। শচীন্দ্রনাথ চরিত্রটি রূপায়ণের ব্যাপারে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। জাত-অপরাধী বলতে যা বোঝায় বিলাস হল সেই প্রকৃতির। পকেটমার গুণ্ডা বদমায়েসদের নিয়ে সংগঠিত একটা দলের সে নেতা। তার নির্দেশ ও পরিচালনায় সমাজের বুকে তারা বড় বড় অপরাধ ঘটায়। বিলাসের শিক্ষা ও বুদ্ধির সাহায্যে এইসব

নানা অপরাধের পরিকল্পনা সফল করে তোলে। দয়ামায়া স্নেহের স্থান তার জীবনে নেই। তাই, অনায়াসে এক বিরাট ষড়যন্ত্র সফল করার উদ্দেশ্যে তার পূর্ব-প্রেমিকাকে কাজে লাগায়, যে বিলাসেরই সৃষ্ট এক অবৈধ মাতৃত্বের দায় নিয়ে তারই অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। মিথ্যা অনুশোচনা এবং মায়াকে ও তার শিশুপুত্রকে সামাজিক স্বীকৃতিদানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি—আগাগোড়া ব্যাপারটি অভিনয়ের সাহায্যে তার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে নতুন এক অপরাধের হাতিয়ার হিসাবে তাকে ব্যবহার করল। এ ব্যাপারে তার মনে বিন্দু-মাত্র দ্বিধা প্রকাশ পায়নি। আবার পরক্ষণেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে অবলীলাক্রমে মায়ার ওপর তার অপরাধের সব বোঝা চাপিয়ে দেয়। মায়ার দুর্বলতা, অসহায়তাকে বিলাস তার শিক্ষা ও বুদ্ধির সাহায্যে যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

তবে শচীন্দ্রনাথ বিলাসচরিত্রে মানবিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে একেবারে গৌণ করেননি যা ডাঃ ভোস চরিত্রে দেখা গেছে। আত্মরক্ষার জন্য সে যেভাবে আদালতে মায়ার চরিত্রহনন এবং মিথ্যা কুৎসার আশ্রয় নিয়েছে, তাতে তার নিষ্ঠুর প্রকৃতি ধরা পড়লেও মায়ার নির্বিবাদে সকল অভিযোগ মাথা পেতে নেওয়ার ঘটনাটি তার মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আদালতে আত্ম-রক্ষার প্রচেষ্টায় সফল হয়েও সে নিদারুণভাবে মুষড়ে পড়েছে এবং তার দুরন্ত অপরাধপ্রবণ চিত্তে মানসিক দ্বন্দ্বের ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে। জীবনে এই প্রথম তার হৃদয় দ্বিধা ও অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হল। দলের গোপন আস্তানায় যখন তার মুক্তি উপলক্ষে আনন্দোৎসব চলছে, সে তখন বিমর্ষ চিন্তিত। এক সাগরেদের কথার উত্তরে তার ব্যাকুলতাই ফুটে ওঠে—'তুমি ত জান ডাক্তার, কি মূল্য দিয়ে এই মুক্তি কিনতে হয়েছে। তার জন্য নিরপরাধ একটা লোককে তোমরা খুন করেছ, সরলা অসহায়া সম্পূর্ণ নির্দোষ একটি নারীকে তার শিশুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দশ বছরের জন্য জেলে পাঠিয়েচ।'

বিলাসের মনে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, নাটকের পরিণতি দৃশ্য পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়েছে। নবজীবনের সন্ধিক্ষণে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের যন্ত্রণা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। বিচারে ছাড়া পেয়ে আস্তানায় ফিরে গেলে তার কাছে সব কিছু নতুন এবং অসহনীয় মনে হয়।

বিলাস ঃ এটা কি শুঁড়ির দোকান ?

পান্না ঃ শুঁড়ির দোকান নয় সত্য, কিন্তু গোঁসাইজীর আখড়াও নয়। তোমার আড্ডার এই রূপ হবে না ত কী হবে?

বিলাস নতুন দৃষ্টিতে নিজেকে দেখল, বিচার করল এবং তার এতদিনের জীবনযাত্রার ছবি দেখে সে চমকে উঠল।

বিলাস ঃ ওরা কি মানুষ নয়?

পশুপতি ঃ অনেকদিনের অভ্যাস যে সে মনুষ্যত্ব থেকে ওদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে। আজ ওরা দ্বিপদ পশু ছাড়া কিছু নয়।

বিলাস ঃ আমরা, তুমি, আমি?

পশুপতি ঃ তফাৎ খুব বেশী নেই। সংস্কারটুকু সম্পূর্ণরূপে যায়নি, এই যা। পান্না যা বলে, তা কি একেবারে মিথ্যা?

বিলাস ঃ পান্নার কোন কথা সত্যি? কোন কথা?

পশুপতি ঃ নিরপরাধ মেয়েটির কাঁধে অপরাধের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে শুধু নিজে মুক্তি পাবে বলে।

বিলাস ঃ হ্যাঁ, সে-কথা সত্যি।

পশুপতি ঃ যা করতে তখন তুমি বেদনা বোধ করনি, তাই করে তুমি মুক্তি কিনেছ বলে তারাও বেদনা বোধ করচে না—কথাটা একই দাঁড়াচ্ছে নাকি?

বিলাস ঃ কিন্তু আমার অন্তরে যে ব্যথা জমে উঠেছে।

জেল থেকে মায়ার ছাড়া পাওয়ার দিনে জেলের গেটে ছুটে যায় বিলাস। এতদিন ধরে তীব্র অনুশোচনা তাকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছে, জীবনের প্রতি গভীর গ্লানি তাকে আচ্ছন্ন করেছে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তার পক্ষে মায়ার ক্ষমা পাওয়া খুবই জরুরী। অপরাধ-জীবনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়েছে। এখন শুরু প্রায়শ্চিত্তের পালা। মায়ার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে নিখিলের কাছে মায়ার ঠিকানা খুঁজে পায়। নিখিল তাকে ঘৃণা প্রদর্শন করলেও উত্তেজিত হয়না, বিনীতভাবে তার খোকাকে একবার দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে—'......আগে ত জানতুম না, আগে ত বুঝতুম না, পুত্র এমন আকর্ষণের পাত্র। পরিচয় দেবার মুখ নেই, পরিচয় দিতেও পারব না—শুধু একটিবার দেখে যাব। কত বড়টি হয়েছে।'

দুর্দান্ত দস্যুদলের নেতা খুনী বিলাস নিখিলের অপমান বিরক্তি ও চাবুকের প্রহার নীরবে সহ্য করে চোখের জলে অতীতের গ্লানি মুছে ফেলে

নিখিলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘটনাক্রমে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শৈশবে পরিত্যক্ত পুত্রের সাহায্যে হাসপাতালে আসে ; মায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পুত্রকে চিনতে পারার সুযোগ পেয়েও মিলিত হতে না পেরে কাতর হয়ে পড়ে। সে মায়ার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখে। মায়া তার এই কল্পনাকে সার্থক করার সুযোগ দিল না। এজন্য বিলাসের কোন জবরদস্তি নেই। সে বারবার মায়ার কাছে ছুটে যায়, বারবার আঘাত পেয়ে চলে আসে। বিলাসের মন দুঃখের আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়। তার দলের লোকও তাকে দেখে বিস্মিত হয়। সেই দর্প তেজ অহংকার তার জীবন থেকে মুছে গেছে।

বিলাসের অপরাধপ্রবণ চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন নানা অতিনাটকীয় উপাদানে রচিত হলেও আকস্মিকতাদুষ্ট নয়। মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এই চরিত্রে বর্তমান যা স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করেছে।

সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র

শচীন্দ্রনাথের বিচিত্র নাট্যবিষয়ের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উত্থান এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখানো হয়েছে। জমিদার এবং কৃষক ফসল উৎপাদন ও ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। প্রকৃতির শ্যামল-সৌন্দর্যের মধ্যে তাদের মানসিকতা গড়ে ওঠে। পুরুষানুক্রমে মাটির সঙ্গে মানুষের এই যোগ তাদের চিন্তারাজ্যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন-মতাদর্শ গড়ে ওঠে। ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের সঞ্চিত ধ্যানধারণার অবশ্যম্ভাবী বিরোধ ঘনিয়ে উঠল। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে পুঁজিবাদী তথা ধনতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব দেখা গেল। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সংগ্রাম ও শান্তি এবং মাটির মায়া নাটকে এই বিরোধের কথাই তুলে ধরেছেন।

সংগ্রাম ও শান্তি নাটকে নাট্যকার উনিশ শতকের শেষভাগে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের একটি সুন্দর চিত্র উপহার দিয়েছেন। সামন্তযুগের অবসান এবং এবং যন্ত্রযুগের আবির্ভাব—এর সন্ধিক্ষণে ভাঙাগড়ার ঢেউ যখন সমাজের উচ্চ-নীচ সকল স্তরের মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেসময় কিছু মানুষ পুরনো

চিন্তাভাবনাকে আঁকড়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। জমিদার চন্দ্রশেখর তাদেরই একজন।

গ্রামের জমিদারশ্রেণীর শোষণ প্রতিহিংসা প্রজাউৎপীড়ন, তাদের নিষ্ঠুরতা অহংকার উচ্ছৃংখলতার কাহিনী সুবিদিত। আবার একজন সামন্ত জমিদারের মানসিক ক্রিয়া কেবল প্রজাশাসন ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, তার পারিবারিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। নিজের স্ত্রীর ওপর চন্দ্রশেখরের আচরণে নাট্যকার তা পরিস্ফুট করেছেন।

করুণাময়ী ঃ আমি চা খাবো না।

চন্দ্রশেখর ঃ কেন ?

করুণাময়ী ঃ আমার ভালো লাগে না।

চন্দ্রশেখর ঃ কিন্তু তোমাকে চা খাওয়াতে আমার যে ভালো লাগে।

করুণাময়ী ঃ আমার ভালো না লাগলেও তোমার হুকুমে খেতে হবে ?

চন্দ্রশেখর ঃ বিদ্রোহের সুর কেন ? এ বয়সে ঠিক মানায় না।

করুণাময়ী ঃ তোমার জুলুম আর সইতে পারিনা।

চন্দ্রশেখর ঃ জুলুম যদি বল নাচার। কিন্তু চা তোমাকে খেতেই হবে। প্রতি কাজ করতে হবে আমার আদেশে। বিয়ের পর থেকে যেমন করে এসেচ……'

সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকার গভীর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পারিবারিক তুচ্ছ বিষয়েও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার মূল যে কত গভীরে বিস্তার করে তা উপরের কথোপকথনেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

সংগ্রাম ও শান্তি নাটকে চন্দ্রশেখর তার পূর্বপুরুষের 'লাঠি যার মাটি তার' নীতির শেষ প্রতিনিধি। নব্যযুগের নতুন চিন্তাভাবনার প্রতীক তারই আত্মজ অবিনাশের সঙ্গে ঘোরতর সংঘাত বেধে গেল। পুত্রের আদর্শবোধের সঙ্গে পিতার প্রাচীন আদর্শচেতনার বিরোধ হওয়ায় চন্দ্রশেখরের জমিদারী স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

চন্দ্রশেখরের একমাত্র পুত্র অবিনাশ। সামন্ততন্ত্রবিরোধী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। প্রতিমা তার আন্দোলনের সাথী। তারা উভয়েই প্রজা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করছে। যথাসময়ে চন্দ্রশেখর পুত্রের কীর্তি অবগত হলেন। প্রতিমা যখন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এলো। চন্দ্রশেখর ভয়াবহ জমিদারী

আচরণের দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন তার নীলরক্ত এখনো সজীব ও সক্রিয়।

কিন্তু ট্রাজেডির নায়কের মত চন্দ্রশেখরেরও একটা দুর্বল স্থান আছে। চন্দ্রশেখর যত কঠিন হৃদয়ই হোন না কেন পুত্রবাৎসল্যের কাছে তিনি পরাজিত। অবিনাশ যখন সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যেতে উদ্যত, চন্দ্রশেখর হার মানলেন। পিতৃহৃদয়ের হাহাকার এই মুহূর্তে বড় মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা নামে যে মেয়েটিকে স্বর্গধামের নিশ্ছিদ্র গহ্বরে রেখে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন তাকে মুক্তি দিয়ে পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করলেন। তীক্ষ্ণধী জমিদার প্রতিমা ও তাঁর পুত্রের প্রণয়ের কথা বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন।

প্রতিমার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের প্রথম সাক্ষাৎকারে যে সামন্ততান্ত্রিক তেজ দেখা গিয়েছিল, প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তিতে তার নিঃশেষ পরিণতি দেখা গেল। প্রথম অঙ্কের প্রায় সবখানি জুড়ে ট্রাজেডি নায়কের অপরিসীম আত্মবিশ্বাস দুর্জয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে চন্দ্রশেখর বিরাজ করেছেন।

প্রথম অঙ্কের একজায়গায় প্রতিমার কথার উত্তরে নিরন্ন কৃষকদের উদ্দেশে চন্দ্রশেখর বলছেন—'আমি বলচি তাদের চোদ্দপুরুষের মাঝে কেউ কোনদিন মানুষ ছিল না আজও নয়। মানুষ। ওই মূর্খ অপদার্থের দল আবার মানুষ, তাদের আবার অধিকার।' চন্দ্রশেখরের এই সদম্ভ উক্তিতে সাধারণ শ্রমজীবী কৃষকদের প্রতি ঊনবিংশ শতকের সামন্তদের অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে। কিছু পরে প্রতিমার আর একটি প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রশেখর আবার বলেন—'…ধরিত্রীমায়ের বুক থেকে যারা পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেনা, তারা কোনদিন পারবে শক্তিমানের কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নিতে? তারাও পারবে না আমরা দেব না।' চন্দ্রশেখরের উক্তির শেষ অংশটি অত্যাচারী সামন্তদের চরিত্র প্রকট করে দেয় —'তারাও পারবে না আমরা দোব না।'—এই বাস্তব সত্যই সামন্তসমাজের মূল চিত্র।

নাটকের দ্বিতীয় অংকে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রশেখর পুত্রবধূর (প্রতিমা) হাতে জমিদারী দেখাশোনার ভার অর্পণ করে সস্ত্রীক কাশীবাসী হয়েছেন। দীর্ঘ সাতবছর বাদে যখন তাদের আকস্মিক প্রত্যাবর্তন ঘটল, চন্দ্রশেখর দেখতে পেলেন জমিদার-গৃহের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। পুরনো চাকরদের বিদায় দিয়ে অবিনাশ নতুন চাকর বাবুর্চি দারোয়ান রিসেপসানিস্ট নিযুক্ত করায় প্রবলপ্রতাপ জমিদারকে তারা চিনতে পারে না, ফলে একটা ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হয়।

এই দৃশ্যটি সুন্দর নাটকীয় দৃশ্য। চন্দ্রশেখর দেখলেন তাঁর পিতৃপুরুষের জমিদারীর নিচেকার ভিত আর নেই। একমাত্র পুত্রের হাতে তার ধ্বংস সূচনা হয়েছে। জমিদারীর শস্য-শ্যামল রূপও নেই, সেখানে বড় বড় কারখানার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। অবাঙ্গালীদের সহযোগিতায় তাঁর জমিদারীর সমস্ত জমি কিনে নেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে। এই সময় পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। পুত্রবাৎসল্যের কাছে চন্দ্রশেখর দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেন।

শেষ অঙ্কের শুরু দশবছর বাদে। পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থান দখল করেছে নব্য ধনতান্ত্রিক আদবকায়দা। অবিনাশের উগ্র আধুনিক জীবন-যাত্রা চন্দ্রশেখরের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনা। তিনি 'সারা দিন কৃষকদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করেন। নিজ হাতে জমি চাষ করেন, বাড়ী ফিরে বই নিয়ে পড়াশুনো করেন।' এই বইগুলো কৃষি সম্বন্ধীয়।

নাটকের শেষ দৃশ্যে দুর্ধর্ষ জমিদার তাঁর সর্বশেষ পরাজয় স্বীকার করেন। চন্দ্রশেখরের এককালের ভৃত্য, বর্তমানে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী মনোহর যখন জমিদারী-অত্যাচারের গোপন প্রকোষ্ঠে চন্দ্রশেখরকে বন্দী করে অতীতের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হল তখন চন্দ্রশেখর মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে একটা ছোট্ট অনুরোধ জানান—'আমাকে হত্যা করবার পর এই ধানের মঞ্জুরী-গোছা তুমি আমার ছেলের হাতে আমার পুত্রবধূর হাতে পৌঁছে দেবে।'

নাটকের অন্তিম দৃশ্যে চন্দ্রশেখরের জমিদারী প্রতাপ, সকল অহংকার ও গৌরব নিঃশেষে ধূলোয় মিশে যায়। চন্দ্রশেখর নিজেকে আর অভিজাত জমিদার মনে করেন না। কিন্তু বোঝা যায় না, খেটে খাওয়া চাষীর জমির প্রতি যে ভালবাসা, তা জমির উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য জমিদারের মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হলো। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত বিলাসী অহংকারী পরশ্রমোপজীবী মানুষের পক্ষে এই পরিবর্তন সময়-সাপেক্ষে হলেও বাস্তবসম্মত মনে হয়না।

বস্তুত, নাটকখানি আপাতদৃষ্টিতে মিলনান্তক হলেও প্রকৃত নায়ক যে জমিদার চন্দ্রশেখর, তার ভাবাদর্শের বিয়োগান্তক পরিণতিই ঘটেছে—একদিকে বংশের একমাত্র সন্তানের প্রতি অপরিমেয় স্নেহ অন্যদিকে জমিদারী স্বার্থরক্ষার ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা—এই দুই পরস্পর সংঘাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত এবং অবশেষে পরাজয় বরণ। চন্দ্রশেখরের অন্তর্দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও শাস্তি নাটকের সম্পদ। শচীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিপুণভাবে তা চিত্রিত করেছেন।

মাটির মায়া নাটকে 'মাধব মোড়ল' সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের আর একটি দৃষ্টান্ত। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির শিকার একজন সাধারণ নিম্নবিত্ত কৃষকের সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম মাটির মায়া নাটকের উপজীব্য বিষয়। সংগ্রাম ও শান্তি নাটকে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র শোষকের ভূমিকায় এবং মাটির মায়া নাটকে শোষিতের ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছে।

মাধব মোড়ল চাষীদের নেতা, চাষীরা তার পরামর্শ এবং আদেশ মেনে চলে। নাটকের কাহিনীঅংশ আকস্মিকতা ও অতিনাটকীয়-দুষ্ট হলেও চরিত্রগুলি সজীব ও সক্রিয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় সাধারণ মানুষ কঠোর শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হয়, দু-মুঠো খেয়েপরে বেঁচে থাকার মত সংস্থানও তারা করে উঠতে পারে না। মাধব মোড়ল সামান্য কিছু জোতের মালিক। তারা সকলেই বেশি লাভের জন্য জমিতে পাট ফলায়। কিন্তু ব্যবসায়ী ও মহাজনদের চক্রান্তে পাটের ন্যায্য বাজার-মূল্য তারা পায়না। মাধব চাষীদের সংগঠিত করে, পাট বিক্রী না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মাধবকে তার নিজের দেওয়া আদেশ লঙ্ঘন করতে হয়। তার একমাত্র নাতি গোপাল অসুস্থ, অথচ ডাক্তার ডাকার মত পয়সা নেই। ভাল পথ্য দেবার ক্ষমতা নেই। মাধবের মনে ঝড় ওঠে। যে বিদ্রোহ অসন্তোষ তাকে মহাজনদের বিরুদ্ধে রুখে ওঠার সাহস জুগিয়েছিল, তা এক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়। তার জায়গায় ফুটে ওঠে সামন্ততান্ত্রিক দৈব-নির্ভরতা। 'পয়সা যাদের থাকে না তাদের ছেলেমেয়ের চিকিৎসা হয় না, তাদের পাওনাদারের অপমান সইতে হয়, তাদের ভিটেমাটি উচ্ছন্নে যায়। সংসারে চিরদিনই তাই হয়ে আসচে, চিরদিন তাই হবে।'

আবার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের আর একটা দিক ভাবপ্রবণতা ও অহংবোধও মাধবের মধ্যে ফুটে উঠেছে। গোপালের অসুস্থতায় প্রতিবেশীর ছেলে কার্তিক এগিয়ে এলে মল্লিকার সংগে তার গোপন প্রণয়ের কথা ভেবে তাকে কঠোরভাবে আসতে নিষেধ করে—'কোন কথা নয়। আমি মাধব মোড়ল এক কথা একবারের বেশী বলিনা।' এই একগুঁয়েমি জেদ যুক্তিহীনতা সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অবশেষে কোন প্রচেষ্টাতেই গোপালকে বাঁচানো গেল না। একদিকে সাথী কৃষকদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি, অপরদিকে গৃহত্যাগী পুত্রের মাতৃহারা

সন্তান গোপালকে অকালে হারাবার বেদনায় মাধব তার মেয়ে মল্লিকাকে নিয়ে গ্রামের বাস তুলে দিয়ে শহরে যাত্রা করে। একদিন যে বুক ঠুকে আবেগের সংগে বলেছিল—'শ্রীপুরের একবিঘে জমিও বাইরের কোন লোক কখনো কিনতে পাবে না। মাটির মানুষ আমরা—শ্রীপুরের চাষীরা—বুকের রক্ত ঢেলেও মাটিতে বুক দিয়ে পড়ে থাকবে।' দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ও নাতির মৃত্যুর শোকে সেই অটল প্রতিজ্ঞা ভেঙে যায়। তার সকল অহংকার ও তেজ হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—

'জানি বর্ষায় ঘরের চাল পচে খসে পড়বে, জানি ঘাস স্যাওড়া, বনধুতরা, ছাতিম, কদম বাড়ীর সাথে বনের তফাৎ ঘুচিয়ে দেবে, জানি শেয়াল, সাপ, শুয়োর এসে সেখানে বাঁধবে বাসা, আর ভিটে দেখিয়ে বলবে এইখানে বাস করত বাংলাদেশের এক চাষা। জানি সব জানি, জেনে বুঝেই বলেচি। আয় মল্লিকে আয়।'

সামন্ততান্ত্রিক অসহায়তা দৈবনির্ভরতা এইসব নিরক্ষর নিঃস্ব সরল চাষীদের জীবনকে চিরদিন ব্যর্থ করে দেয়। উঠে দাঁড়াবার মত আত্মবিশ্বাস ও শক্তি ক্ষণিক আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও পরক্ষণেই তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়ে। মাটির মায়া নাটকের প্রথম দিকে কৃষক-বিদ্রোহের যে সুর শোনা যায়, নেতৃত্বের সংকটে তা মুছে যায়। শ্রমিকের সংগে কৃষকের মূল পার্থক্য এখানেই। শ্রমিকদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক দৈব নির্ভরতা নেই, তার হারাবারও কিছু নেই। তাই আপন শক্তিতে তারা অধিকার ছিনিয়ে নেয়। তারা কেবল জানে পৃথিবীতে শত্রু একটাই তা হল শোষক শ্রেণী। ঈশ্বরের করুণায় নয়, মানুষের হাতে গড়া সমাজ মানুষের হাতেই রূপান্তরিত হবে; মুষ্টিমেয় ক্ষমতালিপ্সু মানুষের হাত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিনিয়ে নেবে তাদের অধিকার, প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা।

শহরে গিয়ে মিল-শ্রমিকের কাজ করতে করতে একদিন মল্লিকা গেল হারিয়ে। মাধব মেয়ের খোঁজে পাগলের মত হয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিকদের বস্তিতে তার প্রতি কোন সহানুভূতিই দেখানো হয় না। এ ধরনের ঘটনা তাদের কাছে নতুন কিছু নয়, তাই মেয়েকে হারিয়ে মাধব বস্তিতে একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞেস করতে তার উত্তরে উপেক্ষা ও হতাশা ঝরে পড়ে।

আন্না ঃ আমরাও দেখিনি, তুমি আর দেখতে পাবে না।

মাধব ঃ দেখতে পাবনা। কেন ?

আন্না ঃ কেন তা ভগবানকে জিজ্ঞেস কর। চল্‌রে চল্‌ ঘরে যাই।

শ্রমিকদের বস্তিতে নারীর সম্মান নিয়ে তখন কেউ মাথা ঘামাত না। নারীরাও মেনে নিত তাদের ওপর পুরুষের অবাধ অধিকার। তাই একজনের বউ অপর একজনের সংগে ঘর ছেড়ে গেলে, কি কারো অনূঢ়া কন্যা আর একজন পুরুষের সংগে পালিয়ে গেলে কারো মনে কোন রেখাপাতই করেনা। কিন্তু মাধবকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। তার শ্রীপুর গ্রামের কথা মনে পড়ে। সে বলে ঃ '……অভিমান ভরে চলে এসেছিলাম, কিন্তু ভুলতে পারিনি। দিনরাত আমার শ্রীপুর যে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি যাব, শ্রীপুরে ফিরে যাব। ছেলেমেয়ে যার যা ইচ্ছে করুক, আমি আমার বাপ দাদার ভিটেয় বুক দিয়ে পড়ে থাকব।'

অবশেষে একদিন অসুস্থ মাধব ফিরে আসে তার শ্রীপুর গ্রামে। সেইসংগে শহরের বাবুরাও আসে কারখানা গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে। এই সময় মাধবের মধ্যে দুটি অনুভূতি কাজ করে। নিজের গ্রামে কারখানা স্থাপন করে সামন্ত-তান্ত্রিক দুর্বল অর্থনীতির হাত থেকে অসহায় দরিদ্র কৃষকদের যেমন সে বাঁচাতে চায়, পাশাপাশি শ্রমিকজীবনের গ্লানি—শুভ-অশুভ সুন্দর-অসুন্দর সম্পর্কে উদাসীনতা অবাধ নীতিহীন জীবনযাপনের ভয়ংকর পরিণতি ভেবে সে আতংক-গ্রস্ত হয়। তখন তার মনে পড়ে গ্রামের স্নিগ্ধতা, গভীর দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যেও শ্যামল-শান্তির প্রলেপ। আবার দারিদ্র্যের জ্বালায় ওষুধপথ্যহীন নাতির মৃত্যুর কথা মনে হলে কারখানার শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজের সুযোগ, তাদের ঐক্যবদ্ধ জীবনসংগ্রাম তাকে প্রলুব্ধ করে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সে আশান্বিত হয়।

অরিন্দম ঃ তোমার এই ভিটেয় তোমারই কাম্য কারখানা স্থাপিত হবে।

মাধব ঃ ওপর থেকে আমি তা দেখতে পাব ?

অরিন্দম ঃ দেখতে পাবে কারখানার চিমনি আকাশে মাথা তুলে গরীবদের দুঃখদৈন্য পুড়িয়ে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দেবে।

মাধবের এই আকাঙ্ক্ষা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ভালোভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। কিন্তু কারখানা তৈরির জন্য মাটিতে পিন মারার শব্দ যখন সে শুনতে পায়, ভীত চকিত হয়ে ওঠে।

মাধব ঃ ঐ শব্দ—কিসের শব্দ।

অরিন্দম ঃ মাটিতে পিন পুঁতে জরীপওয়ালারা কারখানার সীমানা স্থির করচে।

মাধব ঃ এ্যাঁ। না না, ও জায়গাটা নিও না নারায়ণ। ঐখানে একদিন ছিল আমার পূর্বপুরুষের চন্ডীমন্ডপ। দশভুজা দশহাত মেলে দাঁড়াতেন ওখানে······ওখানটাও না, ওখানটাও না। ওখানে ছিল একটা দোলনচাঁপার গাছ। ফুলে লতায় ভরে থাকত, আর মল্লিকের মা······আমার বুকে বিঁধচে··· নারায়ণ—শ্রীপুরের জন্য তুমি আমার সর্বস্ব নাও, শুধু এই ভিটেটুকু নিওনা।'

নাট্যকার নিজে মাধব মোড়লের 'মাটির মায়া'কে তার ট্রাজেডি বলে মনে করেন। সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল মাটির প্রতি মায়া বা ভালবাসা। কোনকিছুর বিনিময়েই সে তাকে হারাতে রাজী নয়। তবে মাধবের এই ট্রাজিক পরিণতির পাশাপাশি তার শ্রমিক ও কৃষক জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বটিও নাট্যকার যথাযথ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

বাংলা নাটকে এ ধরনের জটিল চরিত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টা খুব বেশি নেই। অবশ্য আলোচ্য নাটকে চরিত্র-ভাবনার সঙ্গে ঘটনা-পরিকল্পনার সাবলীল ঐক্য স্থাপিত হয়নি। ঘটনার কিছু কিছু অংশ অসংলগ্ন ও অবাস্তব হয়ে পড়ায় সহজ সরল রূপটি ফুটে ওঠেনি।

দেশাত্মবোধক চরিত্র

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন নাটকে জাতীয়তাবাদী ও দেশাত্মবোধক চরিত্র অঙ্কন করেছেন। কেবল ঐতিহাসিক নাটকে নয় সামাজিক নাটকেও এই ধরনের চরিত্র সমান দক্ষতায় ফুটে উঠেছে। শচীন্দ্রনাথ মূলতঃ জাতীয়তাবাদী নাট্যকার। তাঁর জীবনের একটা অংশ স্বদেশী আন্দোলনে অতিবাহিত হয়েছে। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা ভীষণভাবে সক্রিয় ছিল। আবার এই জাতীয় চেতনার সঙ্গে মিলেছিল মানবতাবাদের আদর্শ এবং কখনো কখনো তা বিশ্বমানবতাবোধেও উত্তীর্ণ হয়েছে।

'দেশপ্রেম' শব্দটার মধ্যে একটা সংকীর্ণতা আছে যা মানুষকে একটা দেশ ও

কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে কিন্তু এই দেশপ্রেমের মধ্যেই থাকে মনুষ্যত্বের মুক্তি মানবতা ও মানুষের অধিকার সচেতনতা, মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীকে পরাধীনতা এবং দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা। শচীন্দ্রনাথের নাটকে দেশপ্রেমের এই তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ আছে।

দেশাত্মবোধক নাটকের কেন্দ্রীয়চরিত্রে প্রতিফলিত হয় সমগ্র দেশের ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব। শচীন্দ্রনাথ বিশেষত ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমিক ও জাতীয় বীর-চরিত্র রূপায়ণে এগুলির যথাযথ ব্যবহার করেছেন।

সিরাজদ্দৌলা একখানি ঐতিহাসিক নাটক। কিন্তু, নাট্যকার সিরাজদ্দৌলা চরিত্রকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অংকন করাকে অপরিহার্য মনে করেন নি। নাটকের নিবেদন অংশে শচীন্দ্রনাথ পরিষ্কার জানিয়েছেন—'জাতির পক্ষে যা চরম ট্রাজেডি, তাই আমি সিরাজ-চরিত্র অবলম্বন করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।' সুতরাং সমগ্র জাতির যে দোষগুণ সিরাজ চরিত্রে তা পরিস্ফুট। পক্ষান্তরে সিরাজ পরাধীন জাতির সংগ্রাম আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতা এবং হতাশার প্রতীক। সিরাজের অসহায়তা নির্ভীকতা সারল্যকে শচীন্দ্রনাথ বাঙালী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। সিরাজের পরাজয় এবং তার বীজ নিহিত বাঙালী-চরিত্র-প্রকৃতিতেই।

নবাব আলিবর্দীখাঁর প্রিয় পৌত্র সিরাজদ্দৌলা বাল্যকাল থেকে বিলাস ও প্রাচুর্যে পালিত। তাঁর প্রথম যৌবনে যে উচ্ছৃংখলতা দেখা দিয়েছিল, ইংরেজ বিরোধিতার সময় থেকে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং দেশের চরম বিপদের দিনে গভীর দেশাত্মবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সর্বাধিক, বিশেষত সংলাপের ভাষা এবং চরিত্রাংকন পদ্ধতিতে যে কাব্যিক আমেজ অনুভব করা যায় তা তাঁর পূর্বসূরী দ্বিজেন্দ্রলালে বর্তমান।

শচীন্দ্রনাথ-অংকিত সিরাজদ্দৌলা কবিত্বসুলভ আবেগে পরিচালিত। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলাচরিত্রে আবেগ তত তীব্র নয়। ঐতিহাসিক নাটকের গঠন-কৌশলে শচীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ঋণী।

নাটকের শুরুতেই সিরাজদ্দৌলার শপথ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে 'বাংলার

আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা'র ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। এ শপথ 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা'র শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার। এরপর রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার নবাবসুলভ চারিত্রিক দৃঢ়তা ভেদ করে খাঁটি বাঙালী-চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। চারিদিকের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মধ্যে সিরাজ নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়েছেন, যদিও এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণে তাঁর ঘরে-বাইরের নিরলস সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী ট্রাজিকরসকে প্রগাঢ় করে তুলেছে। কলকাতার কুঠি আক্রমণ করে ইংরেজকে পরাভূত করায় তাঁর বীরত্ব প্রকাশিত হলেও ট্রাজেডির বীজ নিহিত রয়েছে তাঁর চরিত্র-প্রকৃতিতে—অকৃত্রিম সারল্য এবং বিশ্বাস পলাশী যুদ্ধের করুণ পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

সিরাজদ্দৌলা-চরিত্র অংকনে শচীন্দ্রনাথ সিরাজের বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র পরিচয় ফুটিয়ে তোলেননি। বলাবাহুল্য, নাট্যকারের তা ইচ্ছাও ছিল না, কেননা তিনি নিরহংকার আত্মবিস্মৃত ও আবেগপ্রবণ বাঙালী জাতির প্রতীক-রূপে সিরাজদ্দৌলাকে এঁকেছেন। তাই মীরজাফরের শঠতার কথা জেনেও এবং ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্তে যুক্ত জেনেও তিনি ভালবাসা ও প্রীতির দ্বারা তাকে জয় করতে চাইলেন—'জাফর আলী খাঁ! আজ বিচারের দিন নয়, সৌহার্দ্য স্থাপনের দিন। অন্যায় আমিও করেচি, আপনারাও করেচেন। খোদাতালার কাছে কে বেশী অপরাধী তা তিনিই বিচার করবেন। আজ আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আশ্বাস দিন যে, বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না।'

সিরাজ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—তিনি প্রেমিক। তবে এ প্রেম অন্তঃপুরবাসিনী অবলা নারীর প্রতি নয়, সে নারী রবীন্দ্রনাথের চিত্রাংগদার মত অনায়াসে বলতে পারে,'......যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে / যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী / আমার পাইবে তব পরিচয়।' প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে আলেয়ার নিঃসঙ্কোচ নির্ভীক মিষ্টি হাসি শুনে নবাব সিরাজদ্দৌলার স্থলে কবি সিরাজের কন্ঠ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—'......বেগমরা হাসতে জানে না, হারেমের নর্তকীরাও না। তোমার হাসি শোনবার আগে আমি মনে করতাম মুর্শিদাবাদে, শুধু মুর্শিদাবাদে কেন, সারা বাংলাদেশে কেউ হাসতে জানে না।......'

শচীন্দ্রনাথ সিরাজচরিত্রে কেবল দেশাত্মবোধক রূপই আঁকেননি পাশাপাশি তার প্রেমজীবনের ছবিটিও তুলে ধরেছেন। এইভাবে দোষেগুণে ভরা একজন পরিপূর্ণ রক্ত-মাংসের চরিত্রই তিনি আঁকতে চেয়েছেন। দায়িত্ববোধশূন্য বেহিসেবী যৌবনে নারীকে একদিন সিরাজ ভোগের উপাচার হিসাবেই দেখতেন। আজ জীবনের শেষ যুদ্ধে, ঘোরতর বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি আলেয়াকে বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গিনী রূপে কামনা করেন। আলেয়ার মধ্যে সিরাজ স্বতন্ত্র নারীর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ, তাই আবেগভরে বলে ওঠেন—'আলেয়া! জীবনে বহু নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে; কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখিনি।……নারীকে তখন দেখেছি শুধু ভোগের সামগ্রীর মত। আজ সে উন্মাদনা নাই। আজ নারীর কাছে আমার নানা দাবী। রাজ্য যা দিতে পারে না,…অথচ যা না পেলে জীবন মরুভূমির মত হয়ে যায় তাই আজ আমি চাই নারীর কাছে।…'

সিরাজদ্দৌলা চরিত্রকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে শচীন্দ্রনাথ আলেয়া নামক কাল্পনিক চরিত্রটির আশ্রয় নিয়েছেন। সিরাজদ্দৌলার সৌন্দর্য-পিপাসু মন শিল্পী-সুলভ উদারতা ও সারল্যের সুযোগে যে রাজনৈতিক চক্রান্তের জাল বিস্তৃত হচ্ছে, সেই সান্ত্বনা-সহানুভূতি-ভালবাসাশূন্য মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আলেয়ার প্রতি আকৃষ্ট অসহায় সিরাজ; নিঃসঙ্গ মরুদ্যানের শীতল ছায়ায় মুগ্ধ তার তৃষিত অন্তর ক্ষণিক বিশ্রাম নিতে চায়।

সিরাজদ্দৌলা চরিত্র অঙ্কনে আলেয়ার সৃষ্টি নাট্যকারের এক বিশেষ শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে নারীর ভূমিকা ছিল একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং যুদ্ধপরবর্তী সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সুখে দুঃখে একে অপরের হৃদয়ের কাছাকাছি এসেছে। এই সময় শচীন্দ্রনাথ যুগ পরিবর্তনের ইঙ্গিত এবং স্বদেশী চেতনায় রূপান্তরের ধারাটিকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। বাংলা নাটক ও নাট্য-শালা গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে বর্তমান যুগে—'দেশপ্রেমকে স্বাধীনতা-প্রীতিকে উদীয়মান তরুণ তরুণীর প্রেমের ও স্বাধীনতা-প্রীতির সঙ্গে এক করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরিচয় গৈরিকপতাকা, কারাগারে, সিরাজদ্দৌলায় সুস্পষ্ট পাওয়া যাবে। দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি

ব্যাহত হলে ব্যক্তিগত প্রেম ও প্রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করেনা।'

সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের ঐতিহাসিক রূপের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করেছেন—'সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদর্শিতা, সিরাজের অন্তরের দয়া দাক্ষিণ্যই তাঁকে জীবনের শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়। অধিকাংশ বাঙালী চরিত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য। সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার পরাজয় হলো। তাঁর পতনের সংগে সংগে বাঙালী হলো পতিত।'

কেবল জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয় যুগ-বৈশিষ্ট্যও সিরাজদৌলা চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে। পরবশের গ্লানি বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীকে পীড়িত করে তুলেছিল। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটক দেখে যেমন বালগংগাধর তিলক মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা নাটক দর্শনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উচ্ছ্বাসের কথা ইতিহাসে লিপিবন্ধ আছে। এই দুটি ঘটনায়, দুই যুগের দুই স্বদেশনেতার সিরাজবন্দনার মধ্যে যুগ-বৈশিষ্ট্যের সমান্তরাল সিরাজদ্দৌলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট সিরাজদ্দৌলা ধীর স্থির যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃত্বের যে স্বরূপ তা এই সিরাজের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা আবেগপ্রবণ, তাঁর দেশাত্মবোধে স্থির সংকল্পের একান্তই অভাব এবং ভাবাবেগের স্রোতে ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের শেষের দিকে সন্ত্রাসবাদীদের যে ভাবপ্রবণতা আমরা দেখতে পাই, যে রোম্যান্টিক আবেগ স্বপ্ন অস্থিরতা তাদের পরিচালিত করেছে শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলায় অনুরূপ প্রতিফলন দেখা যায়।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের শেষ দৃশ্যে জনতার কাছে সিরাজদ্দৌলার আত্মপক্ষ সমর্থনের নাটকীয় আবেদনটি সিরাজের চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। নাট্য-কার এই দৃশ্যটি রূপায়ণে শেকস্‌পীয়রের নাটকে জনতা দৃশ্যগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বন্দী সিরাজদ্দৌলা জনতার সমর্থন লাভের আশায় ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, তাঁর শেষ আবেদন'…এস ভাইসব, এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি, পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হারিয়ে এসেচি, বংগজননীর কনক-কিরীটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কি না ?'

সিরাজের আবেগদীপ্ত ভাষণ হারিয়ে যায় খুনীর উদ্যত কৃপাণে এবং 'মহম্মদী

বেগ তুমি!'—এই বিস্মিত আক্ষেপ মনে করিয়ে দেয় জুলিয়াস সিজারের সেই বিখ্যাত উক্তি 'ব্রুটাস তুমিও'। ঈর্ষা বিদ্বেষের চিরন্তন পরিণতি এমনিভাবে এক একটি দেশ ও জাতির জীবনে নেমে আসে সুদীর্ঘ রাত্রির অভিশাপ।

সিরাজদ্দৌলার মত মারাঠাবীর রাজা শিবাজীও স্বদেশী আন্দোলন তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজা শিবাজীর ঐতিহাসিক সংগ্রাম, তাঁর দৃঢ়-চরিত্র রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বুদ্ধিমত্তা প্রচলিত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ শিবাজীর এই ঘটনাবহুল জীবনেতিহাসের অংশবিশেষ নাট্যরূপ দিয়েছেন গৈরিক পতাকায়।

শিবাজীর স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার প্রতি সীমাহীন অনুরাগ বিশ্বাস ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। মুঘলসম্রাটের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিলেন রাজা শিবাজী। ভারতবর্ষের অন্যতম সার্বভৌম স্বাধীন নৃপতি দাক্ষিণাত্যের খর্বকায় দুরন্ত যৌবনদীপ্ত পুরুষসিংহ সম্রাট ঔরংগজেবের রাতের দুঃস্বপ্ন-এই শিবাজী 'পাহাড়ী ইঁদুর' নামে খ্যাত। মুষ্টিমেয় পার্বত্য মাওলা সেনাদের নিয়ে তিনি মুঘল বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণ করে বারবার পর্যুদস্ত করেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাজনৈতিক দূরদর্শীতা সর্বোপরি তাঁর সুগভীর দেশাত্মবোধ চিরদিনের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

শিবাজী চরিত্রের আর একটি উল্লেখ্য গুণ নাট্যকার তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন, তা'হল তাঁর অমর ত্যাগের মহিমা। গুরু রামদাসের কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। রাজ্য ধনদৌলত ইহজীবনের সকল সুখ গুরুদেবের পায়ে সমর্পণ করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করছেন। সর্বত্যাগী ও কর্মযোগী শিবাজী-চরিত্রের এই নিরহংকার দিকটিকেও নাট্যকার তুলে ধরেছেন।

দেশাত্মবোধের এমন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ পরবশতার ইতিহাসে খুব বেশি দেখা যায়নি। মহারাষ্ট্রকে মুঘলদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেদিন যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল তাতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর ও সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত করে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মিলন-সূত্র রচনা করার মূলে রাজা শিবাজীর ভূমিকা যে কত জীবন্ত, নাট্যরূপে তার নিদর্শন আছে। অবশ্য জাতির এই সাধনাকে শিবাজী দৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন মাত্র। মারাঠাদের এই মানবিক অধিকারের আন্দোলন জাতীয় মর্যাদা-লাভ করেছিল বহুদিন আগেই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন— 'শিবাজী বড়ো হইয়া উঠিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত মারাঠা জাতি তাঁহাকে বড়ো না করিয়া তুলিত। বহুদিন হইতে বহু ধর্মবীর দেশের উচ্চনীচের ব্রাহ্মণ শূদ্রের কৃত্রিম ব্যবধান ভেদ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন করিতেছিলেন। ভক্তির রাজপথকে তাঁহারা ইতর ও বিশিষ্ট সকলেরই জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক ভগবানের অধিকারে তাঁহারা দেশের সকলকে সমান গৌরবের অধিকারী করিয়াছিলেন। মারাঠার ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতে-ছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মনন হইতে উদ্ভূত।'[১]

শচীন্দ্রনাথ শিবাজীর এই ঐতিহাসিক চরিত্র-প্রকৃতির শিল্পসম্মত রূপদানে সফল হয়েছেন। মন্দিরে আরতি হচ্ছে, শিবাজী দেখতে পেলেন মন্দির থেকে দূরে অন্ধকারে অস্পষ্ট মনুষ্যাকৃতি বহু মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বিস্মিত শিবাজীর প্রশ্নের উত্তরে তানাজী জানালেন রাজ্যের মাওলা অস্পৃশ্য প্রজারা মন্দির সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মন্দিরে ওদের প্রবেশাধিকার নেই।

শিবাজী ব্যথিত হলেন। তাঁর এক হিন্দুরাজ্য গড়বার স্বপ্ন ম্লান হয়ে গেল। দেশের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে, সেই সব সরল মাওলা প্রজাদের আনন্দ-উৎসবে এমন কি ঈশ্বরোপাসনায় অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখার অধিকার কারো নেই। মা জিজাবাঈও পুত্রের দুঃখে বিচলিত হলেন। শিবাজী এইসব গরিব মাওলা কৃষকদের অধিকার সচেতন করতে চাইলেন।

শিবাজী ঃ……অধিকারহারা অভাগারা ভুলে গেছে যে, মায়ের কাছে ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই, সবল-দুর্বলের পার্থক্য নেই। মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তুমি মা, ওদের এই কথাটিই আজ বুঝিয়ে দাও যে, তোমার শিব্বার যে অধিকার রয়েছে, তা থেকে মহারাষ্ট্রের কোন সন্তানই বঞ্চিত নয়।

মারাঠাদের এই ধর্মীয় অধিকার অর্জনের ব্যাপারে শিবাজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে করুণা বা দয়া প্রদর্শন ছিলনা, মানুষের অধিকারের সংগ্রামে তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই চরিত্র সৃষ্টিতে স্বয়ং জাতীয়তাবাদী নাট্যকারের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। শিবাজী চরিত্রের এই মৌলিক দিকটি শচীন্দ্রনাথের

১. শিবাজী ও মারাঠা জাতি (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩ খণ্ড, জ. শ. সংস্করণ)

জীবনেরই একটা বিশেষ দিক। শিবাজীর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, যে অধিকার কৃপার দান তা ক্ষণস্থায়ী, তাই অধিকারকে স্থায়ী করতে চাই সংগ্রাম।

শিবাজী: না তানাজী, মন্দিরে আসবার অধিকার ওরা স্বাধিকারবলে গ্রহণ করতে পারল না—কৃপার দান বলেই মনে করল। আমি চাই ওরা ওদের অধিকার বুঝুক, সেই অধিকার আয়ত্ত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হোক। কেউ যদি তা থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়, তাহলে তার টুঁটি ওরা চেপে ধরুক। কৃপাকণা কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওরা ওদের ভিতরের শক্তি সঙ্কুচিত করে ফেলেছে—ওরা পূর্ণ হোক, মুক্ত হোক।

কোন দেশই আপামর জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিছাড়া বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারেনা। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে জাতি ও বর্ণভেদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শিবাজীর কঠোর মনোভাবের কথা সুবিদিত। একজন দেশপ্রেমিক রাজা হিসাবে নিম্নবর্ণের মাওলা কৃষকদের সামাজিক সংস্কারের বন্ধন থেকে স্বাধীন করে যে ভাবে সম্মানিত করেছিলেন তা বিস্ময়কর। প্রতিদানে দেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সৈনিক হিসাবে তারা শিবাজীর ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলিতে মরণপণ সংগ্রাম করেছে। ১ অঙ্কের ৪ দৃশ্যে দরবারে আসীন শিবাজী তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের কিছু ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে শুনতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। শিবাজী শূদ্র। তাঁর বেদ পাঠ ও শ্রবণের অধিকার নেই জেনে তিনি বিস্মিত।

শিবাজী: শূদ্রের বুঝি কেবল অধিকার আছে বেদ ও ব্রাহ্মণ রক্ষা করবার জন্য আত্মবলিদানের? তাদের বুঝিয়ে দেবেন যে মহারাষ্ট্রে নীচবর্ণ বলে কেউ কোন অধিকার থেকেই বঞ্চিত হবে না। তারপরও যদি তারা নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের কণ্ঠ নীরব রাখবার ব্যবস্থা শিবাজী করবে।……

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা বড় বাধা ছিল ভারতবর্ষের নির্মম জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা। ইংরেজরাও এই ভেদবুদ্ধির পেছনে ইন্ধন জুগিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী করেছিল। অবিভক্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন জাতীয় নেতা গান্ধীজী এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষব্যাপী যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তার মূলেই ছিল জাতি ও বর্ণবিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলে দেশমাতার শৃংখল মোচনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান। শচীন্দ্রনাথ শিবাজী চরিত্রের এই বিশেষ

দিকটি চিত্রিত করে তৎকালীন ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ তুলে ধরতে পেরেছেন।

অসহায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শৌর্যবীর্যে ত্যাগে তাকে শক্তিশালী করতে শিবাজী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মুঘলের আক্রমণ থেকে একটা জাতি তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে—শিবাজীর এই স্বপ্নকে সফল করবার আয়োজন শুরু হয়েছে সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে। রামদাস সেই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত। শিবাজীর নেতৃত্বে তানাজী রণরাও পেশোয়া প্রভৃতি বীর মারাঠাগণ সেই পবিত্র হোমানলে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

শিবাজী মূলত এক হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, মুঘলের সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশাকে পরাভূত করে দেশকে পরাধীনতার দাসত্ব থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসে শিবাজীর পরধর্মমতের উপর আস্থা ও সহিষ্ণুতার কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু নাট্যকার গৈরিকপতাকায় ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে সমসাময়িক জাতীয় সত্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের ঐক্য-শক্তির যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল শচীন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারগণ তাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র শিবাজীকে নিয়ে লিখেছেন 'ছত্রপতি শিবাজী' কিন্তু জাতীয় ঐক্যের তাৎপর্য তাতে ফুটে ওঠেনি। শিবাজীর দেশপ্রেম ও বীরত্ব কাহিনীকে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গেলে যে পরিমার্জনার প্রয়োজন গিরিশচন্দ্রের নাটকে তা প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু শচীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আগ্রাসী পীড়ন-নীতিতে সেদিন ভারতবর্ষের হিন্দু নৃপতিদের অনেকেই ছিল সন্ত্রস্ত। খুব স্বাভাবিক কারণেই বিজাতীয়দের উপর শিবাজীও বীতরাগ ছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ-ভাগে ইংরেজ শাসনের কালে পরিস্থিতিটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন কেবল হিন্দু জাতি নয়, এদেশ যাঁদের মাতৃভূমি সেইসব মুসলমানরাও ইংরেজ বিতাড়নের শরিক হয়েছেন। ফলে, শিবাজীর দেশপ্রেমকে নাট্যরূপ দিতে গেলে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, শচীন্দ্রনাথের তা ছিল।

১ অঙ্কের ৪ ও ৫ দৃশ্য রচনায় নাট্যকার শিবাজী চরিত্রের ঐতিহাসিক

দুর্বলতাকে মুছে দিয়ে তাঁকে যুগোপযোগী দেশাত্মবোধের মূর্ত প্রতীক রূপে চিত্রিত করেছেন।

রাজা শিবাজী দরবারে বসে আছেন। এই সময় বিজাপুরবাসী মুসলমান-দের তিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত হল। তারা সুলতান আদিল শা'র অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শিবাজীর রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী। সারা ভারতবর্ষে মুসলমান নরপতির অভাব নেই, তাদের কাছে না গিয়ে হিন্দুরাজ্য মহারাষ্ট্রে বসবাসের আবেদনে শিবাজী বিস্মিত। তাদের বক্তব্য —'মহারাজ। স্বধর্মীদের আশ্রয়ে থাকলে ধর্মাচরণে আমাদের কোন অসুবিধা হবেনা, তা আমরা জানি। কিন্তু মহারাজ আমরা দরিদ্র। দরিদ্র হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সর্বত্রই সমান নির্যাতন ভোগ করে, আমরা আপনার চরণেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

শিবাজী তাদের আশ্বাস দিলেন। এইসময় দ্বিধাগ্রস্ত পেশোয়া ও রঘুনাথ তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলে তাদের ভুল ভেঙে দেন তিনি।

পেশোয়া ঃ কিন্তু মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া কি আমাদের উচিত মহারাজ ?

শিবাজী ঃ কেন নয় পেশোয়া ?

রঘুনাথ ঃ আমরা তা'হলে যুদ্ধ করছি কার সংগে মহারাজ ? কার উপদ্রব থেকে মহারাষ্ট্রকে রক্ষা করতে চাইছি ?

শিবাজী ঃ মুসলমান রাজশক্তির। দরিদ্র মুসলমান প্রজারা ত উৎপীড়ন করেনা, তারা ত মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালিনী করে, দেশের সকলের জন্য তারা করে স্বার্থ বিসর্জন। ধর্মরাজ্যের অর্থ সেই রাজ্য, বন্ধুগণ, যারা প্রজারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাজার সংগে সমানে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে।'

ধর্মরাজ্যের এই সংজ্ঞা নির্দেশের মাধ্যমে নাট্যকার শিবাজীর দেশপ্রেমকে যুগোপযোগী চেতনার আলোকে চিত্রিত করেছেন। গৈরিকপতাকা নাটকের শিবাজী যথার্থই শিল্পসুষমামণ্ডিত এক আদর্শ মহামানব। নাট্যকারের কল্পিত পরধর্ম-মতসহিষ্ণুতা শিবাজীর চরিত্রে নতুন ডায়ামেনশন এনেছে—শচীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এখানেই।

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল নারীকে মাতৃ-জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন শিবাজী চরিত্রের আর একটি প্রধান দিক। উপরোক্ত

দৃশ্যে আর একটি ঘটনা তাঁর চরিত্রকে মহান ও দীপ্ত করে তোলে।

শিবাজীর একজন সেনাপতির নাম বিশ্বনাথ। সে কেল্লা দখল করে মুলানা আহাম্মদ বলে একজন বয়োবৃদ্ধ মুসলমান ও তার যুবতী পুত্রবধূ মেহেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে শিবাজীর দরবারে হাজির করল। মনে মনে তার আশা বিধর্মী মুসলমানকে শত্রু বলে মনে করলেও রাজা শিবাজী এই রূপসী মুসলিম নারীকে তাঁর বিলাসের উপকরণ হিসাবে পেয়ে নিশ্চয়ই খুশি হবেন এবং তার ভাগ্যে পদোন্নতি ও পুরস্কারও জুটে যেতে পারে। শিবাজী সেনাপতিটির মতলব বুঝতে পেরে জ্বলে উঠলেন। হতাশা আর গ্লানিতে তিনি ভেঙে পড়লেন, অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মাতা জিজাবাঈ-এর কাছে অভিযোগ জানালেন।

শিবাজীঃ মা, মা! আমার এক সেনানায়ক আমাকে লম্পট ভেবে কুল-মহিলাকে বন্দিনী করে এনেছে আমায় উপঢৌকন দিয়ে খুশি করতে। এতবড় অপমানও আমাকে সইতে হবে?

অসূর্যম্পশ্যা মুসলমান কুলবধূর এই অপমানে তিনি বিজয়ী সেনাপতিকেও রেহাই দিলেন না। বিশ্বনাথকে তিনি বন্দী করবার আদেশ দিলেন এবং মেহেরের উদ্দেশে অপরাধী সন্তানের মত ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন।

শিবাজীঃ (মেহেরের প্রতি) মা! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর মা। অযোগ্য লোকের উপর কার্যভার ন্যস্ত করেছিলুম বলেই মায়ের এই লাঞ্ছনা। মুলানা সাহেব, আপনারা শিবাজীর বন্দী নন—আপনারা শিবাজীর অতিথি। বিশ্রামান্তে মাকে নিয়ে যথেচ্ছা আপনি যেতে পারেন। আর তুমি মা, যদি পার তবে যাবার আগে একটিবার বলে যেয়ো যে, মারাঠাদের তুমি ক্ষমা করেছ।

হিন্দুধর্মে নারীর প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধের সংস্কার রয়েছে, দেশ ও জাতির সংকটের দিনে যুগে যুগে তাই আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রেরণার উৎস হয়েছে। শিবাজীর মধ্যে এই সংস্কার ছাড়াও উপরন্তু এক সরল ও স্বাভাবিক চারিত্রিক নির্মলতা আছে যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবাজী চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকারের দক্ষতা প্রমাণিত হয়।

ঐতিহাসিক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের তেমন অবসর থাকেনা। ঘটনার সুনির্দিষ্ট গতিপথ থেকে সরিয়ে নাট্যকার ঐতিহাসিক চরিত্রকে ইচ্ছামত রূপ দিতে পারেন না, মনস্তত্ত্বের ব্যবহারও তাই খুব সীমিত। অথচ, ঐতিহাসিক নাটকের উপকাহিনীগুলিতে চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দুর্লভ নয়। শিবাজী

চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই বললে চলে, পাশাপাশি উপকাহিনীর সম্পূর্ণ কাল্পনিক নারী চরিত্র বীরার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব বেশ গভীর ও স্পষ্ট।

সুনির্দিষ্ট ভূখন্ড সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী আপামর সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ—এ সবকিছু নিয়েই দেশ, আর এর সংগে একাত্মতাই হল দেশাত্মবোধের স্বরূপ। কালোটাকা নাটকের 'বিজয়া'র মধ্যে এই সত্যোপলব্ধি ঘটেছে বলেই একে দেশাত্মবোধক চরিত্র বলা যায়। ঐতিহাসিক নাটকের দেশাত্মবোধের সংগে সামাজিক নাটকের দেশাত্মবোধে প্রকৃতিগত যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাস রচিত হয়েছে রাজা বাদশাদের লড়াই ও তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সেখানে দেশাত্মবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে পর-রাজ্যের আক্রমণ থেকে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করার মধ্যে। সাধারণ মানুষ সেখানে উপেক্ষিত। রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের যুগ অতিক্রম করে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান যুগের ইতিহাস তাই সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ ও সংগ্রামের ইতিহাস। দেশাত্মবোধের অর্থ এখন আরো গভীর ও ব্যাপক। কালোটাকা নাটকের বিজয়ার একটি সংলাপে তা প্রকাশিত।

বিজয়া : দিক থেকে দিগন্ত দুঃখের প্লাবনে তলিয়ে রয়েছে। তুমি আমি সুখ পাব কেমন করে? ব্যক্তিগত সুখে আমাদের কোন অধিকার নেই। তাই সুখের সন্ধান নয় দুঃখের নিরসনই আমাদের ধর্ম। জান ত সাধনার জন্যও তেমনই প্রয়োজন স্বাচ্ছন্দ্যবর্জন, পীড়ন বরণ, দারিদ্র্য গ্রহণ।

দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী বাংলাদেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সংগে সংগে নরনারীর স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। বিশেষত নারীমনের দ্বন্দ্ব চেতন ও অবচেতন স্তরের কামনা-বাসনা ইচ্ছা-অনিচ্ছা জটিল মনস্তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে সাহিত্য ও নাটকের অংকিত চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছিল। শচীন্দ্রনাথের কালোটাকা নাটকের বিষয়বস্তুতে যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ইংগিত আছে এবং সমাজের শিক্ষিত নরনারীর জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে।

কালোটাকা নাটকে একটা অস্পষ্ট ত্রিমুখী প্রেমের দ্বন্দ্বও চিত্রিত হয়েছে; পরিতোষ বিজয়া আর সুমিত্রা—এদের প্রেমের প্রকৃতি পরস্পর বিপরীত;

নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদর্শগত বিরোধ তথা মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নাট্য চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করেছে।

চোরাকারবারী পরিতোষ অর্থ উপার্জনের ব্রতকেই জীবনের আদর্শ বলে মনে করে। অপর দিকে তারই পত্নী বিজয়া দেশপ্রেম ও মানবতার একনিষ্ঠ পূজারিণী। মন্বন্তর ও দারিদ্র্যের জ্বালায় দিশেহারা সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অন্ন চোরা-কারবারীদের পংকিল ষড়যন্ত্রে বাজার থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। পরিতোষ এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক। বিজয়ার স্বামী-প্রেম তাই বার বার ব্যর্থ হয়ে যায়। তার কাছে স্বামীর সংজ্ঞা অনেক গভীরে, সে পরিতোষকে বলে—'তুমি সত্যাশ্রয়ী হও, এ আমার অন্তরের কামনা, ···সত্যের সন্ধান পেয়ে সত্যবান রূপে তুমি আত্মপ্রকাশ কর, তুমি আমার খেলার সাথী নও।'

পরবশতার দিনে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে দেশের নেতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিলমালিক ও ক্রোড়পতি কারবারীদের কালোটাকা কাজে লাগিয়েছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র কেউই এই দানকে অগ্রাহ্য করেননি। মন্বন্তর ও যুদ্ধের বাজারে অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দেশের খুব কম জাতীয় নেতাদের রুখে দাঁড়াতে দেখা গেছে, সক্রিয় প্রতিরোধও তাঁদের ছিল না। পরিতোষের যুক্তি হল '···no means is too mean for a noble cause ডাকাতি করেই হোক, কি ব্ল্যাকমার্কেটিং বা প্রফিটীয়ারিং করেই টাকা সংগৃহীত হোক্ সৎ কাজে লাগালেই তা সার্থক হয়। আমার উপার্জিত টাকা আমি সৎ কাজে লাগাতে চাই। বিজয়া তা কেন নেবে না?'

বিজয়ার আদর্শবোধ ন্যায় ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। হাজার হাজার মানুষের মুখের অন্ন বঞ্চিত করে যারা বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে, তাদের মুক্তিযজ্ঞে অংশ গ্রহণের অধিকার নেই। দেশ হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের—এ দেশের মুক্তি সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা সম্পদের বিনিময়ে অর্জন করলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না।

বিজয়া: ···তোমার এবং তোমারই মতো লোকদের লাভের লোভেই লাখো লাখো লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মোলো। তাদের অতৃপ্ত আত্মা আজও প্রতিকার চাইচে জাতির মুক্তিব্রতদের কাছে, জাতির ভাগ্যবিধাতার কাছে। তোমাদের টাকা নিলে কেবল মৃতদের অপমান করা হবে না, পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে যে দরিদ্র অসহায় মানুষদের শোচনীয় মৃত্যু থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত

রাখবার ব্যবস্থা করা হবে, তাদেরও অপমান করা হবে।

শচীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের ধারণা বিজয়া চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। বিজয়ার দৃঢ়তা সত্যনিষ্ঠা সর্বোপরি তার উচ্চ আদর্শ আপসহীন শর্তে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আদর্শ চেতনা ও স্বামী প্রেমের দ্বন্দ্বে বিজয়ার আদর্শনিষ্ঠার জয় হয়েছে। একদিন পরিতোষের সংগে বিজয়ার স্বাভাবিক দাম্পত্য-প্রেম ছিল, তারপর এলো মন্বন্তর মহামারী যুদ্ধ আগস্ট-আন্দোলন—দু'জন দুই পথে চলে গেল। মন্বন্তরের দিনে চালের কালোবাজারি করে পরিতোষ প্রচুর অর্থ পেল। সম্পদ আহরণের নেশা তাকে পেয়ে বসল, অর্থকে সে ভাবলো পরমার্থ। তার কাছে ভালবাসা মিথ্যে অভিনয়, লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। অনাবিষ্কৃত সত্যের মরীচিকায় তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এমন হৃদয়হীন পুরুষের কাছে প্রেম-প্রীতি স্বার্থের ডোরে বাঁধা। পাশাপাশি বিজয়া চরিত্র বয়ে চলেছে সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে। বিজয়া পরিতোষের অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনকে কোন দিনই সমর্থন করেনি। স্বদেশী আন্দোলনের সে একজন সক্রিয় কর্মী, ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত। তারপক্ষে পরিতোষের মত একজন অর্থ-সর্বস্ব কালোবাজারীর সংগে জীবনযাপন দুর্বিষহ। অথচ হিন্দু নারীর সংস্কার থেকেও সে মুক্ত নয়। বিভ্রান্ত স্বামীর হৃদয় ও মনোবৃত্তি পরিবর্তনের আশাও সে রাখে। সে মনে করে পরিতোষ একদিন দুঃখের হোমানলে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। আর সে-কারণেই, চোরাকারবারির ঘৃণ্য অপরাধে যখন পরিতোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তার প্রেমিকা সুমিত্রা বিচলিত হলেও সে ছিল স্থির—'জেলে একদিন ওরা আমাকেও পুরে দিয়েছিল, আবার ছেড়েও দিল। ওকে যদি জেলে দেয়, জানব একদিন ত ছেড়ে দেবেই। ওর তাতেই ভালো হবে।'

বিজয়া চরিত্রের এই অনমনীয় সত্যনিষ্ঠা তাকে সাধারণ নারীর উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরিতোষের চরিত্র সম্পর্কে বিজয়ার মূল্যায়ন স্বাধীন ও স্পষ্ট, সেখানে নিজের স্বামী বলে কোন ক্ষমা নেই, আপসও নেই। নারী-প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্বলতাকেও সে জয় করেছে অনায়াসে।

বিজয়া : ...ও যে অপরাধ করেছে, তা একটা চোরের অপরাধের চেয়ে, একটা খুনের অপরাধের চেয়েও অনেক বড় অপরাধ।...টাকার ওপর যদি অত লোভ না থাকত, তাহলে ওর সাহায্যে অনেক লোককে বাঁচাতে পারতাম। ও যে

আমাকে ভালবাসে না বলেই সাহায্য করেনি তা নয়, আমার চেয়েও টাকাকে বেশী ভালবাসে বলেই আমার আবেদনে ও টাকা ছাড়তে পারেনি। ...আপনার চেয়ে আমার চেয়ে, সুখের চেয়ে, স্বস্তির চেয়েও ও টাকাকে ভালবেসেচে। এরকম লোক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলে সমাজের ভালো হয় না। তাই তাদের সমাজের শত্রু বলা হয়।...

বিজয়ার এই স্বামী-বিরুদ্ধতা আপাত দৃষ্টিতে খুব নিষ্ঠুর মনে হলেও, তার হৃদয়ে একটি কোমল স্থান আছে, যেখানে অনুতপ্ত মানুষের জন্য গভীর সমবেদনা এবং ভালবাসা বর্তমান। পরিতোষের জন্যও তার অন্তরে একটা আসন শূন্য পড়ে আছে, কিন্তু নিরন্ন বুভুক্ষ মানুষের রক্তে দুহাত রাঙা করে নয়, পূর্বকৃত অপরাধের অনুশোচনায় পরিশুদ্ধ হয়ে তাকে সেই আসন লাভ করতে হবে। বিজয়ার এই আদর্শ চেতনা স্বামীর বিপদের দিনেও তাকে অধৈর্য করে তোলে না, তার প্রেরণার মূল বিস্তৃত হয়েছে আপাত দুঃখের অন্তরালে, শুচিশুভ্র আত্মোপলব্ধির মধ্যে। স্বামীর গ্রেপ্তার এবং তার জেলবাসের সম্ভাবনায় বিজয়ার বিন্দুমাত্র বেদনা নেই। সে স্বপ্ন দেখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের, স্বাধীন ভারতবর্ষের সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থার। ততদিনে পরিতোষ তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে কারাবাস উত্তীর্ণ করবে, বিজয়া সেই পরম শুভ দিনটির অপেক্ষায় আছে।

বিজয়া ঃ সেই দিনের অপেক্ষাতেই আমি বসে থাকব। দেশ ততদিনে স্বাধীন হবে।...সেদিন সমাজে বঞ্চনা থাকবে না, শক্তিমানেরা দুর্বলদের শোষণ করে সম্পদ জমিয়ে তোলবার সুযোগ পাবে না। সেদিন একটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটলে সারা দেশ কেঁদে উঠবে, একটি শিশু শুকিয়ে মায়ের কোল থেকে ঝরে পলে সমগ্র রাষ্ট্র টলমল করবে।... সেইদিন স্বামীকে পাশে রেখে নতুন করে আমি জীবন শুরু করব—হয়ত এখানে না, হয়ত সুদূরে কোন পল্লীতে, হয়ত কোন কুটিরে।...

বিজয়া চরিত্রের আদর্শবোধ কখনও কখনও মূর্তিমতী জড়বিগ্রহের মত মনে হয়েছে। তাতে রক্তমাংসের নারী-প্রকৃতিও যেন উপেক্ষিত হয়েছে। সুমিত্রার সংগে পরিতোষের খোলাখুলি প্রণয় বিজয়ার মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। এ ত্রুটি নাট্যকারেরই আদর্শচেতনা সঞ্জাত। নাটকের শুরু থেকে শেষ অবধি বিজয়া আদর্শের ধ্বজা বহন করে চলেছে। তাই, নাটকের ক্ষেত্রে ত্রিমুখী প্রেমের একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকলেও কার্যত তা ব্যর্থ হয়েছে।

'বিজয়ার' মত'সাধনা'ও দেশাত্মবোধের প্রতিমূর্তি। এই স্বাধীনতা নাটকে 'সাধনা' জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় সাধনার প্রতীক। শচীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের নাটকগুলিতে একটা ভাবাদর্শ সর্বদাই সক্রিয় আছে। সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে দূরদৃষ্টি ও আদর্শচেতনার আলোকে শচীন্দ্রনাথ শেষজীবনে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন। এইসব নাটকে রাজনীতি সমাজনীতি আধ্যাত্মিক দর্শন এবং সবকিছুর উপর মানবতাবাদের আদর্শকে তিনি তুলে ধরেছেন।

স্বাধীনতা লাভের পর শচীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম 'এই স্বাধীনতা' নাটকখানি আদ্যন্ত রাজনৈতিক নাটক বলা যেতে পারে। ছিন্নমূল পূর্ববাংলার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, অন্যদিকে আদর্শচেতনা ও দেশগঠনের স্বপ্ন— সব মিলিয়ে নাটকখানির অন্তর্নিহিত সুর ও গতিবেগ উচ্চতারে বাঁধা আছে।

শচীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক নাটকগুলির মধ্যে 'এই স্বাধীনতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার নিজেই পূর্ববাংলার অধিবাসী ছিলেন। দেশ বিভাগের অভিশাপ থেকে তিনিও মুক্ত ছিলেন না। ছিন্নমূল হয়ে পশ্চিমবাংলায় বহু কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই অভিশাপ তাঁকে অনুসরণ করেছে। এই কারণে নাটকের কিছু কিছু দৃশ্য অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, অনুভূতির সূক্ষ্মতায় তা শিল্পরসোত্তীর্ণ হয়েছে। নাট্যকারের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর মানবতাবাদ ও ভাবাদর্শ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মুখ থেকে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাধনা দীপক দয়াল—পাত্র-পাত্রীদের এই সকল প্রতীক নামকরণের মাধ্যমে তিনি জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। সাধনা এ নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র।

'সাধনা'র মাধ্যমে নাট্যকার দেশব্রতীর আদর্শনিষ্ঠাকে তুলে ধরেছেন। নাট্যকারের ভাষায়—'এই 'সাধনা' জাতীয় প্রগতির সাধনা। জাতির সাধনায় পড়ে আঘাত—প্রেমের আদর্শে আঘাত, বঞ্চিতের ক্ষোভ থেকে আঘাত, মুসলমানের দাবী থেকে আঘাত, মনুষ্যত্বের সর্ববিধ অবমাননা থেকে আঘাত।……জাতির সাধনা 'সাধনা' অবিরাম শোনায় স্বাধীনতা স্বরাষ্ট্র মিথ্যা নয়, অভাব মানব অভ্যুদয়……।' সমগ্রভাবে একটা অধঃপতিত দুর্বলচিত্ত হৃতগৌরব জাতির সাধনাই 'সাধনা' চরিত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

এখানেও কালোটাকা নাটকের বিজয়ার মত সাধনার জীবনেও প্রেম ও দেশাত্মবোধের দ্বন্দ্বে দেশাত্মবোধই জয়ী হয়েছে। সাধনার সংগে অনিমেষের প্রেম দেশাত্মবোধের সংগে দৈহিক কামনার সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করেনি। অনিমেষ এককালে দেশের জন্য জেল খেটেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশসেবার পুঁজি নিয়ে চোরাকারবারে পশার জমিয়েছে। আদর্শের এমন শোচনীয় পরিণতি সাধনার কাছে দুর্বিষহ। সে এখন অনিমেষের প্রেমের দাবিকে অস্বীকার করে।

সাধনা ঃ ...তুমি অবিরাম অতীতের কারাবাসকে আর বাবার স্নেহকে কাজে লাগিয়ে চোরাকারবার নিরোধক আইনকে ফাঁকি দেবার সুযোগ করে নিচ্ছ।

অনিমেষ ঃ খোলসা করে বলইনা কেন, তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

সাধনা ঃ ঘৃণা করিনা, আঘাত পাই, প্রীতি দিতে গিয়ে প্রতিহত হই। সেজন্যেই আমার মন, আর সেই কারণেই আমার দেহও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়না।

সাধনার সংগে অনিমেষের একদা ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার স্থূল নীতিহীন দৈহিক কামনার পরিচয় পেয়ে সাধনা নিজেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু সেও যে রক্তমাংসের নারী, কামনাবাসনাকে সে অস্বীকার করেনা, তাই বলে সংকীর্ণ আদর্শহীন জীবনযাপন করাকেও সে কোনদিনই মেনে নেয়নি। অনিমেষের স্পর্শে সাধনার দেহ শিহরিত হলেও তার নৈতিক অধঃপতন তাকে সঙ্কুচিত করে তোলে। অনিমেষের বিবাহের প্রস্তাব সাধনা তাই অনায়াসে অগ্রাহ্য করে।

সাধনার জীবনে এল দীপক তার প্রদীপ্ত রূপ নিয়ে। জীবনের লক্ষ্য পথে তার সাহায্য চাইল সে। দীপকের মনে সংশয়। দেশবিভাগের বিষময় পরিণতির প্রত্যক্ষ শিকার দীপকের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তার দেশাত্মবোধের ধারণাকে অসার করে তুলেছে। সাধনা তার মনে আদর্শের পুনর্জাগরণ ঘটাতে চায়। যেকোন মূল্যের বিনিময়ে পেলেও সাধনার কাছে স্বাধীনতা হল বাস্তব সত্য, তাকে পূর্ণবিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য চাই দেশাত্মবোধের নিষ্ঠা। স্বদেশের মুক্তির পরেও মানুষের দুঃখ আর লাঞ্ছনা, মানবতার চরম অবমাননা দীপকের মত সাধনার অন্তরকেও পীড়িত করেছে। কিন্তু, দীপক যেখানে চরম হতাশগ্রস্ত, সাধনা তখনও বিশ্বাস করে জাতির এই অন্ধকারময় দুঃসময় কেটে গিয়ে নতুন সম্ভাবনার উষার আলো ফুটে উঠবে। যে পাপ অবিশ্বাস

সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বন্দ্ব ও সামাজিক বৈষম্য মানুষের সকলরকম 'পথের দাবী'কে অপূর্ণ রেখেছে, একদিন সেসব বাধা অপসারিত হবেই। দীপক সাধনার এই স্বপ্নকে অলীক কল্পনা ভেবে উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু পারে না। সাধনার অটুট বিশ্বাস পূর্ণ উপলব্ধির রূপে ফুটে ওঠে তার আচার-আচরণে, কথায় ও চোখেমুখে। সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে দীপককে আহ্বান জানায় দেশ ও জাতি গঠনের মহান কর্মযজ্ঞে।

সাধনা ঃ ...ইংরেজ দু'শ বছর ধরে যে পাঁক তৈরী করেছিল, আমরা এখনো তারই মাঝে পড়ে রয়েচি। মাইনরিটি, মেজরিটি, উন্নত-অবনত আমরা সবাই তাতে নিমজ্জিত। যেখানে যে মানবতা-বিরোধী মতবাদ শুনতে পাচ্ছেন, যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের আস্ফালন দেখচেন, জানবেন তা সবই পরবশ আমলের অভিশপ্ত মনের পরিচয়। সেই মনের দুয়ার জানালা আজ আমাদের সবলে খুলে দিতে হবে, যাতে করে নূতন আলো এসে আমাদের মনকে আলোকিত করে তুলতে পারে।

শুধু দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে নয় প্রেমজীবনেও সাধনা দীপককে অনুপ্রাণিত করেছে। বঙ্গবিভাগের দুঃখ তিক্ত অভিজ্ঞতা হতাশা তাকে যেমন আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তেমনি ব্যক্তিগত প্রেম-জীবনকেও তা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছিল। দীপকের প্রদীপ্ত যৌবন ও আদর্শনিষ্ঠার অকালমৃত্যুকে রোধ করার জন্য সাধনা প্রেমের শক্তি নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু স্পষ্ট আশ্বাস সত্ত্বেও তাকে দীপকের গ্রহণ করতে না পারার অক্ষমতা সাধনাকে পীড়া দিলেও সে হতাশ হয়নি। সাধনার প্রেম ও দেশাত্মবোধ মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা সত্যের মহিমায় উজ্জ্বল। তার কাছে দৈহিক মিলনটা কিছু নয়, মনের ও আদর্শের সংযোগসাধন প্রকৃত মিলনের তাৎপর্য বহন করে। বিবাহ অনুষ্ঠান ত একটা সামাজিক সংস্কার মাত্র।

সাধনা ঃ বিয়ে এমনই একটি অনুষ্ঠান, যা কেবল ঘটকদের আর অভিভাবকদের কল্পনাতেই অপরিহার্য থাকে। একের মন যখন অপরের মনকে টানে দৈহিক মিলন তখন তার তিথি নক্ষত্র পুরুতের মন্ত্রের অপেক্ষায় থাকেনা......

দীপক নিজে যেমন নরনারীর স্বাভাবিক আকর্ষণের মধ্যে তথাকথিত নৈতিকসংস্কার ভীতি লজ্জা এবং সংকোচ অনুভব করে, তেমনি মুসলমান যুবক জাহাঙ্গীরের প্রতি সহোদরা কেতকীর ভালবাসাকে সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে

পারেনা। সাধনা তার ভুল ভেঙে দেয়। জাতি ও বর্ণের বৈষম্য মানুষের অন্তরে যে হীনতা ও ক্ষুদ্রত্বের জন্ম দেয় তা থেকে মুক্ত না হতে পারলে মানবতা-বোধের এবং দেশাত্মবোধের উপলব্ধি থেকে সে চিরদিনই বঞ্চিত হবে। এখানে সাধনার দেশাত্মবোধের এক বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়েছে।

জাহাঙ্গীর ও কেতকী পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু জাহাঙ্গীর যখন কেতকীকে বিয়ে করে পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায় তখন কেতকীর দিক থেকে সে সাড়া পায় না। ধর্মীয় সংস্কার তখন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু নারী হয়ে মুসলমান যুবকের সঙ্গে বিয়ে কি করে সম্ভব—'শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢালতে পারুম না, মা দুর্গারে বরণ করতে পারুম না।' অথচ জাহাঙ্গীরের ভালবাসাকে সে মনেপ্রাণে স্বীকার করে, তাই—'মোছলমানকে যখন ভালবাইস্যা ফেল্‌চি, তখনই লাভের আশা ছাইড়া দিছি, জাইন্যা লইছি কাইন্দ্যা কাইন্দ্যাই মরতে হইব।' সাধনা কেতকীর মানসিক দ্বন্দ্ব অনুভব করে। সংস্কারের বাধা বড় তীব্র। কখনো কখনো একে স্বীকার করায় যেমন দুঃখ, অস্বীকার করায় ততোধিক যন্ত্রণা। কিন্তু জাহাঙ্গীর যখন কেতকীকে ভালবেসে সামাজিক সাম্যের দোহাই দেয়, সাধনা দীপকের মত তারও ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেয়।

কেউ যদি ভালবেসে ঘর ছাড়ে, অন্য কথা। কিন্তু সামাজিক সাম্য ও একাকারের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। মুসলমান নেতাদের পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে ছিল একাকারের প্রবৃত্তি, তাদের সাম্রাজ্যবাদী মন ও ধর্মান্ধতা। কিন্তু হিন্দু নেতারা কখনই হিন্দুস্তান দাবি করেনি, তারা বৈষম্যের মধ্যে সামাজিক সমতার কথা বলেছে। ভারতবর্ষের মাটিতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই স্ব স্ব ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। আর এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের সাধনা।

নাট্যকার সাধনা চরিত্রে ভারতীয় সাম্যের ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার সুর, বৈষম্যের মধ্যে সমতার সাধনাই সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী।

শচীন্দ্রনাথ মূলত জাতীয়তাবাদী নাট্যকার। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মার্কসীয় দর্শনে একদা আকৃষ্ট হয়ে নাটকের ক্ষেত্রে তা তুলে ধরলেও তার শেষ রক্ষা হয়নি। তিনি এ ধরনের নাটকের উপসংহারে জাতীয় ভাবাবেগ ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে মুখ্য করে দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষজীবনে তিনি নির্ভেজাল

ভারতের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটক রচনা করেছেন। এই স্বাধীনতা নাটকে এই জাতীয় ভাবনার তাৎপর্যই নাট্যকার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মহিম ও তাঁর কন্যা সাধনার মধ্য দিয়ে এবং দীপকের মধ্যে সেই চেতনার জাগরণে তা সফল হতে পেরেছে।

সাধনা চরিত্রে জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অবসর নেই। নরনারীর অন্তরের গভীর মনরহস্যের পরিচয় আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রে পাওয়া সম্ভব নয়, শচীন্দ্রনাথ সে চেষ্টাও করেননি। 'সাধনা' নাট্যকারেরই মানসী প্রতিমা। দ্বিজেন্দ্রলাল মেবার-পতন নাটকে 'মানসী'র মুখ দিয়ে যেমন গভীর তমসার মধ্যে মিলনের সংগীত শুনিয়েছেন তেমনি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে জাতি গঠনের প্রয়োজনে মানুষে মানুষে দ্বেষ হিংসা ভুলে চিত্তের দুর্বলতা গ্লানি ঝেড়ে ফেলে সেই পরম মহা-মিলনের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনাই 'সাধনা' চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শচীন্দ্র-নাথের জীবনদর্শন এই চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় অননুকরণীয় ভঙ্গিতে সাধনা চরিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—'সত্যদর্শীর অকম্পিত লেখনীমুখে তিনি মহত্ব কলুষ দীনতার কথাকে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এই মিথ্যার—এই অগৌরবের—এই বেদনার হতাশার হিমরাত্রির অন্তরালে দিগন্তের সূর্যকে আবিষ্কার করিয়াছেন ভারতবর্ষের সাধনা-বলে। এই সাধনাই তাঁহার নাটকের নায়িকা। এই সাধনাকে আমরা মোহে ভ্রান্তিতে স্বার্থপরতায়, বিভ্রান্ত হইয়া আজ আঘাতের পর আঘাত করিয়া চলিয়াছি, তবুও সেই সাধনাই আমাদের আহ্বান জানায়—অগ্রসর হয়ে চল। চরৈবতি।—পিছনে খসে পড়ুক সকল ভ্রান্তি, সকল মিথ্যা—সত্যের জয় হোক।'[১]

দেশদ্রোহী কুট ও কাপুরুষ চরিত্র

গৈরিকপতাকা নাটকে ঘোড়পুরে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ক্রুর ও খলচরিত্রের এমন 'টাইপ' শচীন্দ্রনাথের অন্য কোন ঐতিহাসিক নাটকে দেখা যায়

১. নতুন নাট্য আন্দোলন—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ জানুয়ারি ১৯৫০)

না। সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও কোথাও কোথাও মানবচরিত্রের ভয়ঙ্কর পরশ্রীকাতরতা স্বার্থপরতা ও নীচতা তার মধ্যে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতাও এই চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আলোচ্য চরিত্রটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। মেবারপতন নাটকের মহারাজ গজসিংহের সংগে এর মিল লক্ষ্য করা যায়। গজসিংহের মতই ঘোড়পুরে স্বজাতিদ্রোহী কাপুরুষ এবং পরবশপ্রিয়। রাজপুত জাতির কলঙ্ক এই দুই ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ না করেও বিধর্মীর বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা মজ্জাগত করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়ন এবং কার্য উদ্ধারের জন্য যাবতীয় অন্যায় উপায় অবলম্বন করা ঘোড়পুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শচীন্দ্রনাথ চরিত্রটি অঙ্কনের ব্যাপারে সম্ভবত মহারাজ গজসিংহের চরিত্রটি মনে রেখেছিলেন। কোথাও কোথাও ঘোড়পুরের মুখে গজসিংহের সংলাপের প্রতিধ্বনিও শোনা যায়।

তবে গজসিংহের তুলনায় ঘোড়পুরের চরিত্র চিত্রণে শচীন্দ্রনাথ অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত, গৈরিকপতাকা নাটকের বস্তুগঠনে ঘোড়পুরের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। গজসিংহের চরিত্র অঙ্কনে দ্বিজেন্দ্রলাল একজন দেশ ও স্বজাতিদ্রোহী কাপুরুষের ছবি এঁকেছেন মাত্র। কিন্তু ঘোড়পুরে তার চেয়েও বেশি সক্রিয়। এই অনৈতিহাসিক চরিত্রটি গৈরিকপতাকা নাটকের উপকাহিনীকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রণরাও ও বীরাবাঈ-এর উপকাহিনী নাটকের মূল কাহিনীর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে না হলেও ঘোড়পুরের ভূমিকা সমগ্র নাটকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে। শচীন্দ্রনাথ ঘোড়পুরেকে শিবাজীর মত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রতিপক্ষে একজন ক্রূর ও খলচরিত্র হিসাবে দাঁড় করিয়ে যুগপৎ স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহিতা এবং শিবাজীর মহত্ব ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা তুলে ধরতে চেয়েছেন। এখানে ইতিহাসনিষ্ঠাকে নাট্যকার সচেতনভাবেই গৌণ স্থান দিয়েছেন।

ঘোড়পুরের স্বজাতি ও স্বদেশ বিরোধিতায় নিছক যুক্তিহীন স্থূলচেতনা সক্রিয়। তার মধ্যে কোন নীতি ও যুক্তিবোধ নেই। কিছুটা গোলামীর অভ্যাস-বশেই এই বিরুদ্ধতা। খলচরিত্রের এরকম সহজাত অপরাধপ্রবণতা সম্ভবত শচীন্দ্রনাথ বিদেশী সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের প্রভাবে অংকন করেছেন। ঘোড়পুরের শিবাজীর প্রতি শত্রুতায় তাই কোন সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঘোড়পুরে ঃ হাঁ, আমি বন্ধু……ঘোড়পুরের প্রেত নয়, জীবন্ত ঘোড়পুরে,

শুনেলুম তুমি শিবাজীর সর্বনাশের আয়োজন করছ, তাই খুশি হয়ে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি বন্ধু। পর্বতের ওই মূষিককে যাঁতিকলে ফেলে মারতে না পারলে আমাদের কারুরই জীবন নিরাপদ নয়।

ঘোড়পুরের খল মনোবৃত্তি ও কাপুরুষতার সঙ্গে তার চরিত্রোপযোগী সংলাপ অপূর্ব সাযুজ্য রচনা করেছে। এই সংলাপ কখন কখন চতুরতাপূর্ণ ও বুদ্ধি-দীপ্ত হয়ে ওঠে। মনুষ্য চরিত্র ও মনস্তত্ত্বাভিজ্ঞ ঘোড়পুরের সহজাত অসত্যতা তাকে একজন 'আধুনিক' খলনায়কে উন্নীত করেছে।

সে শিবাজীর বিরুদ্ধে বীরাবাঈকে উত্তেজিত করে তার উদ্দেশ্যসাধন করতে চায়। কিন্তু যুদ্ধের বিপজ্জনক অবস্থানে না থেকে পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখে। মাহুর দুর্গের যুদ্ধে ঘোড়পুরে বীরাবাঈকে শেষ অস্ত্র রূপে ব্যবহার করে। সেসময় তার স্বগোক্তির মধ্যে এক ভীষণ ক্রূরধর্মী মনের পরিচয় নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলেন।

ঘোড়পুরে: দুর্গ থেকে এখন বার হওয়া ত সম্ভবপর নয়। কোন নিরাপদ স্থানে আত্মরক্ষা করি। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে আবার দেখা দেবো। ঘোড়পুরের অস্ত্র অসি নয়, বর্শা নয়, বন্দুক নয়, কামান নয় ঘোড়পুরের অস্ত্র ঐ বীরাবাঈ। ওকে সামনে রেখে লড়তে পারলে জীবনযুদ্ধে ঘোড়পুরেকে পরাজিত হতে হবে না।...

নারীর স্বাভাবিক সারল্যের সুযোগ নিয়ে তাকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সে নিজের উদ্দেশ্যসাধন করে। বাস্তব জীবনে এ ধরনের মানুষের ছলনা-অভিনয়ে থাকে অসাধারণ নৈপুণ্য। ঘোড়পুরের আর একটি নিম্নোধৃত সংলাপে তার ছলনাভিনয়-দক্ষতার সাহায্যে আত্মরক্ষার প্রয়াস চিত্রিত হয়েছে। মাহুরের দুর্গে ঘোড়পুরের জীবনের শেষ অধ্যায়। শিবাজী দুর্গ অধিকার করেছেন। ঘোড়পুরে বীরার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধ্বংসস্তূপের আশেপাশে। তার আশা বীরাকে খুঁজে পেলে তাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে, পুনরায় শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রস্তুত হবার জন্য। ঘোড়পুরের দুর্ভাগ্য, বীরাকে দেখতে পেলেও তার পরিচিত প্রতিশোধপরায়ণা বীরাকে আর পেল না। উপরন্তু, দেশপ্রেমিক নবীন সেনাপতি বীরার প্রণয়ী রণরাও-এর সামনাসামনি পড়ে সে গভীর আতঙ্ক অনুভব করে এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে রণরাও ও বীরা উভয়কেই তোষামোদ শুরু করে দেয়। এই জাতীয় চরিত্রের অন্তরে গরল এবং বাক্যে

অমৃত থাকে।

ঘোড়পুরে ঃ রণরাও, তুমি রণরাও ? বীরা মা। এই তোমার রণরাও ? আজ তোমাদের মিলন ঘটেছে। রণরাও, বন্ধু চন্দ্ররাওয়ের মৃত্যুর পর থেকে বীরবাঈকে আমি কন্যার মতোই পালন করে এসেছি। তোমার সাথে ওর এই মিলন দেখে আজ স্বর্গ থেকে বন্ধু আমায় আশীর্বাদ করছেন, দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন।

কিছুক্ষণ আগেও রণরাও ছিল তার পরম শত্রু। বিপদের মাঝখানে পড়ে সে সুচতুরভাবে শত্রুকেই ভজনা শুরু করে দেয়। কিন্তু ঘোড়পুরের বিদ্বেষ ও কূটমনোবৃত্তি কারও অজ্ঞাত থাকেনা। এইরকম পরিস্থিতিতে চরিত্রটি কোথাও কোথাও হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

সাধারণত খল-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার কপট আচরণ ; উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে বাইরে সরল ও সৎ মানুষের মত ব্যবহার করা। কোন অসতর্ক মুহূর্তে কিংবা বিপদের সম্মুখীন হলে তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে এবং খল ব্যক্তির স্ববিরোধী উক্তির মধ্যেই কিঞ্চিৎ হাস্যরসের স্ফুরণ ঘটে যায়। ঘোড়পুরের কপটতার মধ্যেও এই হাস্যরস বর্তমান। উপরের উদ্ধৃতিটি এর উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া, এই ধরনের সুযোগসন্ধানী চরিত্রের আস্ফালন ও কাপুরুষতা যুগপৎ চিত্রিত করেও নাট্যকার হাসির খোরাক যোগান।

প্রতাপগড় দুর্গে শিবাজীকে বন্দী করার ষড়যন্ত্রে সেনাপতি আফজল খাঁর সহযোগী হয়ে ঘোড়পুরে আশায় নিরাশায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ঘোড়পুরের চক্রান্তকারী মন অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পায়।

ঘোড়পুরে ঃ আঁধার যেমন নেমে আসছে, দুর্যোগ যেমন ঘনিয়ে উঠছে, তাতে এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় খাঁ সাহেব।

শিবাজীকে বন্দী করার স্বপ্নে মগ্ন হয়েও তার খল-চিত্ত একই সময়ে বলে ওঠে—'বন্দী করে বিজাপুর নিয়ে যাবার সময় উটের পিঠে চিৎ করে ফেলে রাখব।'

কিন্তু, চরম মুহূর্তে ঘনায়মান বিপদের গন্ধ পেয়ে ধূর্ত শৃগালের মত সে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। সে নিজের মনেই বলে—'যদি জানতে পায়, যদি চিনতে পারে আমি ঘোড়পুরে। নাঃ, কখনো ত দেখেনি, চিনবে কি করে ? ঘোড়পুরে। সিংহের গহ্বরে মাথা ঢুকিয়েছ, এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।'

উপরের পর পর তিনটি সংলাপে ঘোড়পুরের খল-চরিত্রের স্বরূপ ধরা পড়েছে। এই সংলাপ তিনটির মধ্যে তার খল-চিত্তের যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে

তাতে হাস্যরসের উপাদান বর্তমান। সাধারণ বাস্তব জগতে এই ধরনের মানুষকে বাইরে থেকে গুরুগম্ভীর ও ভয়ংকর মনে হলেও অন্তরজগতে সে ততই দুর্বল ও অসহায়! নাট্যকার ঘোড়পুরে চরিত্রের এই অসামঞ্জস্য রূপ তুলে ধরে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

শচীন্দ্রনাথের স্বাধীনতাপরবর্তীকালের রচনা বাংলার প্রতাপ নাটকের 'সনাতন' ঘোড়পুরের মত ধূর্ত কূট চরিত্র না হলেও দেশদ্রোহিতায় ও কাপুরুষতায় তারই সমগোত্র। সনাতন রাজা বসন্ত রায়ের বয়স্য বা ভাঁড়। আবার সমবয়সী বন্ধু বলে বসন্ত রায়কে সে বসন্ত বলেও ডাকে। তাকে তোষামোদী করতে আর ছোট রাজার মনকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে চালিত করতে দেখি প্রথম দিকে। বিদেশী শত্রু মগ ফিরিঙ্গি পর্তুগীজ দস্যুদের সঙ্গে প্রতাপের বিরোধকে সে পছন্দ করেনা। অর্থলোলুপতা তাকে নীচ ঘৃণ্যজীবে পরিণত করেছে। অর্থের জন্য সে নিজের তৃতীয়পক্ষের যুবতী স্ত্রীকে ভয়ংকর পর্তুগীজ জলদস্যু কার্ভালোর হাতে তুলে দিতে সঙ্কুচিত হয় না। সোনার মোহরের লোভে শত্রুকে পলায়নের গোপন রাস্তা দেখিয়ে দেয়। রাজ্যের গোপন খবর পাচার করে। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের দ্বন্দ্ব বাধাতে উৎসাহ দেয়। কার্ভালোকে জানায় আত্মীয় দ্বন্দ্বের সংবাদ। প্রতাপের নেতৃত্বে দেশ যখন মগ ও পর্তুগীজদের আক্রমণের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে, সনাতন নির্লজ্জভাবে পর্তুগীজের ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। তার ধারণা ছিল প্রতাপ সসৈন্যে পর্যুদস্ত হবে; তাই শত্রুপক্ষের ছদ্মবেশধারণ।

সনাতন চরিত্রে ঘোড়পুরের মত তীক্ষ্ম সুচতুর খল মনোবৃত্তি নেই। স্থূলে হাস্যরস সৃষ্টিকারী একজন অপদার্থ ভীরু গ্রামীণ বয়স্য। বস্তুত, সনাতনের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মূলে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও ভীরুতা। নাট্যকার চরিত্রটিকে একটা প্রতীক হিসাবেও গ্রহণ করেছেন মনে হয়। সকল জাতির মত বাঙালীর মধ্যেও একশ্রেণীর দুর্বলচিত্ত লোভী কাপুরুষ যুগে যুগে নিজের দেশমাতাকে বহিঃশত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছে। স্বজাতি ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে আপন আপন স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে। সনাতন চরিত্রাংকনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতার কথাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জাত্তের (জাতপান্ত) নামে বজ্জাতি যেমন, তেমনি ভন্ডামীও বাঙালীর

কম ছিল না। আসলে জাতটা (কৌলিন্য) তখন রৌপ্য-কাঞ্চন মূল্যে কেনা যেত। পয়সা থাকলে প্রতিপত্তি থাকলে ওসব নিয়ে কেউ ভাবে না। সনাতনও সেটা বোঝে।

সনাতন ঃ আমার বাড়িতে তুমি থাকলে আমার যে জাত যাবে বোম্বেটে বাবা।

কার্ভালো ঃ জাত!

সনাতন ঃ হাঁ বোম্বেটে বাবা জাতপাত হবে। কেউ আমার বাড়ি আসবে না, হাতের জল খাবে না, যজমান শিষ্যেরা গায়ে থু থু দেবে।

কার্ভালো ঃ লেবে নজরানা ?

সনাতন ঃ দেবে বোম্বেটে বাবা, দেবে ?

কার্ভালো ঃ লিয়ে যাও। (তাহার হাতে ঢালিয়া দিল) আমার কাম করবে ত আউর মিলবে।

সনাতন ঃ সব কিছু করে দেব বোম্বেটে বাবা। কাদুকে চাও তাও দোব। দুটো বউ গেছে, না হয় এই তিনেরটাও যাবে। মোহর থাকলে বউয়ের ভাবনা কি ? তা কি কাজ করতে হবে বোম্বেটে বাবা ?

কার্ভালো ঃ আমি এখন চলিয়ে যাব।

সনাতন ঃ তাই এসো বোম্বেটে বাবা। তোমার বাড়ি, তোমার ঘর যখন ইচ্ছে আসবে বইকি ?

স্বদেশ যখন শত্রু-আক্রমণের সম্ভাবনায় বিপদগ্রস্ত, সনাতন তখন আত্মীয়-বিবাদে ইন্ধন যোগাচ্ছে। মনে সন্দেহ আর স্বার্থের বীজ বপন করে পিতৃব্য-পুত্র গোবিন্দকে প্রতাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছে।

গোবিন্দ ঃ জান ত বাবাকে আমরা কেমন ভয় করি।

সনাতন ঃ আর ভয় করতে হবে না।

গোবিন্দ ঃ কি বলচ তুমি ?

সনাতন ঃ বলচি নির্বিষ সাপকে আর ভয় করে লাভ কি। তোমার বাবা আর জ্যাঠা এখন আর যশোরের অধীশ্বর নন। তাঁরা আমারই মতো নবীন যশোরেশ্বরের সামান্য প্রজা।

গোবিন্দ ঃ নবীন যশোরেশ্বর! কে তিনি ?

সনাতন ঃ মহারাজ প্রতাপাদিত্য।

সনাতন চরিত্রে প্রচুর হাস্যরস আছে। স্থূল রুচি ও স্বার্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের হাস্যরস যেমনটি হওয়া উচিত। কখনো আত্মরক্ষার তাগিদে কখনো তোষামোদের সুরে এই হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়। এতে কোন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিফলন নেই; আছে অমার্জিত গ্রাম্যরসিকতা। তাই সনাতন চরিত্রটিকে হাস্যরসাত্মক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, যেহেতু এই ধরনের চরিত্র একটা জাতির ও স্বদেশের অগ্রগতির পথে বিঘ্নস্বরূপ, সেজন্য কেবলমাত্র হাস্যরসাত্মক বললে একে হাল্কা করা হবে। এই ধরনের সর্বনাশা দুর্বল চিত্ত মানুষই যুগে যুগে দেশ ও জাতির জীবনে আনে ভয়ংকর বিপদ, পরাধীনতার শৃংখল, অত্যাচারীর ঔদ্ধত্য। এই জন্য সনাতন দেশদ্রোহী ও কাপুরুষ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

সনাতন চরিত্রের দুর্বলতা গ্রাম্যতা আমাদের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি করে। খল চরিত্রের কূট প্রবণতায় যে দৃঢ়তা থাকে তা তার মধ্যে একেবারেই নেই। ফলে এই মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ চরিত্র কঠোর শাস্তিরও অযোগ্য বিবেচিত হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাকে দেশদ্রোহিতায় ও রাজদ্রোহিতায় অভিযুক্ত করেও শেষপর্যন্ত মুক্তি দেন।

কর্তব্যপরায়ণ চরিত্র

কর্তব্যপরায়ণতা মনুষ্য চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। আইন ও বিধিনিষেধ রচনা করে কোন মানুষকে কর্তব্য সচেতন করা যায় না যদি তার পেছনে সেই ব্যক্তির সরল বিশ্বাস ও আন্তরিক শুভেচ্ছার অভাব থাকে। সর্বদেশে সর্বযুগে ইতিহাসে ও সাহিত্যে কিছু অসাধারণ চরিত্র দেখা যায়। তারা মনুষ্যত্বের চরম উৎকর্ষ দেখিয়ে দেবত্বের মহিমায় ভাস্বর হয়েছে—তাদের কাছে স্বার্থ বলে কিছু নেই, পরার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ইতিহাসে এমনি এক মহিয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলকে দেখা গেছে এবং সাহিত্যে প্রভুভক্ত কর্তব্য পরায়ণ বালক ক্যাসাবিয়াঙ্কা এবং শিষ্য উপমন্যুকে দেখেছি।

রাজস্থানের ইতিহাসে ধাত্রীপান্নার কাহিনীটি গভীর কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ। রাজ পরিবারের অনেক ধাত্রীদের মধ্যে একজন সে। কুমার বালক উদয়সিংহের পরিচর্যার দায়িত্ব তার ওপর। পান্না নিজের পুত্র কনককান্তি ও কুমার উদয়সিংহের লালনপালনের কর্তব্য একসঙ্গেই সম্পন্ন করে। তারপর চলে

চরম মুহূর্তটি তার জীবনে এল যখন কর্তব্যনিষ্ঠার এক সুকঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হল।

কর্তব্য যদি নিছক করণীয় কর্ম হিসাবে দেখা দেয়, তবে তার মধ্যে মহৎ কিছু আশা করা যায় না। আবেগ অনুভূতির দ্বারাই তাতে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব, আর তখনই সেই কর্তব্যবোধে আসে পূর্ণতা। পান্নার কর্তব্যবোধের মধ্যে আছে দেশপ্রেমের আবেগ। চিতোরের দুঃসময়ে এই কর্তব্যবোধের প্রয়োজনীয়তা এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে যা পান্না চরিত্রের সবচেয়ে বড় গৌরবের দিক। ইতিহাসের পান্না একজন কর্তব্যনিষ্ঠ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না ধাত্রী, পুত্রের জীবনের বিনিময়ে যে দেশের ভবিষ্যৎ রানার প্রাণরক্ষা করেছিল।

মানুষের বাইরের রূপটাকে ধরে রাখে ইতিহাস, তার অন্তরের খবর চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে যায়। কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠ ধাত্রীর সেই অজ্ঞাত রহস্যময় হৃদয়ের দ্বার উম্মোচন করলেন নাট্যকার। তিনি পান্নার মধ্যে মানবী-মা এবং বিশ্বজননী রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। মানবী-মা'য়ের দুঃখ হতাশা প্রতিশোধস্পৃহা কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি তার অপরিসীম ক্ষমা ধৈর্য ত্যাগ দেবী-মহিমায় উজ্জ্বল করেছে।

১ অঙ্কেই ধাত্রীর কর্তব্যবোধ পান্নাকে জাগ্রত করে অসাধারণ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু মানবী-মায়ের এই কর্তব্যবোধ শুষ্ক হৃদয়ের কাঠিন্য নয়, হৃদয়বিগলিত বাৎসল্যে আপ্লুত। কনক এবং উদয় দু'জনেই সমভাবে তার পুত্রস্নেহে লালিত। এমনি এক আদর্শময়ী মায়ের সামনে কঠিন পরীক্ষা— উদয় ত কেবল পুত্রের মত নয়, তার ওপর ন্যস্ত একটা বিপদগ্রস্ত দেশ ও জাতির আশাভরসা ; অন্যদিকে প্রাণাধিক গর্ভজাত পুত্র কনককান্তির প্রতি অপরিমেয় মাতৃস্নেহ। পান্না দু'জনকে নিয়ে পালিয়ে গেলে উভয়েরই সাময়িক জীবনরক্ষা হতে পারত। কিন্তু বনবীরকে ফাঁকি দেওয়া যেত না। সহায়-সম্বলহীনা পান্না উচ্চাকাঙ্ক্ষী বনবীরের দৃষ্টি এড়িয়ে রাজ্যের বাইরে কোনমতেই নিয়ে যেতে পারত না।

সুতরাং কনককে বলি দিতে হল বনবীরের খড়্গমুখে। নাট্যকার এই হত্যা দৃশ্যে মানবী-মায়ের হৃদয়-দ্বন্দ্ব আকুলতা রুদ্ধ আক্রোশ হতাশা কি বিচিত্র রূপেই না পরিস্ফুট করেছেন! বনবীর উদয়-ভ্রমে কনককে হত্যা করতে উদ্যত হলে পান্না কাতর অনুনয় দ্বারা তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল। বনবীরের

তীক্ষ্ন কৃপাণের সামনে তার মাতৃহৃদয় এক দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে। সম্বৃত চিত্তে যতদূর সম্ভব দ্ব্যর্থক সংলাপে সে মায়ের কাতরতা ও সন্তানহারানোর বেদনা প্রকাশ করেছে।

বনবীর : তোমার আর দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হবে না। আমি এমন কাজ করতে এসেচি যার ফলে উদয়ের ঘুম আর ভাঙবে না।

পান্না : কিন্তু সে যদি 'মা' বলে আমায় না ডাকে তা'হলে আমার মাতৃহৃদয় যে শান্ত হবে না। তুমিও ত মায়ের ছেলে। মায়ের স্নেহ তুমিও পেয়েচ।

দৃশ্যের শেষে চরমতম মুহূর্ত। এখানে পান্নার গভীর আকুলতা ও হাহাকার প্রকাশ পেলেও সে চেতনা হারায়নি, ভবিষ্যৎ দায়িত্ববোধে সদাজাগ্রতা এই রমনী অসামান্য হৃদয় বলে নীরবে সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করেছে।

বনবীর : তুমি ওর মা নও!

পান্না : আমি ওর মা নই!

বনবীর : বেতনভোগী ধাত্রী মাত্র।

পান্না : ধাত্রী! কিন্তু ধাত্রীরও তো স্নেহ থাকে মায়া থাকে, মাতৃত্ব থাকে!

বনবীর : ......দাও, দাও আর সময় নষ্ট করো না।

পান্না : আমি দোবনা। ছেড়ে দিতে আমি পারব না।

উদয়রূপী কনককে হত্যার পূর্ব-মুহূর্ত। মৃত্যুর হাত থেকে সন্তানকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা যখন ব্যর্থ হতে চলেছে, মাতৃহৃদয়ের রুদ্ধ আক্রোশ অপরিসীম ঘৃণায় ফেটে পড়েছে। সে তখন বনবীরের মায়ের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে তাকে আঘাত করল। ঠিক সেই মুহূর্তে, মাতৃনিন্দায় উত্তেজিত বনবীর কনক ও পান্নাকে একসঙ্গে হত্যা করতে উদ্যত হলে, পান্না তার ভুল বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ কনককে ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে। তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ পুনরায় জাগ্রত হয়। তার উপর মেবারের ভবিষ্যৎ রানাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং উপযুক্ত করে তুলবার এক সুকঠিন দায়িত্ব, সুতরাং নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও তাকে বেঁচে থাকতে হবে। পান্নাকে দূরে সরে দাঁড়াতে দেখে বনবীর তীক্ষ্ন বিদ্রূপ বাক্যে তাকে বিদ্ধ করে।

বনবীর : তোমার মাতৃত্বও তোমাকে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে শিশুকে বাঁচাবার প্রেরণা দিল না পান্না। নিজের সন্তান হলে কি দূরে সরে দাঁড়াতে

পারতে ?

নাট্যকারের এই সময়োপযোগী মূল্যবান সংলাপটি ধাত্রীপান্নার গৌরবময় আত্মত্যাগের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছে। সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে অসাধারণ অনেক ঘটনা ঘটে যায় এই পৃথিবীতে, তার কে খোঁজ রাখে। পান্নার হাহাকার সত্যের অংগীকারে মূর্ত হয়ে ওঠে।

পান্না ঃ ভগবান একলিংগ জানেন কেন আজ মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চাই না……কোন মাকে কখনো যা করতে হয়নি, তুমি আজ আমাকে দিয়ে তাই করিয়ে নিলে।……

পান্না নাটকের প্রথম দিকে রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত মানবী চরিত্র। আবার এই মানবী দেবীর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নাটকের পরিণতি দৃশ্যে। কিন্তু, নাট্যকারের প্রতিভাগুণে পান্নার এই রূপান্তর কোন অসংগতি-দোষে দুষ্ট হয়নি। খুব স্বাভাবিকভাবেই কাহিনীর ঘটনার সংগে চরিত্রের ক্রমবিকাশে পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে।

নাটকের শেষ দৃশ্যে পান্নার প্রবেশ। প্রথমে সে বনবীরের সামনে দাঁড়িয়ে তার কটিবন্ধ থেকে ছোরা তুলে নেয়। সামনে পুত্রহন্তা। পুত্রহারা মায়ের দুচোখে নীরব অভিযোগ, তীব্র প্রতিহিংসার শিখা। চিতোরের সর্দারগণ বনবীরকে সিংহাসনচ্যুত করে উদয়সিংহকে রানা করে বসিয়েছে। আজ বনবীর ও তার মা শীতলসেনীর বিচারের দিন। যদিও বনবীর ভীত নয়। কিন্তু, চম্পার কাতর অনুনয় পান্নাকে বিচলিত করে। বনবীরের নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনআচরণ সত্ত্বেও তার জন্য চম্পার ক্ষমা প্রার্থনা, নির্ভীক দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি বনবীর ও পাশে সন্তানের মৃত্যু-ভয়ে শংকিত মাতাব ব্যাকুলতা পান্নাকে এক 'দিব্য-অনুভূতি'তে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার ভেতর প্রতিহিংসা পরায়ণা নারীর পরাজয় ঘটিয়ে চিরন্তন জননীর ক্ষমাসুন্দর মূর্তি ফুটে ওঠে। এ জননী সাধারণ রমণী নয়; বিশ্বব্যাপী তার করুণা অমৃত নির্ঝরের মত সর্বদা কল্লোলিত। বনবীরকে পান্না আবেগের সংগে তাই বলে ওঠে—'তুমি মা নও, তাই মায়ের কোল থেকে পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছিলে। কিন্তু মা আমি মায়ের বুকের সন্তানকে দন্ড দোব কেমন করে……।'

পান্নার দেবীচরিত্র অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যখন দেখি শীতল-সেনীকে দন্ডাদেশ দেওয়ার জন্য সর্দার কর্ণজী অনুরোধ জানালে পান্না তা

প্রত্যাখ্যান করে।

পান্না ঃ ……কোন মাকে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করতে আগে কখনো আপনারা আদেশ করেননি। দন্ডদেবার নির্ম্মমতা মা ছাড়া আর কাউকে ত ব্যথা দেয় না। দন্ড নয় মমতা, মেবারের সর্দারগণ, মমতা ঢেলেই মায়েরা এতটুকু মাংসপিন্ডকে মানুষ করে তোলে, দন্ড দিয়ে না।

নাটকের শেষে নাট্যকার পান্নাকে সর্বকালীন মায়ের আদর্শরূপে চিত্রিত করেছেন। তার দেশপ্রেম কর্তব্যনিষ্ঠা সদ্যজাগ্রত মাতৃত্বের গৌরবের কাছে গৌণ হয়ে যায়। শচীন্দ্রনাথ ধাত্রীপান্নার কঠোর দেশাত্মবোধের ধারণায় স্নেহশীতল ও ক্ষমাময়ী শাশ্বত জননী-মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে মহাগৌরবশালিনী করে এঁকেছেন।

একেবারে পরিণতি দৃশ্যে, পান্নার বিদায়ের ক্ষণটিকে নাট্যকার আরো করুণ করে তুলেছেন। এক বিরাট দায়িত্ব ও নির্মম কর্তব্য সম্পন্ন করে পান্না ঠিকানা-হীন অজানাপথে যাত্রা করছে এবং 'অঘটনঘটনপটিয়সী' সকল দুষ্কর্মের নায়িকা শীতলসেনীকে সে ক্ষমা করে যাত্রাপথের সঙ্গিনী করে নিয়েছে। পান্নার লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা 'অজানা দেশ অচেনা পথ'-এর কথা উল্লেখ করে সম্ভবত নাট্যকার তাকে দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ করে রাখতে চাননি। মানবী-মা বিশ্বজননীতে রূপান্তরিত হয় তার ক্ষমা অহিংসা ও ত্যাগের জয়গান গেয়ে।

ধাত্রীপান্নার কর্তব্যবোধের উৎস যদি দেশাত্মবোধ, জননী নাটকে নিখিলের কর্তব্যবোধের প্রেরণা তার প্রেম। পান্নার কর্তব্যবোধে ছিল তার পেশাগত সততার প্রভাব ; পক্ষান্তর নিখিলের কর্তব্যবোধ প্রেমিকার প্রতি গাঢ় অনুরাগের প্রতীক। সে মায়ার বাল্যের খেলার সাথী, যৌবনের বন্ধু। তরুণী মায়াকে সে ভালবাসে। কিন্তু মায়ার জীবনে ঘটে গেছে এক চরম বিপর্যয়। মুহূর্তের ভুলে সে আজ অবৈধ সন্তানের জননী। তাকে বিপদের মাঝখানে ফেলে রেখে দুর্ঘটনার নায়ক আত্মগোপন করেছে। সমাজ-সংসার তাকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু ত্যাগ করেনি নিখিল।

কেউ কেউ বলেন বাল্যের প্রেমে থাকে অভিশাপ। হতে পারে। ঘটনার প্রভাবে এই প্রবচন কারো কারো জীবনে বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। নিখিলের জীবনেও

প্রেম শান্তি আনেনি। দুঃখ তার নিদারুণ অভিশাপের মত সারা জীবনের সঙ্গী হয়েছে। নিখিল মায়াকে স্ত্রীরূপে পেতে চায়, মায়ার অপরাধের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সমাজে স্বীকৃতি দিতে চায়। কিন্তু বাধা মায়ার সন্তানের পিতৃপরিচয়—এর চেয়েও বড় বাধা মায়ার সংস্কার। মায়ার একটু-খানি উদারতায় হয়ত এই জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারত, কিন্তু মায়া চায় তার সন্তান সঠিক পিতৃপরিচয়ে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হোক। নিখিলের সরল অন্তঃকরণ এই দাবির যৌক্তিকতাকে শেষপর্যন্ত অস্বীকার করতে পারে না।

নিখিল ঃ একান্ত স্বার্থপরের মতো আমি শুধু নিজের সুখের কথাই ভেবেছি। তোমার সন্তানের কথা তো একবারও আমার মনে হয়নি। তুমি সত্য বলেছ, মায়া। ভিন্ন কোন পুরুষকে তুমি আত্মদান করতে পার না। আমরণ তোমাকে তারই জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

নিখিলের এই বলিষ্ঠ আত্মসমালোচনা এই সরল উদারতা তার কামনা-কলুষমুক্ত নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিচয়। মায়াকে না পেয়ে নিখিল তাকে ত্যাগ করেনা, উপরন্তু সারাজীবনের অটুট বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়। শুধু তাই নয়, ঘটনাচক্রে মায়ার জীবনে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী প্রেমিকের যখন পুনরা-বির্ভাব ঘটল এবং আর এক মারাত্মক ভুলের খেসারত দিতে তাকে জেলবাসের শাস্তি পেতে হল, সেসময় মায়ার অবৈধ সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে নিখিল তার বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি পালন করেছে।

নিখিলের সারা অন্তর জুড়ে প্রেমের মহিমা। প্রেমের জন্য সে নিজের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও বিসর্জন দিয়েছে। এক সুকঠিন কর্তব্যবোধে তার প্রেমিকার অবৈধ, অন্যের ঔরসজাত সন্তানের প্রতিপালনের ভার মাথায় তুলে নিয়েছে সে। জগতে কিছু অসম্ভব নয়, তবে এ ধরনের চরিত্রও খুব বেশি দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হলেও, এইসব বিরল চরিত্র গল্প উপন্যাস ও নাট্যকাহিনীর উপজীব্য হতে অসুবিধে নেই।

নিখিলের কর্তব্যপরায়ণতা এক গভীর তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে যার উৎস প্রেম। অবশ্য এই চরিত্রের আর একটি দিকও আছে। সে পরোপকারী। পাড়া-প্রতিবেশীদের যেকোন বিপদে অভাব অভিযোগে সে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তার এই উপচিকীর্ষা প্রেমিকার অবৈধ সন্তানের দায়িত্বভার গ্রহণে প্রেরণা

যুগিয়েছে।

এরপরই তার জীবন সন্তান পালনের জটিল কর্তব্যের বোঝায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়। মায়ার ছোট্ট খোকা এখন যুবক। নাম অজয়। সে জানতে পেরেছে নিখিল তার পিতা নয়। অজয় পিতৃপরিচয় জানার জন্য নিখিলের প্রতি নির্দয় হয়ে ওঠে।

নিখিল : যেদিন থেকে ওর মনে প্রশ্ন জেগেছে ও কার ছেলে, সেইদিন থেকে ও আমাকে আর শ্রদ্ধা করে না, ভালবাসে না, সন্দেহের চোখে দেখে। রোজই ও জানতে চাইছে ওর বাবা কে, সে কোথায়, আর জবাব পাচ্ছে না বলে ওর মন বিষিয়ে উঠেছে। আমি জানি একদিন ও ক্ষেপে উঠবে আর সবার আগে আমাকেই ও হত্যা করবে।

প্রতিমুহূর্তের এই নিদারুণ যন্ত্রণা নিখিলকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। তবু নির্মম কর্তব্য ও দায়িত্বভার থেকে তার মুক্তি নেই। সে মায়াকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, জীবিতকালে তা ভঙ্গ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই নিরুপায় অবসন্ন ও হতাশ সুরে সে বলে ওঠে '......এমন করে পরের বোঝা আর কতকাল আমি বইব, কতকাল ?'

হয়ত নিজের কাছে না রেখে বোর্ডিং বা হোস্টেলে পাঠিয়ে সে অজয়কে লেখাপড়া শেখাতে পারত, তা'হলে এই যন্ত্রণার কিছু লাঘবও হত—উকিল বন্ধু এই পরামর্শ দিলে নিখিল তা কোনমতেই মেনে নিতে পারে না। তার কাছে এই ভার শুধু শুষ্ক দায়িত্ব মাত্র নয়। এর পেছনে রয়েছে মানবতার উচ্চ আদর্শ। দুঃখ যন্ত্রণা এর স্পর্শে সুসহ হয়ে যায়।

নিখিল : তুমি কি আমাকে একটা চলমান যন্ত্র বই অন্য কিছু ভাবতে পার না ? ভাবতে কি পারনা যে কেবল কর্তব্য পালনের জন্যই নয়, ভালবাসি বলেও ওকে আমি কাছে রাখতে চাই।

নাটকের শুরুতেও নিখিলের মুখে এই একই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। মাত্র কয়েকটি কথায় তার পরহিতবোধের স্বরূপটি ফুটে উঠেছে।

নিখিল : ......সবাই আমাকে মহৎ বলে, উদার বলে ভুল করে। ভুল করেই আমাকে দূরে সরিয়ে রেখে দেয়। আমি কারু শ্রদ্ধা চাইনে। আমি চাই সকলে আমার স্বরূপের পরিচয় পাক। শ্রদ্ধা নয় মায়া নয়, স্নেহ, ভালবাসা, মানবতার একটু স্পর্শ পেতে চাই।

এই কারণেই মায়ার তুলে দেওয়া কঠিন বোঝা বহন করার নৈতিক শক্তি নিখিল অনেক আগেই অর্জন করেছে। যত দুর্বিষহই হোক সে দায়িত্ব পালনের মধ্যে তার সচেতন আদর্শ সক্রিয় আছে বলে তা থেকে নিখিলের আমরণ মুক্তি নেই।

নাটকের কিছু কিছু স্থানে নিখিলের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব খুবই সুস্পষ্ট। সেখানে সে কর্তব্য স্থির করতে পারছে না, জীবনে জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি হয়েছে তার। নাটকের শুরুতে মায়া নিখিলের প্রেম নিবেদনে সাড়া দিলেও বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দেয় না। যে দুরপনেয় কলঙ্কের ডালি তার জীবনে অনড় হয়ে আছে তা থেকে মুক্তি পেতে গেলে সেই নির্মম প্রবঞ্চক পুরুষকে ফিরে পাওয়া দরকার।

নিখিলের প্রত্যাশার সঙ্গে মায়ার জীবনের সমস্যার দারুণ দ্বন্দ্ব বেধে যায়। নিখিলের মনে হতাশা ও অন্তদর্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে নৈতিক চেতনার কাছে সে নতি স্বীকার করে।

নাটকের শেষ দিকে অজয়ের পিতৃপরিচয় অনুসন্ধানেও তার মনে আর একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সত্য পরিচয় প্রকাশে মায়ার কাছে সে বিশ্বাসভঙ্গের কারণ হতে পারে, আবার অপ্রকাশে অজয়ের নির্মম প্রতিশোধস্পৃহাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে—এই টানাপোড়েনের মাঝখানে নিখিল অজয়ের জীবনের শূন্যতার জন্য নিজেকে দায়ী করে এবং তার বিপুল সম্পত্তি অজয়ের নামে উইল করে দূরে চলে যেতে চায়।

অবশেষে একদিন অজয় তার পিতৃপরিচয় জানতে পারল। এই চরম উত্তেজনার মধ্যে মাতাপুত্রের মিলনও সাধিত হয়। এবার নিখিল তার দীর্ঘ কর্তব্য সমাপনান্তে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত। বিপুল দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি পেয়ে নিখিল বহু দূরে চলে যেতে চায়, কিন্তু দৈব প্রতিকূল। মিলনানন্দের আবেগ সহ্য করার ক্ষমতা মায়ার ছিল না। সুদীর্ঘ শোক-দুঃখের অবসান হয় তার অকস্মাৎ মৃত্যুতে। ভাগ্যের এমনি পরিহাস মায়ার এই মৃত্যু নিখিলের কর্তব্যের বোঝাকে এতটুকু হাল্কা না করে তা আরো বৃদ্ধি করল। তার শোকাহত বিমূঢ় নিশ্চল ছবি এঁকে বোধকরি নাট্যকার সেই কথাই বলতে চাইলেন।

হাস্যরসাত্মক টাইপ চরিত্র

টাইপ বা বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করে যেসব হাস্যরসাত্মক চরিত্র আজ পর্যন্ত বাংলা নাটকে চিত্রিত হয়েছে তার প্রধান উৎস শেকসপীয়র ও তাঁর সমসাময়িক বেন জনসন। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক বা কঞ্চুকীর সংগে এর ঠিক তুলনা হয় না। বেন জনসনের মতে নাটক কেবল দর্শকের আনন্দদানই করবে না, তার সংগে সংগে নীতি-শিক্ষার কার্জটিও সম্পন্ন করবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি নাটকে বিশেষ এক ধরনের চরিত্র অংকন করেছিলেন যাদের কাজ হল উপদেশ দান। মনুষ্য চরিত্রের লোভ আরামপ্রিয়তা শ্রমবিমুখতা আদি-দুর্বলতা প্রভৃতি আপাত নিন্দনীয় গুণগুলি ঐসব চরিত্রে আরোপ করে তিনি দর্শকের কাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে হাস্যরসের প্রধান ভূমিকা আছে। ট্রাজেডির ক্ষেত্রে এইসব টাইপ চরিত্র 'কমিক রিলিফ'-এর কাজ করে। চরিত্রগুলি অতিরঞ্জনের ফলে কিছুটা অবাস্তব হয়ে পড়ে। বাংলা নাটকে এই ধরনের চরিত্র সাধারণত নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের দোষগুণ ও অসংগতিকে কখনো বিশুদ্ধ 'হিউমার' অথবা তীক্ষ্ন 'স্যাটায়ারে'র সাহায্যে তুলে ধরে হাল্কাভাবে প্রকাশ করে। শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে হাস্যরসের একটি বিশেষ স্থান আছে। হাস্যরসাত্মক চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতাও প্রমাণিত হয়েছে। সংক্ষেপে দু'একটি চরিত্র ব্যাখ্যা করে তাদের হাস্যরসের শ্রেণী ও প্রকৃতি তুলে ধরা যেতে পারে।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের 'গোলামহোসেন' একটি হাস্যরসাত্মক টাইপ-চরিত্র। চরিত্রটির সাজসজ্জা আচরণ চেহারা ও কথাবার্তা সবই উদ্ভট, সাধারণ মনুষ্যপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং হাস্যোদ্রেককারী। তার পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণ—'এক পায়ে প্যান্ট আর সু, একপায়ে মোগলাই পাজামা আর নাগরা। দেহের এক অর্ধে ইংলিশ কোট আর এক অর্ধে নামাবলির মেরজাই। গলায় কন্ঠী, নাকে তিলক, মাথায় অর্ধেক টপ-হ্যাট আর অর্ধেক ফেজ। গোঁফ কামানো আর চাপ দাড়ি। প্রকান্ড এক গোছা টিকি!'

নবাব সিরাজদ্দৌলার খাস ভৃত্য গোলামহোসেনের পূর্ব পরিচয় তেমন স্পষ্ট নয়। কেবল আলেয়ার কথা থেকে জানা যায় সে হিন্দু, তার প্রকৃত নাম পুরন্দর। আর গোলামহোসেনের জবানবন্দী থেকে জানা যায় সে একজন দেশপ্রেমিক ভবঘুরে। পরাধীনতার লজ্জা এবং গ্লানির তাড়নায় সে দেশের

একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত প্রকৃত দেশপ্রেমিকের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে।

গোলামহোসেন : সারা বাংলা ঘুরে এসেচি ভাই। পুণ্যবান লোক দেখেচি, দয়ালু দাতা দেখেচি, কিন্তু দেশপ্রেমিক একটিও দেখিনি।

অবশেষে মুর্শিদাবাদে এসে দেশপ্রেমিকের সন্ধান মিলেছে। কিন্তু দরবারে আসন গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই, আর সেই কারণেই ভাঁড়ের ভেক ধারণ। তার এতদিনের পরিশ্রম সার্থক। দেশরক্ষার সংগ্রামে নবাবের পাশে থাকতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করে সে কৃতার্থ।

গোলামহোসেন বাংলাকে ভালবেসেই নবাবকে ভালবেসেছে। আলেয়ার সংগে বাক্যালাপে তার অতীত জীবনের একটা কথা মাত্র জানা গেছে। সে এবং নবাবের দেশপ্রেমিক সেনাপতি মোহনলাল দুজনই নিরঞ্জন স্বামী নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষিত। এই সন্ন্যাসী যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের কেউ নন তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কেননা, পলাশীযুদ্ধের (১৭৫৭) ঠিক তিন বছর পর থেকেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের (১৭৬০-১৮০০) সূচনা দেখা যায়। সুতরাং নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়কে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীদের আসন্ন বিদ্রোহের ঐক্য-প্রস্তুতির কাল হিসাবে ধরা যেতে পারে। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ এই কাল্পনিক চরিত্রটি রূপায়ণের ব্যাপারে ইতিহাসের যোগসূত্রকে রক্ষা করেছেন।

উপরোক্ত ইংগিত থেকে বুঝতে পারা যায় গোলামহোসেন সাধারণ ব্যক্তি নয়, বিদূষকের ছদ্মবেশে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, গুরুর নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বণিকদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধারকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নাটকের কাহিনী অনুসারে মোহনলাল এবং গোলামহোসেন দুইজনই দেশপ্রেমিক নবাবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিরূপে, অপরজন ভৃত্য ও ভাঁড়ের ছদ্মবেশে নবাবের বিপদের দিনে পরামর্শদাতারূপে। গোলামহোসেন নবাবের পাশাপাশি থেকে নবাবকে তাঁর অন্যায় ও অবিচারের ত্রুটি এবং চারপাশে কূট ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সদাজাগ্রত রেখেছে।

সিরাজ : ……প্রতিহারিনী একে হারেমের কারাগারে বন্দিনী করে রাখবে, চাবকে এর পিঠের ছাল তুলে নেব। পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক এই নারী নিশ্চিত আমার কোন শত্রুর গুপ্তচর।

গোলামহোসেন : পরিচিত প্রকাশ্য শত্রু-চরদের সাজা দিতে পারছেন না বলেই কি এই নারী নিগ্রহ করতে চান জনাব ?

সিরাজ : নফর।

গোলামহোসেন : আমি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কথা বলচিনে জনাব, আমি বলচি মীরজাফর-রাজবল্লভ কোম্পানীর কথা।

গোলামহোসেন ভৃত্য হলেও এবং তার হাস্যকর চলাফেরা সত্ত্বেও এই স্পষ্ট-বাদিতা অনেকসময় স্বয়ং নবাবকেও রেহাই দেয়না। তবে কথাবার্তায় সে অত্যন্ত পরিমিত। নবাব যেখানে হতবুদ্ধি হতাশাগ্রস্ত, নবাবের অন্যায় ও অবিচারের দণ্ড যেখানে উদ্যত, কেবল সেইখানে সে অযাচিত হলেও মারাত্মক মন্তব্য করে বসে। তার কথায় নবাবের যথেষ্ট আস্থা আছে বলেই তিনি রুষ্ট হননা। আবার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও নবাব অকুণ্ঠ চিত্তেই গোলাম-হোসেনের মতামত জানতে চান। সেখানে সে স্বভাবতই রহস্যপ্রিয়তার সঙ্গে দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দেয়। নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ভৃত্য গোলামহোসেনের কথোপ-কথন যে নিছক হাল্কা রসিকতা নয়, নবাবের কাছে এর গুরুত্ব যে কত অপারিসীম, রূপকধর্মী সংলাপের বাকচাতুর্য এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করে তা জানা যায়।

সিরাজ : বল্‌তে বান্দা, সিপাহসালার আর রাজা রাজবল্লভকে কলকাতায় নিয়ে গেলে মুর্শিদাবাদের কোন ক্ষতি হবে কি না ?……

গোলামহোসেন : জনাব ! এক সময়ে একদল চোরের সঙ্গে আমায় থাকতে হতো। নগরে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রাণী কি তাই নিয়ে চোরের দলে একদিন তুমুল তর্ক।

সিরাজ : কি সাব্যস্ত হলো ?

গোলামহোসেন : সাব্যস্ত হলো শিয়াল আর প্যাঁচা না থাকলে নাগরিকদের বড়ই ক্ষতি হয়।

সিরাজ : বটে।

গোলামহোসেন : শেয়াল ধূর্ত, গর্তে লুকিয়ে থাকে, পেচক অশুভ, আঁধার ছেড়ে আলোয় আসতে চায় না কিন্তু তবুও শেয়াল প্রহর ঘোষণা করে আর পেচক অমঙ্গলের আভাস দিয়ে নাগরিকদের উপকার সাধন করে। চোরের দল সেই থেকে শেয়াল আর প্যাঁচার পুজো দিতে লাগল।

সিপাহসালার মীরজাফর ও রাজা রাজবল্লভ দু'জন মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে ধূর্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। দুঃখের বিষয়, গ্লানির বিষয় এদের ঈর্ষা উচ্চাশা ও নবাব বিরোধিতায় বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য প্রায় দু'শ বছরের জন্য অস্তাচলে গেল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা এদের স্বরূপ জেনেছিল, তাদের ঘৃণ্য বিশ্বাস-ঘাতকতাই ছিল নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম কারণ। শেয়াল ও প্যাঁচার রূপকে গোলামহোসেন যে সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন নবাব তা উপলব্ধি করেন।

সারা নাটকে গোলামহোসেনের উপস্থিতি খুবই সীমিত। অহেতুক মাত্রা-তিরিক্ত হাস্যরসে নাটকখানি হাল্কা হয়ে যায়নি। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক দুর্যোগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গোলামহোসেনের সংক্ষিপ্ত সংলাপ কেবল হাস্যরসই সৃষ্টি করেনি, পাশাপাশি করুণরস সৃষ্টিতেও তা সফল হয়েছে। তার জীবনেরও একটা গোপন অধ্যায়ের ইঙ্গিত আছে—তা আলেয়াকে কেন্দ্র করে; মাঝে মাঝে কথার সুরে সেকথা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর অবহেলিত বিদূষক-জীবনে আলেয়ার কাহিনীত একরকম অজ্ঞাতেই, কেবল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দু-একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র।

আলেয়া ঃ তুমি কি যুদ্ধে যাবে ?

গোলামহোসেন ঃ যাব বলেই ত এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।.........

আলেয়া ঃ তাহ'লে আমিও যাব পুরন্দর ?

গোলামহোসেন ঃ থাকবে কোথায় ? নবাবের পাশে পাশে ?

আলেয়া ঃ না, তোমারই কাছে কাছে।

গোলামহোসেন ঃ ঠাট্টা করেও অমন কথা বলো না আলেয়া, আমি কেঁদে ফেলব!

আলেয়ার দেশপ্রেম যেমন সিরাজকে তেমনি গোলামহোসেনের জীবনকেও দোলা দিয়েছে। তবে গোলামহোসেনের অব্যক্ত প্রেম নীরব প্রেমিকের অভিমান-ভরা অশ্রুজলে সিক্ত। হাস্যরসিকের জীবনের অন্তরালে একান্ত গোপনীয় সেই প্রেমের ফল্গুধারা আকস্মিক ঘটনাঘাতে প্রকাশিত হয়ে যায়।

আলেয়া ঃ তুমি কি কাউকে ভালেবেসেছিলে ?

গোলামহোসেন ঃ আজ এ-কথা কেন ? কালই ত মরতে হবে।

আলেয়া ঃ তা'হলে ভালো তুমিও বেসেচ ?

গোলামহোসেন : আমি আবার ভালবাসব ! কি যে বলো তুমি !......আর যদি বেসেই থাকি, কে শুনবে......কে তা বুঝবে......আর কেই বা প্রতিদানে অপদার্থকে ভালবাসা দেবে আলেয়া ! আলেয়া ! (হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিল)।

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটক 'সংগ্রাম ও শান্তি'র 'নিত্যানন্দ' আর একটি বিশুদ্ধ স্যাটায়ারধর্মী হাস্যরসাত্মক টাইপ চরিত্র। নিত্যানন্দ লঘু স্বভাবের অথচ বুদ্ধিমান যুবক, ওজন বুঝে কথা বলতে নিপুণ। প্রথমে জমিদার কন্যা কল্যাণীর প্রণয়ী এবং পরে স্বামী। প্রবল প্রতাপ জমিদার চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সে নির্ভয়ে রসিকতা করতে পারে, আবার কল্যাণীর কাছে আদর্শপ্রেমিকও বটে। স্ত্রী-মনোরঞ্জন করবার তার অসীম ক্ষমতা। এরকম সার্থক হাস্যরসাত্মক চরিত্র খুব বেশি দেখা যায় না।

হাল্কা অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাই হোক না কেন নিত্যানন্দ সদানন্দময়। নামের সঙ্গে তার চরিত্রের অপূর্ব সামঞ্জস্য ! কলেজের লেখাপড়া জানা যুবক। কল্যাণীর সহপাঠী, সেই সূত্রে প্রণয় এবং বিবাহ। সে ঘটনার সমস্যাসঙ্কুল আবর্ত থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকে। চরম বিপদের দিনেও সিঁড়ির নিচে বসে স্ত্রী কল্যাণীর খোঁপায় ফুল গুঁজে দেয়, প্রাণভরে গান গেয়ে ওঠে। যেখানে সমস্যা, নিত্যানন্দ তার ধারে কাছেও ঘেঁসে না। যদিও কল্যাণীকে সে বলে, তার এই হাল্কা স্বভাব একটা চাল মাত্র, যাতে কেউ তার কাছে টাকা ধার না চায়, কোন সাহায্য প্রত্যাশা না করে। আসলে নিত্যানন্দের এই উক্তিটিও চালের নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে তার স্বভাবটাই এমনি হাল্কা মেঘের মত, জমাট বেঁধে না হয় বৃষ্টি, না ওঠে কালবৈশাখী ঝড়।

নিত্যানন্দ নিজেই একটা হাস্যরসের ভাণ্ডার। তার কথার প্যাঁচ, ভঙ্গি, আচরণ এবং সদা স্ফূর্তিবাজ চরিত্র সকলকে আকৃষ্ট করে। তার কথাবার্তায় স্বয়ং জমিদার চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিত্বও বিপন্ন হয়।

চন্দ্রশেখর : ......শিকারে বেরিয়েছিলুম। কিছুই মিলল না। দেখলুম একদল বানর। দেশের লোকগুলো ত বটেই, বাঘ ভাল্লুকগুলোও বানর হয়ে যাচ্ছে, না নিত্যানন্দ ?

নিত্যানন্দ ঃ অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আর শুনেচি বানরগুলো বুড়ো হয়ে গেলে হনুমান হয়।

ভাবী জামাতা ও শ্বশুরের প্রথম পরিচয়ের কথোপকথন এবং ভাবী শ্বশুর যেখানে রাশভারী জমিদার তার সংগে নিত্যানন্দের এই রসিকতা ব্যংগ হাস্যরস সৃষ্টি করে। লক্ষণীয় যে এই হাস্যরস একান্তই স্যাটায়ার আশ্রিত। হিউমারিস্টের চোখে জীবন ও জগতের সকল অসংগতি ও বিকৃতি খুব সহজেই ধরা পড়ে। তিনি জাগতিক সুখ-দুঃখ সমাজের ন্যায়-নীতি আচরণ ও প্রচলিত ধারণার অসারত্ব উপলব্ধি করে তাকে হাস্যরসের আধারে সমালোচনা করেন। নিত্যানন্দের হাস্যরসে হিউমার ও স্যাটায়ার-এর সংমিশ্রণ থাকলেও স্যাটায়ার-এর প্রভাবই বেশি। নাটকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জটিল দৃশ্যে উজ্জ্বল হাস্যরসের স্ফুরণ ঘটিয়ে পরিস্থিতি হাল্কা করে দিলেও তার লক্ষ্য কখনো ভ্রষ্ট হয় না। যার লাগে সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করে। দ্বিতীয় অংকে পর পর দুটি সংলাপে নিত্যানন্দের হিউমার ও স্যাটায়ারের সুন্দর নিদর্শন আছে।

অবিনাশ ঃ ....ব্যাঙ্কের টাকা খুব বেশী বাড়ে না, টাকা বাড়াতে হয় টাকা খাটিয়ে। And I have put before you a tempting proposition.

নিত্যানন্দ ঃ I am sorry to say that I don't feel tempted. I was never tempted. Of course, your sister's case is an exception

অবিনাশ ঃ জীবনে কি কখনো তুমি সিরিয়াস হবে না ?

নিত্যানন্দ ঃ না হলেও ক্ষতি নেই। সংসারে সিরিয়াস লোকের সংখ্যা বড্ড বেশী বেড়ে গেছে। তারা সিরিয়াসলি মিথ্যা কথা বলে, সিরিয়াসলি প্রতারণা করে, seriously and systemetically পরকে ঠকায়। তাই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, প্রভু বুদ্ধি বিবেচনা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছ ক্ষতি নেই, কিন্তু দোহাই প্রভু কোনদিন আমাকে যেন না ওদের মত সিরিয়াস হতে হয়।

লক্ষণীয়, নিত্যানন্দের প্রথম সংলাপে আছে বিশুদ্ধ হিউমার; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তীব্র স্যাটায়ার বা ব্যংগ। শচীন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে গভীর নৈপুণ্যের সংগে চিত্রিত করেছেন। চরিত্রটি হাস্যরসাত্মক হলেও একেবারে হালকা হয়ে যায়নি, নাট্যকারের রচনাশক্তির গুণে তা জীবন্ত ও কখনো কখনো বাস্তব হয়ে উঠেছে। নিত্যানন্দ নিজেকে 'সিরিয়াস' না ভাবলেও প্রয়োজনবোধে সে

'blood hound'' হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণও সে দিয়েছে। শেষ অংশে সে এবং তার প্রেমিকা স্ত্রী মনোহরের চক্রান্তের শিকার হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তা ব্যর্থ হয়েছে। মনোহরের টুঁটি চেপে ধরে সে অনায়াসে বলতে পারে '.........for once in my life I am serious like a blood hound. রাস্কেল এতবড় স্পর্ধা তোমার।' এ থেকে বোঝা যায় নিত্যানন্দ লঘু স্বভাবের হলেও সুচতুর। হাস্যরসাত্মক চরিত্রের এমন দুর্লভ বৈশিষ্ট্য বাংলা নাট্যসাহিত্যে খুব বেশি নেই।

নবম

॥ শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের স্বরূপ

শচীন্দ্রনাথ যেসময় বাংলা নাটক লেখা শুরু করেন সে সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের দারুণ জনপ্রিয়তা। শচীন্দ্রনাথ এই গতানুগতিকতার গড্ডলিকা থেকে প্রথম থেকেই নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম মঞ্চস্থ নাটকের (রক্তকমল ১৯২৯) বিষয়বস্তু ছিল এক জটিল সামাজিক সমস্যা। স্বভাবতই তা মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেনি। এরপরই মঞ্চস্থ হয় ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় নাটক গৈরিকপতাকা (১৯৩০)।

নাটক রচনার মাধ্যমে শচীন্দ্রনাথের মধ্যে দু'ধরনের উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল। প্রথমত বাংলা মঞ্চ-নাটকের নিষ্প্রাণ জগতে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ছিল নতুন ধরনের সামাজিক নাটক রচনায়। তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল খুবই স্পষ্ট—জাতীয় আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা এবং দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রেরণায় পূর্বসূরি নাট্যকারগণের অনুসরণে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করা।

অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকের স্বরূপ সন্ধানে পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ থেকে শচীন্দ্রনাথের ধারণায় বিশেষ প্রভেদ ছিল। শচীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিপ্লবী ভাবনা কেবল দেশমুক্তির স্বপ্নেই মগ্ন ছিল না। সমাজ-অর্থনীতি সামাজিক ন্যায়নীতির চেতনাও তাঁর মনীষাকে পরিচালিত করেছে। সমসাময়িক পেশাদারী মঞ্চ-নাটকের অচলায়তন ভেঙে যেমন তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাতে গতি সঞ্চারে সচেষ্ট ছিলেন তেমনি পাপাপাশি জাতীয় মুক্তি ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে ঐতিহাসিক নাটকের ট্র্যাডিশনকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই 'ট্র্যাডিশন'কে বজায় রাখতে নবীন নাট্যকারদের বহুস্থানে পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তেমনি বাংলা নাটকের বিবর্তন

ধারাকে জাগ্রত রাখতে এই ট্র্যাডিশনকে সশ্রদ্ধচিত্তে 'আধুনিক' নাটকের পাশাপাশি বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই গুরুত্ব দিতেন।

প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিকপতাকা'য় এই ট্র্যাডিশনকে শচীন্দ্রনাথ অনেকখানি মেনে নিয়েছিলেন। নাটকখানি সুভাষবাবুকে উৎসর্গ করে তিনি লিখেছেন—'নাটকখানি তাঁর জাতি সংগঠনের প্রয়াসের কথা মনে রাখিয়া তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলাম।' বলাবাহুল্য, জাতি সংগঠনের প্রয়াসই গৈরিকপতাকা নাটকের ভাবনির্যাস।

গিরিশচন্দ্রের বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনার মূলে উদ্দেশ্য ছিল অতীতের বীরদের চরিত্র অংকন করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অবশ্য এই ধারণাটি বিশেষ সক্রিয় না থাকলেও জাতির নৈতিক চরিত্র বিশ্বমানবতা ভ্রাতৃত্ববোধ ও মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানোর আহবান জানিয়েছেন। তিনি নাট্যরচনায় শিল্পাদর্শকে সচেতন প্রয়াসের সংগে যুক্ত করেছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত নাট্যধারাকেই প্রধানত অনুসরণ করেছেন। যদিও, শিল্পাদর্শকে গৌণ না করে তিনি কেবলমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। সেকারণে, তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের ইতিহাস-নিষ্ঠা বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। এ ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র নয়, নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যাদর্শকে শচীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন নাটক ও ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা। ঐতিহাসিক নাটক প্রসংগে তাঁর অভিমত —'ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি। নাটক তা নয়। ……ঘটনাটি ঘটবার কারণই নাট্যকারের বিষয়বস্তু।……'

বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের হৃদয়ের কথা খুব ভাল করেই অনুধাবন করেছিলেন। সে কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকের উচ্চ ভাবাদর্শ শিক্ষিত দর্শককে যতখানি মুগ্ধ করেছে শচীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ মানুষকে তেমনি আকৃষ্ট করেছে। অনুরূপ, গিরিশচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা শচীন্দ্রনাথের নাটকে না থাকলেও তাঁর জনপ্রিয়তায় কোন বাধা ঘটেনি। ঐতিহাসিক নাটকে তিনি ইতিহাস অনুসন্ধানে তত বেশি গুরুত্ব দেননি যত গভীর অনুশীলন করেছেন এদেশের মানুষের অন্তরের জাতীয় অনুভূতি ও ভাবাবেগ।

নাটকের আঙ্গিক-বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বাংলা পেশাদারী মঞ্চ-জগতে তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। শচীন্দ্রনাথ সম্ভবত এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ধারণার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা ঐতিহাসিক নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পত্রাংশে পরিষ্কার বলেছেল—'ইহা বুঝা উচিত নাটক ও ইতিহাস এক জিনিস নহে। কোন দেশের কোন নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় না।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকমত্য ফুটে উঠেছে শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে ধারণায়। ঐতিহাসিক নাটক রচনার আদর্শে শচীন্দ্রনাথকে এক হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুগামী বলা চলে। উভয়ের ধারণার সচেতন প্রয়াসের ফল তাঁদের ঐতিহাসিক নাটক।

আসলে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাবেগেও প্রকৃতিগত একটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। প্রথম রচিত ঐতিহাসিক নাটক গৈরিকপতাকায় শচীন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি শিবাজীর ভাববস্তু গ্রহণ করলেও তাতে যুগপরিবর্তনের মৌলিক ভাবনা যুক্ত করেছেন।

মুঘলযুগের স্বাধীন হিন্দু নৃপতিগণ ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। শিবাজীর জীবনদর্শন ছিল ভারতীয় সনাতন হিন্দুদর্শনের প্রতিরূপ। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার মধ্যে ত্যাগের মহান আদর্শ ছিল শিবাজীর ব্রত। শচীন্দ্রনাথ 'গৈরিকপতাকা'য় শিবাজীর এক-হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চিত্রিত করলেও তাতে ধর্মীয় সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে শিবাজীকে বহু উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

শিবাজী ঃ...দরিদ্র মুসলমান প্রজারা ত উৎপীড়ন করেনা, তারা ত মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালিনী করে, দেশের সকলের জন্য তারা করে স্বার্থ বিসর্জন। ধর্মরাজ্যের অর্থ সেই রাজ্য, বন্ধুগণ, যার প্রজারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাজার সঙ্গে সমানে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে। (১ অঙ্ক, ৫ দৃশ্য)

মুঘলের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতি বিদ্বেষ উৎপীড়ন ও পরধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা ভারতবর্ষকে সেসময় জর্জরিত করে তুলেছিল। রাজা শিবাজী

দেশকে সেই সংকট থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক গৌরবময় ভূমিকা নিয়েছিলেন। বস্তুত, শিবাজীর এই প্রচেষ্টা বৃটিশদের দাসত্ব, অত্যাচার ও শোষণ থেকে সশস্ত্র বিপ্লবীদের দুর্বার মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়। আর সেই কারণেই গৈরিকপতাকা নাটকের মঞ্চসাফল্য তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

শচীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে বাংলা নাটকের ট্র্যাডিশনকে যথাযথ অনুসরণ করলেও তাতে মৌলিক ভাবনা ও নাট্য আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। যেহেতু তিনি দেশের মুক্তি আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন সে-কারণে দেশের মানুষের হৃদয়ের খবরটা ছিল তাঁর জানা। ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ডের প্রেরণার মূলে ছিল ভারতীয় হিন্দুদর্শনের জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের প্রভাব। কিন্তু তার চেয়েও গভীর এদেশের আপামর জনসাধারণের আবেগানুভূতি। কেননা, জটিল তত্ত্বের চেয়ে আবহমান জাতীয় ও লৌকিক চেতনাই মানুষের মনকে চিরদিন আকৃষ্ট ও অভিভূত করেছে।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটক যেমন জাতীয় বীরদের নিয়ে রচিত হয়েছে, সেখানে হিন্দু নৃপতি যেমন আছেন তেমনি আছেন সুলতান বাদশাহরা। মুসলমান হয়েও ভারতীয় জাতীয় চেতনায় তাঁরা গৌরবান্বিত হয়েছেন। বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষে তারা বহুবার ঐক্য ও ন্যায়ধর্মের পক্ষাবলম্বন করেছেন। এই কারণে সাহিত্য নাটকের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসনে তাঁরা চিরদিন প্রতিষ্ঠিত। বলাবাহুল্য, কোন ইংরেজশাসক এই গৌরবের অধিকারী নন। অপরদিকে মুসলমান শাসকের দেশপ্রেম ন্যায় নীতিবোধ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে বহু বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা জাতীয় বীর হিসাবে ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করছেন। ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের বলি এবং ভারতবর্ষে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রসারে প্রথম সফল পদক্ষেপ পলাশীর যুদ্ধ এদেশে নতুন যুগের সূচনা করেছে। এদিক থেকে সিরাজদ্দৌলা নাটকের কাহিনী ও বিষয় সাধারণ মানুষকে চিরকাল আলোড়িত করেছে।

ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের ধারণা—ইতিহাস নয় ঐতিহাসিক চেতনা ও অনুপ্রেরণা দর্শকের অন্তরে সঞ্চারিত হলে ঐতিহাসিক নাটক সার্থক।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের সিরাজ দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের মধ্যে তার অস্থিরতা অসহায়তা সারল্য বেহিসেবী প্রেম ও আবেগপ্রবণতা দর্শকের অন্তর আপ্লুত ও অশ্রুসজলই কেবল করেনি, এই জাতীয় ভাবাবেগই যে আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে সবচেয়ে বড় বাধা তা পরোক্ষে নাট্যকার দেখিয়েছেন।

গোলামহোসেন ঃ এ পরাজয়ের প্রয়োজন আছে। জাঁহাপনা, দাঁত থাকতে নির্বোধেরা দাঁতের মর্যাদা বোঝে না, দেশের স্বাধীনতা থাকেতে অপদার্থরা স্বাধীনতারও মর্ম্ম বোঝে না। দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে যে স্বাধীনতা ভোগ করবার সুযোগ আপনি বাঙালীকে দিয়েছিলেন বাঙালী তার মর্ম্ম বোঝে না। তা না বুঝে সিংহাসনের লোভে আত্মহারা হয়ে নিজেরাই দলাদলি মারামারি করছে। একটা প্রচন্ড আঘাত তার প্রয়োজন ছিল। পলাশী সেই আঘাতই তাকে করেচে। (৩ অংক, ২ দৃশ্য)

ঐতিহাসিক নাটক রচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই শচীন্দ্রনাথের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। আবুলহাসান ও ধাত্রীপান্নার মত নাটকে তিনি মানবতা এবং বিশ্বপ্রেমকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। যেখানে ত্যাগ সততা নিষ্কাম কর্মবাদকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন। জাতির জীবনে যেমন বিপ্লবের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, তেমনি জাতির অস্তিত্ব ও মেরুদন্ডকে শক্তিশালী করে তোলার মূল্যও অপরিসীম। বস্তুত, একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। মেবারপতন নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের স্বরূপ যে একটি-মাত্র বাণীতে বিধৃত হয়েছে ঃ 'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ' —এই মনুষ্যচেতনার মধ্যেই রয়েছে দেশ জাতি প্রেম ও মানবতার অংকুর। নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সাধনার দ্বারা বিশ্বমানবপ্রেমের রস আস্বাদন সম্ভব। ভয়শূন্য নির্ভীক চিত্তই পারে দেশ ও জাতির সত্যিকারের মংগলসাধন করতে।

আবুলহাসান নাটকখানি যদিও সিরাজদ্দৌলা নাটকের মতই বিয়োগান্তক, তথাপি নাট্যরস কাহিনী-পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবন-দর্শনে উভয় নাটকে বিস্তর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। আবুলহাসানের প্রেম-প্রীতি-সৌন্দর্যবোধ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি। সর্বোপরি নিষ্কাম চেতনা তার দেশপ্রেমে নতুন মাত্রা এনেছে।

'আবুলহাসানে'র কাহিনী ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের সংগে স্বভাবতই শিবাজী চরিত্রের এবং 'গৈরিকপতাকা'র কাহিনী ভাবনায় কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও

মূলত প্রচুর পার্থক্যও আছে। উভয়েই রাজ্য পরিচালনায় গুরুর নির্দেশে নিষ্কাম ব্রত গ্রহণ করেছে। কিন্তু, 'গৈরিকপতাকা'য় দেশ যেখানে শিবাজীর প্রাণে মূর্ত বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত, আবুলহাসানের বৈরাগ্যের কাছে দেশ হয়ে গেছে গৌণ। উভয়েই দেশ রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে; কিন্তু একজনের কাছে যখন দেশের পরাধীনতার অর্থ দেশমাতৃকার হাতে শৃঙ্খল-বন্ধন, তখন অপর-জনের মনে হয় বিশ্বের সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই সবকিছুর মূলে সক্রিয়, পার্থিব কোন ক্ষমতাই অনিবার্য পরিণতির গতিরোধ করতে সক্ষম নয়।

প্রকৃতপক্ষে, আবুলহাসান সুফী সহজিয়া চেতনায় উদ্ভাসিত এক সুলতান, যে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই দ্বিধা ও অনীহা ব্যক্ত করেছেন। কুতুব শাহী বংশের সন্তান আবুলহাসানের জন্য সুলতান প্রেরিত সেনাপতি হাতি ঘোড়া বাদ্যসহ সৈয়দ ফকির সাহেবের আশ্রমে উপস্থিত হলে আশ্রমবাসী যুবক হাসান বলে ওঠে—'আরে ওরা কারা? ওই অতসব লোকজন? ঐ হাতী নিয়ে, ঘোড়া নিয়ে, এদিকে যেন না আসে। বাহাদুর খাঁ, ওদের ওই দিক দিয়ে যেতে বল। ওই দিক দিয়ে। এটা আশ্রম, লড়াইয়ের মাঠ নয়।'

বন্দী হাসান সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে নতজানু হয়ে অভিবাদন করেনা, কিন্তু ক্রুদ্ধ ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে তার কারাদণ্ড হলে সে সম্রাটকে অভিবাদন করে। তার কাছে সম্রাট একজনই—সে জগতের অধীশ্বর, তাকে ছাড়া আবুলহাসান কাউকেই প্রভু বলে জানে না। হাসানের প্রেমিকা মমতাজ তাই আপন মনে বলে—'আমিরও নও, ফকিরও নয়···তুমি দেবতা।'

নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্মের সাধনায় মানুষ কখনও কখনও চরম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হয়। এই অর্জিত চেতনায় আপন-পর ভেদাভেদ থাকে না, শত্রু-মিত্র প্রভেদ মুছে যায় মানবপ্রেমের দুর্বার স্রোতে। ধাত্রীপান্না নাটকে এই মর্মসুরই প্রধান।

কর্তব্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, নারী জীবনের চরম বেদনার অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হয়ে ধাত্রীপান্না সত্যিকারের দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠা তার জীবনে যে স্বরূপে প্রকাশিত তা পৃথিবীর ইতিহাসে একান্তই বিরল।

রাজস্থানের এক প্রচলিত ঐতিহাসিক কাহিনীকে শচীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দিয়েছেন। পান্নার অতুলনীয় দেশপ্রেম কর্তব্যবোধ প্রাণপ্রতিম একমাত্র

সন্তানের বিনিময়ে ভাবী রাণা উদয়সিংহের জীবনরক্ষা অসাধারণ নাটকীয় ঘটনা। নাট্যকার অত্যন্ত নিপুণভাবেই এতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রয়োগ করে নাট্যরস সফল করে তুলেছেন।

নাটকের শ্রেণী নির্ধারণে 'ধাত্রীপান্না'কে নির্দেশ করা সহজ নয়। পান্নার জীবনের ট্রাজেডিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে তা শেষপর্যন্ত আর ট্রাজেডি স্তরে থাকে না। শীতলসেনীর চক্রান্ত, বনবীরের নিষ্ঠুরতাকে পরাজিত করে পান্না শেষপর্যন্ত কেবল বিজয়িনী নয়; শীতলসেনী ও বনবীরকে জনতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করে এবং তার পুত্রহত্যার স্মৃতিকে দূরে ঠেলে তাদের ক্ষমাও প্রদর্শন করেছে। নাটকে পান্নার দেবী ও মানবীর রূপদুটি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তার অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে এমন দ্বন্দ্ব খুব বেশি নেই।

বনবীরের উদ্যত খড়্গের সামনে পান্না উদয়রূপী কনককে জড়িয়ে ধরে মায়ের আকুল বেদনায়। আবার খড়্গ যখন উভয়ের লক্ষ্যে ধাবিত হয়, তখন সে নিজের পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে। বনবীর বিদ্রূপ কণ্ঠে বলে ওঠে '…নিজের সন্তান হলে এমনি দূরে সরে দাঁড়াতে পারতে ?'

এই নির্মম উক্তির মুখে দাঁড়িয়েও পান্না ভেঙে পড়েনি। কিন্তু বুক ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ে তার হাহাকার। আর্ত অভিমানে সে বলে ওঠে—'ভগবান একলিঙ্গ জানেন কেন আজ আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চাইনি।…কোন মাকে কখনো যা করতে হয়নি, তুমি আজ আমাকে দিয়ে তাই করিয়ে নিলে।'

পান্নার মাতৃত্বের প্রতি উপহাস করে বনবীর সেই মায়ের সামনে তারই নিরপরাধ শিশুপুত্রকে হত্যা করল। তার আগেই পান্না উদয়কে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিয়েছে। বনবীরের খড়্গতলে মাতাপুত্রের একত্র প্রাণ বিসর্জন হলে পান্নার মহৎ চরিত্র ম্লান হতো না। কিন্তু পান্নার কর্তব্য তখনো সমাপন হয়নি। দেশের ভবিষ্যৎ রাণাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করে সিংহাসনের উপযুক্ত করে তোলাও তার অন্যতম দায়িত্ব।

নাটকের শেষ দৃশ্যে পান্না পরাজিত বনবীর ও শীতলসেনীর বিচারস্থলে দেশের সর্দারদের দেওয়া মৃত্যুদন্ড থেকে তাদের রক্ষা করে সর্বান্তকরণে ক্ষমা করে দেয়। শীতলসেনীর পাশে দন্ডায়মান বনবীরকে পান্না বলে—'তুমি মা নও, তাই মায়ের কোল থেকে পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছিলে। কিন্তু আমি মায়ের বুকের

সন্তানকে দণ্ড দেব কেমন করে।...'

পান্নার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি পরাজিত হয় তার নববিকশিত বিশ্বজননীর শাশ্বত হৃদয়ের কাছে। মানবী-মা ধাত্রীপান্না দেবী-মা বিশ্বজননীতে রূপান্তরিত হল—ক্ষমা অহিংসা ও ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করে।

ঐতিহাসিক নাটকে শচীন্দ্রনাথ দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের পাশাপাশি রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলশ্রুতি মহাজাতি গঠনের স্বপ্নের কথাও উচ্চারণ করেছেন। দেশ ও জাতির চরম দুঃসময়ে এই ঐক্যভাবনা সঞ্চারিত করার প্রচেষ্টা দেশাত্মবোধক নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য। বৃটিশ পদানত ভারতবর্ষে জাতি-বৈরীর ও দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বিদেশী শাসক দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে। রাষ্ট্রবিপ্লব নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার দেখিয়েছেন ঔরংগজেবের সর্বনাশা ধর্মান্ধতা জাতি বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়কতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করেছে।

সম্রাট শাহজাহান দেখছেন মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তায়মান সূর্যের শেষ রশ্মি। ঔরংগজেবের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রতিহিংসা অবিশ্বাস রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের বীভৎস কাহিনী শুনতে শুনতে বন্দী শাহজাহানের দিব্যদৃষ্টিতে ভেসে ওঠে অস্তায়মান মুঘল সাম্রাজ্যের ছবি।

শাহজাহান ঃ ঝড়! ঝড় হঠাৎ আসেনি জাহানআরা...নিশীথে দিল্লীর পথ বেয়ে এই ঝড়ই যখন তামাম হিন্দুস্তান তোলপাড় করে দেবে তখন কোথায় থাকবে দারা নাদেরা, কোথায় থাকবে শিপার জহরৎ, আর কোথায়ই বা থাকবে শাহজাহানের সাম্রাজ্য-সম্পদ।

নাট্যকার ভূমিকায় মহারাজ জয়সিংহকে নাটকের ভাষ্যকাররূপে উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও অনৈক্য দেশের অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি করে। এই বিভেদই যুগে যুগে আমাদের পরবশতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। রাষ্ট্রবিপ্লবে মুঘল সামাজ্যের পতনের সূচনা ইঙ্গিত করে নাট্যকার ভারতবর্ষের পরবশতার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিতে চান।

কোন বিশেষ জাতি ও ধর্মের একাধিপত্য ভারতবর্ষ বেশিদিন মেনে নেয়নি। ধর্ম জাতি সম্প্রদায় কোন দেশের বা সাম্রাজ্যের ভিত্তি হতে পারেনা, বিশেষত ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য তা কোনদিন মেনে নেয়নি। সাধারণ মানুষ সব দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের দূরে সরিয়ে রেখে কোন শাসনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনা। আর প্রকৃতপক্ষে দেশের এই বৃহদংশ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ধর্ম জাতি ও

সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। সব যুগে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা এই সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে তা কখনো দৃঢ় হয়নি।

জয়সিংহ ঃ তুমি দিলীর, তুমি পাঠানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখ, ছত্রপতি শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কল্পনা করেন, ঔরংগজেব কামনা করেন মুঘলের অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না হিন্দুস্তানের কোটী কোটী যে-সব সন্তান সাম্রাজ্যের সম্পদ যোগায়, সকলের আহার্য্য যোগায়—তারা কেবল হিন্দু নয়, কেবল পাঠান নয়, কেবল মুঘল নয়। তা যারা করে সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের কোনদিন কোন সম্বন্ধই স্থাপিত হয়নি।

জয়সিংহের স্বপ্ন নব-হিন্দুস্তান গঠনের। রাষ্ট্রবিপ্লবের সাফল্য তখনই আসবে, যখন ধর্ম ও জাতি-বৈচিত্র্যের মাঝে মহামিলনের সেতু নির্মিত হবে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য কোন নির্দিষ্ট ধর্ম ও জাতিকে মেনে নিতে পারেনা।

জয়সিংহ ঃ 'আমার বিশ্বাস। আমার বিশ্বাস হিন্দুস্তানের মাটিতে এমন কোন ধাতু মিশে আছে যা সাম্রাজ্য পেলেই তা গ্রাস করে ফেলে। হিন্দুস্তানের মাটি হিন্দুকে গ্রাস করেচে, বৌদ্ধকে গ্রাস করেচে, পাঠানকে গ্রাস করেচে, আজ তা মুঘলকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েচে।'

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের চেতনায় যে বৈচিত্র্য দেখা গেছে তা কখনো একই খাতে প্রবাহিত হয়নি। ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাস-নিষ্ঠা তাতে ক্ষুণ্ণ হলেও জাতিগঠন ও দেশপ্রেমের আলোকে তা নতুন ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে।

দশ

সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু ও সমস্যা

প্রধানত দুই মহাযুদ্ধ-মধ্যবর্তী সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে তখন কলকারখানা সম্প্রসারণের পর্ব শুরু হয়েছে। কর্ষণজীবী সভ্যতা ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে আ-কর্ষণজীবী সভ্যতায়। ধান্যোৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি ধন উৎপাদনের কলকারখানায় পরিণত হচ্ছে। এরফলে সমাজদেহে যে বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তাতে দেখা দিল নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব, উপেক্ষিত মানুষের বিদ্রোহ। প্রাচীন রাজতন্ত্রের গৌরব ভূম্যবলুণ্ঠিত হল। স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পুরুষের সংগে স্ত্রীজাতির সমানাধিকারের আন্দোলন, সতীত্ব প্রেম একনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার অনিবার্য পরিবর্তন দেখা গেল। যৌথ পরিবারের ভাঙনের সূচনাও এর অন্যতম বিষময় ফল। পরিবারের ঐক্য ও সমৃদ্ধি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পরিবর্তিত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় এই সময়ে শচীন সেনগুপ্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য মনোজ বসু প্রমুখ নাট্যকারের রচনায় ফুটে উঠেছে।

সমাজদেহে এই পরিবর্তনের একটা কুফলও দেখতে পাওয়া যায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার অপব্যবহার—নব্য নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের ব্যভিচার দুর্নীতি ও অবাধ উচ্ছৃংখলতা নিয়ে সমসাময়িক নাট্যকারগণ রচনা করলেন অপরাধ-প্রবণ সামাজিক নাটক যা ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে দেখা যায়নি। শচীন্দ্রনাথ এই ধরনের নাট্যরচনায় সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রক্তকমল, সুপ্রিয়ার কীর্তি, তটিনীর বিচার, জননী প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য।

বাংলার জমিদারতন্ত্র তখনও বর্তমান। শোষণ-শাসন যথারীতি মধ্যযুগীয় কায়দায়ই চলেছে। ঠিক সেইসময় সমাজপরিবর্তনের এই ধারণা সামন্তশ্রেণীর মানসিকতায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ নাটকে তা ফুটিয়ে

তুলেছেন। জমিদারতন্ত্র ও জমিদারী শাসনব্যবস্থার অবসানে তার অপসৃয়মান ক্ষমতার গৌরবরশ্মি যে বিচিত্র বর্ণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে শচীন্দ্রনাথ তা কয়েকটি নাটকে সার্থকতার সংগে এঁকেছেন।

এই সময়ের নাটকে আর একটি বিশেষ সংযোজন হল শ্রেণীচেতনা। শোষক ও শোষিতের শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক যা আবহমানকাল নিরুচ্চারিত প্রতিবাদে সকলেই মেনে আসছিল, মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ সে ধারণাতেও এলো পরিবর্তন। মানবিকতাবোধের পুনর্মূল্যায়নে ঈশ্বরকে স্থান দেওয়া হল মানুষের নিচে। মানুষের সৃষ্ট সমাজে মানুষের শ্রেণীচেতনা উদ্ভূত মানবিকতাবোধের ধারণা এবং ঈশ্বরকে উপলক্ষ করে মানুষের প্রতি মানুষের সীমাহীন নিপীড়ন, 'ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষে'র কর্তৃত্বে অনাচার ও অত্যাচারের পংকিলতায় যে সমাজদেহ দূষিত করে তুলেছিল তার বিরুদ্ধে জার্মান দার্শনিক কার্লমার্কসের বস্তুদর্শন দ্বান্দ্বিক-তত্ত্ব সে সময়ে শ্রমজীবী দুনিয়ায় আলোড়ন এনেছিল, তার ঢেউ ভারতবর্ষকেও স্পর্শ করেছে। ১৯২১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। তারও আগে রাশিয়ায় সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের জয়, দেশে দেশে মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ভারতবর্ষের সনাতন সমাজ-কাঠামোর উপর ও জাতীয়মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করল। শচীন্দ্রনাথের কয়েকটি সামাজিক নাটকে এর প্রতিফলন ঘটেছে। যথার্থ যুগনাট্যকারের এই গুণ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সার্থক।

বস্তুত, সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যা আমরা আশা করি শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে তা দুর্লভ না হলেও তাঁর নাটকে এই সমস্যা কোথাও কোথাও রোম্যান্টিক উত্তেজনাপূর্ণ কৃত্রিম সামাজিক সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সামাজিক নাটকে ব্যক্তি সমাজকে অতিক্রম করে গেছে। কোনও একটি সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরতে গিয়ে নাট্যচরিত্রে রোম্যান্সের বাড়াবাড়ির ফলে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হারিয়ে গেছে এবং নাট্যচরিত্র-গুলিও অস্বাভাবিক রকম হয়ে উঠেছে। এই কারণেই কোন কোন সমালোচক 'তটিনীর বিচার' শ্রেণীর নাটককে রোম্যান্টিক নাটক আখ্যা দেন। এই ধরনের নাটকে সমসাময়িক নাগরিক জীবনের স্পন্দন অনুভূত হলেও 'এতে বহির্ঘটনামূলক জীবনাবেগ, দুঃসাহসিক প্রেম, মুখ্যভাবে দেখতে পাওয়া

যায়। ইংরাজিতে এই শ্রেণীর নাটককে 'The play of romantic adventure' বলে।'[১] এই নিরিখে বিচার করলে সুপ্রিয়ার কীর্তি নার্সিংহোম জননী নাটকগুলি সার্থক সামাজিক নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ সমাজ এখানে মুখ্য না হয়ে ব্যক্তিচরিত্রের বহির্মুখী ক্রিয়াই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

গিরিশযুগের সামাজিক নাটকে তেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় না, কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সামাজিক নাটকে বিচিত্র সামাজিক সমস্যা রূপায়িত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজ রাজনীতি ও অর্থনীতি পরিবর্তনের সংগে সংগে ব্যক্তিমানসে বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ফলে নারীচিত্তের জাগরণে নরনারীর সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, এর প্রতিফলনও নাটকে পড়েছে। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে নাগরিক জীবনের সমস্যাই প্রধানত মূল বিষয়।

তবে শচীন্দ্রনাথ সামাজিক নাটকে নানা বিষয় ও ভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সেইজন্য তাঁর সমস্ত সামাজিক নাটককে একই শ্রেণীতে ফেলা যায় না। সুপ্রিয়ার কীর্তি তটিনীর বিচার নার্সিংহোম জননী প্রভৃতি নাটকে নাগরিক জীবনের জটিল পারিবারিক সমস্যা রূপায়িত হয়েছে। নারী-স্বাধীনতার বলিষ্ঠ রূপ ফুটে উঠেছে এই সমস্ত নাটকে। এখানে নারীরা অবলা নয়, তাদের আচরণে স্বাধীন মতামত প্রকাশের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জীবন-যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা জয়পরাজয়ের সুখ দুঃখে সমান অংশীদার। এইসব নাটকে যেসব নাগরিক জীবনের সমস্যা পারিবারিক শান্তি ক্ষুণ্ণ করেছে তার অধিকাংশই নারীর অসংযম পুরুষের উচ্ছৃংখল আচরণ বল্গাহীন জীবনযাপন ও সামাজিক বিধিনিষেধ না মানার অব্যর্থ পরিণতি। অপরাধ-প্রবণতাও এইসব নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ।

ঝড়ের রাতে, স্বামী স্ত্রী, কালোটাকা প্রভৃতি নাটকে জটিল পারিবারিক সমস্যাও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট। এখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সত্ত্বার দ্বন্দ্ব প্রেম বিবাহ এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মূল্যায়নই মুখ্য। বস্তুত, পারিবারিক ঘটনার জটিল আবর্তনে স্বামী ও স্ত্রীর মানসিক দ্বন্দ্ব, বিশেষত নারী চরিত্রের সুগভীর রোম্যান্টিক চেতনা নাট্যকাহিনীকে

---

১. নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা—পৃঃ ৯২, বিভাস রায়চৌধুরী।

প্রভাবিত করেছে। তবে লক্ষণীয় যে নতুন যুগের নারীদের চরিত্র-প্রকৃতিকে সার্থকভাবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে নাট্যকার প্রচলিত প্রাচীন সংস্কারের সংগে নব্য-নারীমুক্তি চেতনার কোন সরাসরি দ্বন্দ্ব নাটকে তুলে ধরেননি। এই কারণে, নাটকে নব্যযুবতীর পাশাপাশি প্রাচীনা নারীর চিত্র না থাকায়, নতুন যুগের নারীদের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে 'মাটির মায়া' 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকে যুদ্ধোত্তর সামাজিক পরিবর্তনের রূপ ধরা পড়েছে। মাটি ও মেশিনের দ্বন্দ্ব—কৃষিসভ্যতার সংগে যন্ত্রসভ্যতার বিরোধ—ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজের আধিপত্য—কৃষকের শ্রমিক-জীবনযাপনের গ্লানি—ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক পীড়ন ও শ্রমিকের অশিক্ষা দারিদ্র্য ইত্যাদি এই ধরনের নাটকের উপজীব্য বিষয়। এখানে সামাজিক নাটক হিসাবে সার্থক উপরোক্ত নাটক দু'খানির আলোচনা করা যেতে পারে।

জমিদারীপ্রথার অবসান এবং নব্য-বণিকতন্ত্রের উত্থান, নূতনের সংগে পুরাতনের দ্বন্দ্ব—সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকের বিষয়বস্তু। দুর্দান্ত জমিদার চন্দ্রশেখরের সামন্ততান্ত্রিক দম্ভ, জমিদারী রক্ষার উদ্দেশ্যে অমানবিক পৈশাচিক উপায় অবলম্বনের মধ্যে জমিদারদের নিষ্ঠুর জান্তব চেহারা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি নব্যবণিক অবিনাশের চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসিতা লালসা শ্রমিকের শ্রম চুরি করে বেশি মাত্রায় ডিভিডেন্ড লাভের কূট ষড়যন্ত্র বণিকতন্ত্রের পুঁজিবাদী শোষকের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। নাট্যকার সমাজবিবর্তনের এই দ্বান্দ্বিক মুহূর্তকে ভূমিকা-লিপিতে সংগ্রাম ও শান্তির দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়—'জীবনকে যাহারা খন্ডরূপে দেখে, তাহারা ভ্রান্তিবশতঃ হয় সংগ্রামের না হয় শান্তির উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া একটিকে গ্রহণ এবং অপরটিকে অস্বীকার করে।…কিন্তু অবিরাম সংগ্রাম যেমন সর্বনাশের কারণ, তেমন অটুট শান্তিও সর্বনাশের হেতু হইয়া দেখা দেয়। চাওয়া আর পাওয়া এবং পাওয়া আর না-পাওয়া মানুষের পাইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়, অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখে।'[১]

সেই কারণে ধানের ক্ষেতের উপর কলকারখানা গড়ে উঠলেও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েমের মধ্যে শান্তি নেই। নাট্যকার ধনতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী

১. সংগ্রাম ও শান্তি (নাট্যকারের 'নিবেদন')

সমাজের এই সংকট সম্পর্কেও অবহিত।

অবিনাশ : দুঃখ এই হাকিম সাহেব, নিজের প্রজাদের বঞ্চিত করে বিদেশ থেকে মজুরী করবার জন্য যাদের নিয়ে এলুম তারাও খুশী নয়, তাদেরও লোভ বেড়ে চলেছে। বোনাসের দাবী পূর্ণ করতে পারব না বলে তারা হয় শত্রু…। (সংগ্রাম ও শান্তি, পৃঃ ৯৯)

এই নাটকের আর একটি বিষয় হল সমাজতান্ত্রিক ভাবনা। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার ও পুরাতন চিন্তাধারা মূল্যবোধ ভেঙেচুরে যাচ্ছে। পিতাপুত্রের সম্পর্কেও ফাটল ধরছে। এইসময় শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ, শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরীর দাবি—মুনাফার অংশে শ্রমিকের অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে।

এর পাশাপাশি নাট্যকার আর একটি বিষয়ে কটাক্ষপাত করেছেন। তা হল, এইসময় সাম্যবাদী চিন্তাধারা মধ্যবিত্ত বাঙালীকে আকৃষ্ট করলেও তাতে জীবনের সত্যকারের যোগসাধন হয়নি, বাস্তবিক পক্ষে সকলে নীতিনিষ্ঠ হতেও পারেননি। ক্ষণস্থায়ী আবেগে যা দীপ্ত হয়ে ওঠে, দীর্ঘদিনের সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও অভ্যাস এই সমাজবিপ্লবের আদর্শকে ধবে রাখতে সমর্থ হয়নি। তাই অবিনাশ ও প্রতিমার জীবনযাত্রা শেষপর্যন্ত পুরাতন পথ ধরেই অগ্রসর হয়। অবশ্য সামাজিক পরিবর্তন বিবর্তনের পথ ধরেও চলে। জমিদারতন্ত্র থেকে নব্য-বণিকতন্ত্রে সমাজ-অর্থনীতির উত্তরণ ঘটে—পাশ্চাত্যসুলভ আচার-আচরণ জীবন-যাত্রা নব্যবণিকদের আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও সাম্যবাদী ভাবনার পাশাপাশি এই নাটকে বাঙালী জাতীয়তাবোধের সংমিশ্রণও ঘটেছে। নাট্যকার বাঙলা ও বাঙালীর অর্থনৈতিক দুর্দশার পেছনে ভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের কথা তুলে ধরেছেন।

মগনলাল : বাংলার চাষী মরুক, বাংলার জমিদার জাহান্নামে যাক, আমরা টাকা দিয়ে বাংলা জয় করব। সিন্ধ থেকে, পাঞ্জাব থেকে, দিল্লী থেকে, ইউ. পি থেকে, বিহার থেকে, বেরার থেকে, উৎকল থেকে, মাদ্রাজ থেকে শ্রমিক এনে, ক্লার্ক এনে, মার্চেন্টস এনে, বরকন্দাজ এনে বাংলাদেশ হামরা ছেয়ে দোব। পারে বাংলা রুখুক। (সংগ্রাম ও শান্তি, পৃঃ ৯৫)

'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকে নাট্যকারের যে কথা বলা শেষ হয়নি 'মাটির মায়া' নাটকে তিনি তারই জের টেনেছেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে,

কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটায় বাঙলার কৃষক-শ্রেণীর দুর্দশা চরমে পেঁছায়। শিল্প মালিকদের কারসাজিতে ধান পাটের বাজার দর ওঠানামা করে, সুবিধেমত দরে তারা কৃষকের রক্ত জল করা সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়, সম্বৎসর খোরাকির জন্য মহাজনের দাদন ও ঋণের আশায় তাদের বসে থাকতে হয়। এইভাবে কৃষকসমাজ দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একদিন শহর-গঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। কৃষক রূপান্তরিত হয় শ্রমিকে। কৃষিসভ্যতার স্থান দখল করে যন্ত্রসভ্যতা।

নাট্যকার মাটির মায়া নাটকে কৃষক-জীবনের ট্র্যাজেডি রূপায়িত করেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র মাধবমোড়ল কৃষকসমাজের প্রতিভূ। নাটকে যেমন একদিকে পুঁজিবাদী ও কৃষি-অর্থনীতির দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-জীবনের দ্বন্দ্বও রূপায়িত হয়েছে। কৃষকের শান্তিময় সচ্ছল জীবন-যাত্রার পাশাপাশি শ্রমিকের দুঃসহ জীবনযাপনের গ্লানিও চিত্রিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কৃষককে অশিক্ষিত নির্বোধ ভাবতে অভ্যস্ত, কিন্তু মাধব মোড়ল তা মানে না—'কে মুখ্যু! তোরা মুখ্যু? তোরা নীল আকাশের গায়ে চুলের মতো একটি কালো মেঘ দেখে বলতে পারিস বর্ষা কবে নামবে, পৌষের হাওয়া গায়ে লাগতেই তোরা বুঝতে পারিস শিশির কেমন পড়বে, মাটির বুক চিরে সবুজ ডগাটি বেরুতেই বলতে পারিস ফসল কেমন ফলবে। পারে ওই পুঁথি পড়া পণ্ডিতরা তা বলতে? পারে না আমি জানি। আর এও জানি লেখাপড়া তোরা শিখিসনি ঠিক, কিন্তু তোরা নির্বোধ নোস।......'

অন্যদিকে মাটির কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে কৃষক যখন তার শান্তি হারিয়েছে, কারখানার শ্রমিক-জীবনের সংকীর্ণতায় ও পুঁজিবাদী লোভ ও শোষণের চাপে পড়ে যখন সে মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে, পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসাকে হারিয়ে জন্তুতে পরিণত হচ্ছে, তখন আর এক মহত্তর আদর্শেও সে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ হয়। ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত তাদের চেতনায় প্রতিফলিত।

নবু: কারখানা ছাড়া আমাদের ভিন দেশ নেই বাবা, জাতেরও আমাদের তফাৎ নেই। আমরা চাষী নই, বামুন কায়েত, ভদ্দর অভদ্দর নই, বাঙালী অবাঙালী নই। চাটগাঁ, কলকাতা, আমেদাবাদ, বোম্বাই যেখানে কারখানা সেই-সেই আমাদের দেশ। আমরা সব এক দেশের, এক জাতের এক কুলের মানুষ—মজদুর আমরা মজদুর। (মাটির মায়া, পৃঃ ৬২)

'মাটিও চাই মেশিনও চাই'—নাট্যকারের এই চেতনা মাটির মায়া নাটকের ভাববস্তুতে অনুসৃত হয়েছে। এখানেও পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার স্বল্প শান্তিকামী কৃষকজীবনের মূলে আগুন জ্বালিয়েছে। মাটির পাশাপাশি মেশিনেরও প্রয়োজন আছে—একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্পূর্ণ। সুতরাং যন্ত্রের প্রতি অত্যধিক আসক্তি যেমন অকল্যাণ আনে তেমনি মাটিকে একেবারে অস্বীকার করলে দুঃখ অনিবার্য—নাট্যকারের এই বক্তব্য নাট্যবিষয়ে সঞ্চারিত হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তুও গৃহীত হয়েছে। পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজনীতিও নাটকের অন্যতম বিষয়। নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনভাবেই রাজনৈতিক ঘটনাবলী নাট্যকাহিনীতে স্থান দিয়েছেন। বর্তমান যুগে রাজনীতি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু শচীন্দ্রনাথ তাকে অস্বীকার করেননি। দেশের ও জাতির সংকটে নাটককে তিনি হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদী নাট্যকার হিসাবে শচীন্দ্রনাথ চিরদিনই স্মরণীয়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা 'এই স্বাধীনতা' এবং 'জয়নাদ ও আর্তনাদ' নাটক দু'খানি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। সম্ভবত বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রকাঠামোয় এই নাটক দু'খানির রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য বহুদিন যাবৎ অক্ষুণ্ণই থাকবে। কারণ, দেশ বিভাগের কুফল ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং প্রাদেশিকতার বিভেদ বর্তমান দেশীয় রাজনীতির প্রধান সম্বল একথা অস্বীকার করবার আর উপায় নেই।

এই স্বাধীনতা নাটকে শচীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশ বিভাগের বিষময় পরিণতি দেখিয়েছেন। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতার চক্রান্তে বঙ্গদেশ বিভাগের ফলে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের অনিশ্চয়তা দারিদ্র্য আর অসম্মান নিয়ে নাটকের কাহিনী। এর মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক হিংসা প্রণয় ও প্রীতি, আছে চিরদিনের দাম্পত্যনিষ্ঠার মনগড়া বিশ্বাসের অবলুপ্তি। পাশাপাশি নাট্যকার তাঁর নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মানবতা এবং স্বদেশপ্রেমের পবিত্র অঙ্গীকার। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে একটি রূপকের আশ্রয়ে দেশবিভাগের সমস্যাটি উপস্থিত করেছেন। নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই জাতি গঠনের প্রতীক। নাট্যকারের

ভাষায়—'নাটকের 'মহিম' এককালে স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করেছিল তাই স্বাধীনতা পেয়ে সে উৎসবেই মত্ত রইল। 'সাধনা' জাতির প্রগতির সাধনা জাতির সাধনায় পড়ে আঘাত, প্রেমের আদর্শে আঘাত, বঞ্চিতের ক্ষোভ থেকে আঘাত, সে প্রদীপ্ত দীপকের সাহায্য চায়। সে জাহাঙ্গীরের চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করতে চায়। চায় জাতির প্রগতির অভিযান। 'দীপক' জ্বলে কিন্তু নিজের জ্বালায় জ্বলে বলে চোখে পথ দেখতে পায় না। 'দয়াল' দরদ দিয়ে সব দেখে কিন্তু তুষের আগুন বুকে পুষে রাখে বলে পথে পা বাড়াতে পারেনা। জাতির 'সাধনা' অবিরাম শোনায় স্বাধীনতা সত্য, স্ববাণ্ট্র মিথ্যা নয়, অভাব মানব-অভ্যুদয়। সে আঘাত পায়, আহত হয়, কিন্তু হত হয়না। জাতির সাধনার শেষ নাই, কখনো তা শেষ হয়না, মানব-অভ্যুদয়ই থাকে চরম লক্ষ্য।...'[১]

বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে লেখকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ভাষ্যকারের নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। এই স্বাধীনতা এবং জয়নাদ ও আর্তনাদ নাটকের ভাববস্তুতে যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ রয়েছে তার তাৎপর্য ভারতবর্ষের বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক অবস্থাতেও সমভাবে প্রযোজ্য। ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু সমস্যা এবং ১৯৮০ সালে চলতি আসামের 'বাঙালী খেদাও' আন্দোলন স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও অব্যাহত। এর পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান সুদূরপ্রসারী অভিমত তাঁকে স্বতন্ত্র নাট্যকারের মর্যাদা দান করেছে।

১. ভূমিকা—'এই স্বাধীনতা'

এগার

উপন্যাসের নাট্যরূপে স্বাধীন চিন্তাধারা ও মৌলিকতা

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই উপন্যাসের নাট্যরূপদানের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। মৌলিক নাটকের অভাবে তৎকালীন বাংলা রংগমঞ্চের পাদপ্রদীপ ম্লান হয়ে পড়েছিল, উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে তাকে সাময়িকভাবে উজ্জ্বল করার চেষ্টা চলছিল। রবীন্দ্রোত্তর কালে আজ অবধি পেশাদারী নাট্যমঞ্চে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

উপন্যাস ও নাটকের গঠন-প্রকৃতি পরস্পর ভিন্ন। উপন্যাসের নাট্যরূপে কতকগুলি শর্ত নাট্যকারকে মেনে চলতে হয়। শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজনে নাট্যকারের স্বাধীনতা যেমন স্বীকৃত, তেমনি উপন্যাসের মূল কাহিনী ও চরিত্র-প্রকৃতিকে অপরিবর্তিত রাখার শর্তটি তাঁকে অবশ্যই মানতে হয়।

উপন্যাসের গৃহীত বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি যেমন নাটকে নেই, তেমনি এর বহু বিচিত্র চরিত্রের ভিড়ও নাটকের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে। নাট্যরচনার প্রধান শর্ত হল পরিমিতিবোধ ও নাটকীয় গতি। অহেতুক দীর্ঘ বাগাড়ম্বর ও বর্ণনার সুযোগ নাটকে থাকে না। নাটকের শিল্প-রসসৃষ্টির বড় অবলম্বন হল সংলাপ। এর সাহায্যে নাট্যকার চরিত্রের জীবনদর্শন ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তোলেন। তবে উপন্যাস ও নাটকের সংলাপ সবসময় একরকম হয় না। বিশেষত উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনে এর পরিবর্তন একান্ত স্বাভাবিক। এ প্রসংগে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ 'দেবদাস' নাট্যরূপের নিবেদন অংশে লিখেছেন '…উপন্যাস বা গল্পে পাত্রপাত্রীদের যে সংলাপ থাকে, কেবল তাই দিয়েই নাটকে রূপান্তরিত চরিত্রগুলিকে মঞ্চে জীবন্ত করা যায় না, দর্শকের মনে সেইসব চরিত্রের প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে তা পর্যাপ্ত হয় না। নাট্যরূপদাতাকে তাই নতুন সংলাপও সৃষ্টি করতে হয়।… উপন্যাসে ও গল্পে ব্যবহৃত সংলাপের সাহায্যে কেবলমাত্র কাহিনীটির মোদ্দা কথা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু নাটক করা যায় না, নাটকীয় এফেক্ট সৃষ্টি সম্ভব হয় না।'

উপন্যাস ও নাটকে চরিত্রসৃষ্টি অপরিহার্য হলেও এর গঠনপ্রক্রিয়া পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপন্যাসে চরিত্র ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু নাটকে মূলতঃ ঘটনার স্বন্দ্বই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। অবশ্য কারো কারো মতে গল্প ঘটনা ও নাটকীয় পরিস্থিতি চরিত্রকে বাদ দিয়ে অর্থহীন।

উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠন কালে উপন্যাসের অনেক অপ্রধান চরিত্র যেমন বাদ পড়ে যায় আবার 'ঘটনার সন্ধিগুলো' জুড়ে দিতে কিছু কিছু হাল্কা ও গুরুত্বপূর্ণ নতুন মুখকেও নাটকে স্থান দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকটির কথা উল্লেখ করা যায়। বিসর্জন নাটকে রাজর্ষি উপন্যাসের সব চরিত্রই যেমন স্থান পায়নি, তেমনি গুণবতী অপর্ণা নয়ন রায় চাঁদপাল কবির নতুন সৃষ্টি।

বলাবাহুল্য, নাটক ও উপন্যাসের গুণগত কিছু কিছু মিল (চরিত্র সংলাপ ও সিচুয়েশন) থাকলেও মূলগত প্রভেদ থাকায় বাংলাসাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন উপন্যাসিকের পক্ষে সার্থক নাটক অথবা নাট্যরূপদান সম্ভব হয়নি। বরং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 'বাংলানাটক' আলোচনা প্রসঙ্গে নাটকরচনায় অক্ষমতা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন।[১] মৌলিক নাটক রচনায় ও উপন্যাসের নাট্যরূপদানে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রোত্তর যুগে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাসের তিনি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সেগুলি মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শরৎচন্দ্রের দেবদাস পথেরদাবী ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় ক্ষুধিতপাষাণ বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। প্রথম দু'খানি ছাড়া বাকি নাটকগুলি মঞ্চস্থ ও অভিনীত (বেতারে) হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। এছাড়া তিনি বাঁপাসার 'ইউজলেস বিউটি' গল্পের ভাব অবলম্বনে 'কাঁটা ও কমল' নাটক লিখেছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ দেবদাস ও পথেরদাবী উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনে মৌলিক চিন্তাভাবনা ও নাট্যরচনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই দুইখানি উপন্যাসের একটিতে কৈশোরপ্রেমের রোম্যান্টিক ভাবালুতা, অপরটি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত রোম্যান্টিক দেশপ্রেমের

১. 'নাটকের কথা' শরৎ সমিতি। (শরৎ রচনাবলী জ. শ. সংস্করণ)

কাহিনী সমধর্মী বাঙালী মানসিকতায় সেযুগে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই দুইটি জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা বেশ দুরূহ। শচীন্দ্রনাথ তাতে সফল হয়েছিলেন এবং তাঁর দক্ষতাও প্রমাণিত হয়েছিল।

দেবদাস উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে তৎকালীন সমালোচক মহলে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই উপন্যাসের মূল কাহিনী অপরিবর্তিত রেখেও নাট্যকার কিছু নতুন দৃশ্য নাটকে সংযোজন করেছেন, সেইসঙ্গে কয়েকটি নতুন মুখও। এই নাটকের সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র হল 'বসন্ত'। দেবদাসের পরেই গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র হিসাবে বসন্ত উল্লেখযোগ্য। বসন্ত সম্পর্কে সেকালের কিছু সমালোচক বিরুদ্ধ-সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। তাঁদের মতে, এর ফলে কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবদাস নিষ্প্রভ হয়েছে এবং উপন্যাসের মূল স্পিরিটকে ক্ষুণ্ণ করে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নাটকখানি চলাকালে বসন্ত চরিত্রটি সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্যও নাট্যকারকে শুনতে হয়। নাট্যকারের জীবিতকালেই 'সাহিত্য বাসরে'র এক সভায় এই চরিত্রটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের মধ্যে ছিলেন নাট্যকার ও পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত।

পরবর্তীকালে অনেকের মতই তিনিও এই অভিযোগ প্রত্যাহার করে বসন্ত চরিত্রটির নাট্য-বৈশিষ্ট্য ও নাটকীয় তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। 'শ্রীমঞ্চ নাট্যোৎসব স্যুভেনীরে' (১৯৬৫) একটি প্রবন্ধে তিনি বসন্ত চরিত্র সৃষ্টির সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে লেখেন—'এ বসন্তের প্রয়োজন ছিল নইলে সর্বহারা দেবদাসের জীবনাদর্শ আমাদের কাছে কখনই প্রকট হয়ে উঠতে পারত না।'[১]

বসন্ত নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। যদিও এই চরিত্র সৃষ্টির পেছনে গিরিশ-চন্দ্রের করিমচাচা বা শচীন্দ্রনাথের গোলামহোসেনের প্রভাব একেবারে অ-দৃষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভাষ্যকাররূপে এই কাল্পনিক চরিত্র দুটির মত বসন্তের গুরুত্ব নাটকের ক্ষেত্রে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আবার এদের অন্ত-র্নিহিত হাস্যরস বসন্তের মধ্যেও বর্তমান। গোলামহোসেনের অব্যক্ত প্রেমজীবনের 'ট্র্যাজেডি'ও বসন্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

দেবদাসের মত বসন্তের জীবনেও সুগভীর বেদনাবোধ আছে, যার কারণ আমাদের অজ্ঞাত থাকলেও কথায় ও আচরণে তা সুস্পষ্ট। মাঝে মাঝে তার কথা শুনে মনে হয় সমাজের রূঢ়তা ও নারীর প্রেমহীন নিষ্ঠুরতা তাকে হতাশার

পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে। নিজের হতভাগ্য জীবনকে নিয়ে সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। তাতে যেমন অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি একটা অব্যক্ত বেদনার ঝংকারও শোনা যায়। বসন্তের কথাবার্তা খুবই মার্জিত ও রুচিসম্মত। তার শিক্ষাদীক্ষা যে বেশ উঁচুদরের তা তার আচরণে ও সংলাপের মধ্যেই পরিস্ফুট। সারা নাটকটিতে বসন্ত পূর্ণ-ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। ফলে, দেবদাসের পাশাপাশি বসন্ত কম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। সেখানে নাট্যকারের দক্ষতা ও কৃতিত্ব সুস্পষ্ট।

দেবদাসের জীবনে বসন্ত ছন্নছাড়ার মত অনুসরণ করেছে। সারা নাটক জুড়ে তার অস্থিরতা খ্যাপার মত জীবনের অর্থ খোঁজার ব্যঞ্জনায় নিহিত। তার হতাশাচ্ছন্ন জীবনে খাঁটি জিনিসটিকে সে চিনতে পারে এবং তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। চন্দ্রমুখীকে সে কোনদিনই মুখ ফুটে মনের কথা বলতে পারেনি, আবার মনের মধ্যে গভীর যন্ত্রণা নিয়েও দেবদাসের প্রতি চন্দ্রমুখীর ভালবাসাকে সে কখন ঈর্ষা করেনা। দেবদাসের দুঃখের দিনের সাথী বসন্ত। চুনীলালের পাপচক্র থেকেও সে দেবদাসকে উদ্ধার করে। দেবদাস চরিত্রকে পরিস্ফুট করবার জন্য বসন্তকে সৃষ্টি করতে হয়েছে—নাট্যকারের এ অভিমত অনুসরণ করে চরিত্রটির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

কেবল নতুন চরিত্র সৃষ্টি নয়। পাশাপাশি কয়েকটি নতুন দৃশ্য সংযোজন করে মূল উপন্যাসের কাহিনী ও রসব্যঞ্জনাকে শচীন্দ্রনাথ অব্যাহত রেখেছেন। উপন্যাসের কিছু পরিচিত দৃশ্যকেও নাটকীয় করার জন্য নতুন সংলাপ ও নতুন সিচুয়েশন যুক্ত করেছেন তিনি।

১ অংক ২ দৃশ্যে বিবাহের প্রাক্‌কালে পার্বতী দেবদাসের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার জন্য গভীর রাত্রিতে তার ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু ভোর রাতে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে দেবদাসের পিতা নারাণ মুখুজ্জের সঙ্গে পার্বতীর দেখা হয়ে যায়। উপন্যাসবহির্ভূত এই সিচুয়েশন নাটকের গতিকে বর্ধিত করেছে। পার্বতীর দৃঢ়তা স্পষ্টবাদীতার পাশাপাশি দেবদাসের দোদুল্যমানতা এবং নারাণ মুখুজ্জের বংশমর্যাদার প্রতি অনমনীয় আস্থা নাটকীয় সংলাপে ফুটে উঠে নাটকের সংঘাতকে তীব্র করেছে। নাট্যচরিত্র ও আন্দোলনকে পরিস্ফুট করতে দৃশ্য সম্প্রসারণের যৌক্তিকতাকে তাই অস্বীকার করা যায় না।

দেবদাসের নাট্যরূপে যেসব নতুন দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ততা বিচার করা যেতে পারে। ২ অংকের ২ দৃশ্যে বাসর ঘরের নাটকীয় দৃশ্যটি শচীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। বিয়ে বাড়ির হাল্কা রসিকতা কথার মারপ্যাঁচ বয়স্ক প্রাচীন ও প্রাচীনার সহজ সরল গ্রাম্য পরিহাস পার্বতীর জীবনের ট্র্যাজিক সূচনাকে সমবেদনার ফল্গুধারায় সিক্ত করে দেয়। দৃশ্যটিতে পরেশ ও গৌরী সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র। 'ঠানদি' উপন্যাসে নামমাত্র উল্লিখিত হয়েছে, নাটকে অন্তত একটি দৃশ্যে গ্রাম্য রসিকতার ট্র্যাডিশনে ঠাকুরমা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিবাহরাত্রে নাট্যকারের কল্পিত ঠাকুর্দা পরেশের সংগে ঠাকুরমার যে রসিকতা নাট্যকার চিত্রিত করেছেন তা 'ড্রামাটিক রিলিফে'র কাজ করেছে। ঐ দৃশ্যের শেষের দিকে পার্বতীর জীবনের ট্র্যাজেডি পর্বের সূচনাটি দৃশ্যের প্রথম দিকের পরিহাস-তারল্যের বৈপরীত্যে গভীর ব্যঞ্জনাবহ করেছে—পার্বতীর একটি সংলাপে তা স্পষ্ট।

'পার্বতী ঃ ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি মনোদি, যে পরম আত্মীয় যারা তারা বুঝতেও পারলে না, আর বাইরে থেকে এসে ঢোল কাঁসি সানাইয়ের মাঝ দিয়েও তিনি আমার মুখের দিকে একটিবার চেয়েই বুঝে নিলেন যে এটা বিয়ে নয় বলি।

দেবদাসের বাগানবাড়ি (৪ অঙ্ক ২ দৃশ্য) চিত্রটি শচীন্দ্রনাথের কল্পিত, নতুন সংযোজন। মূলে উপন্যাসে এই দৃশ্যটি নেই। পিতৃশ্রাদ্ধের পর দেবদাস ভৃত্য ধর্মদাসকে নিয়ে বাগানবাড়িতে উঠেছে। সুরা তার নিত্য সংগী। এইসময় চুনীলাল এসে মিলিত হয় তার সংগে। দেবদাস উপন্যাসে চুনীলাল তত সক্রিয় নয় যতখানি সে নাটকে। চুনীলালের রুচি নিতান্তই স্থূল। নতুন জমিদারের অধীনে ম্যানেজারের চাকরিটি পাবার আশায় এবং একই সংগে চন্দ্রমুখীর প্রতি তার বিরাগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সে দেবদাসের সংগ নিয়েছে। দেবদাসের জমিদারীর অবশিষ্ট ছিল না। ম্যানেজারী না হোক মদ্যপানের স্থায়ী সংগী হিসাবে চুনীলালকে সে সাদর আহ্বান জানায়। এই দৃশ্যে চন্দ্রমুখী দেবদাসের কাছে টাকার প্রার্থনা জানিয়ে বসন্তকে পাঠালে চুনীলালের প্ররোচনায় দেবদাস বসন্তকে টাকা দিতে অস্বীকার করে।

দেবদাস চুনীলালের কথায় বিশ্বাস করল যে চন্দ্রমুখী বসন্তকে ভালবাসে। তার সংগে চন্দ্রমুখী একদিন ভালোবাসার অভিনয় করেছে ভেবে দেবদাস খুবই

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে বসন্তকে অর্থ সাহায্য করতে অস্বীকার করে আর সেই সংগে জানিয়ে দেয় চুনীলালই তার একমাত্র বন্ধু; তার হাত ধরে সে আরও নিচে নেমে যাবে, নরকের শেষধাপ পর্যন্ত; কারো ভালবাসার অভিনয়ে, কারো কথায় সে আর কোনদিনই ভুলবে না। পরবর্তী দৃশ্যে চন্দ্রমুখীর বিচিত্র পল্লীসেবার মাধ্যমে আদর্শ জীবনযাত্রা ও নতুন জীবনোপলব্ধির প্রস্তুতি হিসাবে নাট্যকার আলোচ্য দৃশ্যটি উপস্থাপিত করেছেন। চরম হতাশাচ্ছন্ন দেবদাস একেবারে সমাজবহির্ভূত জীবনযাপন শুরু করেছে। অভিমানী জেদী উদাসী দেবদাসের করুণ পরিণতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

৪ দৃশ্যের প্রথমাংশ নাট্যকারের স্বরচিত। দেবদাসের খোঁজে চন্দ্রমুখীর কলকাতায় আগমন। দেবদাসের মৃত্যুর পূর্বে তার এই শেষ মিলনটিকে আরো নাটকীয় করার জন্য নাট্যকার প্রথমে চন্দ্রমুখীর মতই আর এক দুর্ভাগিনী নারী মেনকার গৃহে অসুস্থ দেবদাসের দিনযাপনের দৃশ্যটি রচনা করেছেন। সামাজিক নারীদের মত পতিতা নারীর সেবাপরায়ণা অন্তরটিকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন।

তেমনি ৫ অঙ্কের ১ দৃশ্যে পার্বতী ও ভুবনের কথোপকথন, জমিদার স্বামীর কাছে দেবদাসের প্রতি ভালবাসার অকুণ্ঠ প্রকাশ যেমন স্বামী-স্ত্রীর জটিল মানসিক দ্বন্দ্বের মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে, তেমনি নাটকের অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজিক পরিণতিকে স্পষ্ট করে দেয়। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে দ্বন্দ্বকে ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন আর নাটকে শচীন্দ্রনাথ তাকে বলিষ্ঠ সংলাপের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রাঞ্জল করে তুলেছেন।[১]

পার্বতী : তোমাকে না বলে আমি অন্যায় করেছি, আজ বলি দেবদাসের কথা জান?

ভুবন : নাম শুনেছি।

পার্বতী : আর কিছু শুনেছ?

ভুবন : শুনেছি তুমি তাকে ভালবাসতে—

১. 'দেবদাসকে নাটকে রূপায়িত করবার জন্য দেবদাস-চন্দ্রমুখীর, পার্বতী ভুবন চৌধুরীর বহু সংলাপ আমাকে রচনা করতে হয়েছে এবং নাটকে কয়েকটি সিচুয়েশনও সৃষ্টি করতে হয়েছে। না করলে যে ইমোশনের তরঙ্গ তোলা যেত না, যা দর্শকমনকে দুলিয়ে নাট্যরসে সফল করে তোলে। নাট্যরূপদাতার কাজ অনেকটা ভাষ্যকারের কাজ, টীকাকারের [illegible]—[illegible], নাট্যরূপদাতার নিবেদন।

পার্বতী ঃ কি করে শুনলে ?

ভুবন ঃ যে করেই হোক, শুনেছি।

পার্বতী ঃ যারা কুৎসা রটিয়ে রেড়ায় তাদেরই মুখে শুনেছ নিশ্চয়।

ভুবন ঃ হয়ত তাই—কিন্তু সে কথা কি মিথ্যে ?

পার্বতী ঃ না। তারা তোমায় সবটুকু বলতে সাহস পায়নি, সবটুকু তুমি শোননি। আমি এখনও তাকে ভালবাসি। (ভুবন পার্বতীর দিকে চাহিয়া রহিল)

ভুবন ঃ আমি বৃদ্ধ বলেই কি আমার মুখের ওপর একথা তুমি বলতে পারলে ?......

উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যা পাঠকের অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ তাকে সংলাপের মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছেন। সে যুগের রক্ষণশীল সমাজে দেবদাস উপন্যাস সমাজপতিদের 'গেল গেল' আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, শচীন্দ্রনাথের নাট্যরূপ সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে সার্থক করেছে। উপন্যাসের হুবহু অনুসরণ না করে এবং উপন্যাস ও নাটকের গঠনরীতির মূল প্রভেদকে মনে রেখে তাঁর এই নাট্যসৃষ্টি রক্ষণশীল সমাজপতিদের মত রক্ষণশীল নাট্যানুরাগীদের মনেও প্রবল ক্ষোভ সঞ্চার করেছিল। সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনের মূল শর্তগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা শচীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছিলেন। উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃত হলেও শিল্প-সৌন্দর্যের খাতিরে ঔপন্যাসিক কখন কখন মানুষের জটিল মনঃপ্রকৃতিকে একেবারে চুলচেরা ব্যাখ্যা না করে ব্যঞ্জনাত্মক ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাহায্য নেন। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তার সুযোগ কম, সেখানে ঘটনা সংলাপনির্ভর হওয়ায় চরিত্রটি পুরোপুরি স্বরূপে বিকশিত হওয়া আবশ্যক। এই কারণে মনোরমার চিঠিতে উপন্যাসের প্রয়োজন মিটে গেলেও নাটকে স্বয়ং মনোরমাকেই চিঠির ভাষা সংলাপে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

শচীন্দ্রনাথ আলোচ্য দৃশ্যটিতে ভুবনকে একেবারে নিপাট হৃদয়বান করে তুলেছেন। পার্বতীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি যদি তাকে ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাকাতর করে তুলত তবে দৃশ্যটি আরও জীবন্ত দ্বন্দ্বমুখর ও নাটকীয় হতে পারত। নাট্যকারের ব্যর্থতা এখানেই।

নাটকের শেষ ৫ অংকের সবকটি দৃশ্যই নাট্যকারের কল্পনাশক্তি ও নাট্যরূপ-দান-প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। ২ দৃশ্যে পার্বতীর সংগে শেষ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেবদাসের যাত্রাপথের সংগী হয়েছে বসন্ত। নাটকের চরম মুহূর্তটিকে নাটকীয় করার জন্য নাট্যকার এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। উপন্যাসে দেবদাসের ট্র্যাজিক পরিণতিকে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার মাধ্যমে এঁকেছেন। পার্বতীর শ্বশুরগৃহের সামনে গাছতলায় মৃত্যু-পথযাত্রী অচেনা অজানা এক ব্যক্তিকে দেখে 'সকলেই কহিল আহা'। 'উপরে বসিয়া পার্বতীও এ কাহিনী শুনিয়া বলিল আহা'। শরৎচন্দ্র এতেও সন্তুষ্ট নন, তিনি আরও এক ভয়াবহ চিত্র আঁকলেন—'ব্রাহ্মণের মৃতদেহ হইলেও পাড়াগাঁয়ে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিল না, কাজেই চন্ডাল আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। তারপর কোন শুষ্ক পুষ্করিণীর ঘাটে তটে, অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল, কাক শকুন উপরে আসিয়া বসিল, শৃগাল-কুকুর শবদেহ লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল।……'

পার্বতীর বড় আদরের দেবদা এবং চন্দ্রমুখীর প্রিয়তম দেবদাসের শেষ পরিণতিকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে দর্শকের স্পর্শকাতর চিত্তের কথা নাট্যকারকে সর্বদা মনে রাখতে হয়েছে। আর সেইজন্য বসন্ত হয়েছে দেবদাসের শেষ দিনের সংগী। উপন্যাসে বর্ণিত দেবদাসের মৃত্যুর প্রতি শচীন্দ্রনাথ আরও সহানুভূতিশীল হয়েছেন। নাটক যেহেতু ফলিত শিল্প, তাই ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষতা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব নয়। দেবদাসের বীভৎস মৃত্যুর বর্ণনা নাট্যকার একেবারেই বর্জন করেছেন; তার স্থলে দেবদাসের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের পরিণতিকে করুণরসের আধারে পরিবেশন করেছেন।

শেষ অঙ্কটিতে নাট্যকার একাধিক নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। স্বপ্ন-দৃশ্য, গবাক্ষে বসন্তের উঁকি মারা, চোর সন্দেহে চেঁচামেচি—বসন্তের ধরা পড়া এবং সবশেষে মৃত দেবদাসের কাছে পার্বতীর ছুটে আসা পর্যন্ত সমস্ত সিচুয়েশনই নাট্যকার অবাধ কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন। এবং ঔপন্যাসিক যেখানে দেবদাস-পার্বতীর বাল্য-প্রণয়কে বিবাহোত্তর অবৈধ প্রণয়ে পরিণত করে সামাজিক অনুশাসনের বিধিনিষেধকে মেনে নিয়েছেন এবং দেবদাসের ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়েছেন, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেখানে এই অবৈধ প্রণয়ের সত্য ও সৌন্দর্যের দিকটিকে সামাজিক ন্যায়নীতির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই

কারণে পার্বতী স্বামী ভুবনের কাছে দেবদাসের প্রতি তার আমৃত্যু অনুরাগ নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করে, নাট্যকারকে তাই দেবদাস-পার্বতীর পরস্পর গভীর আকর্ষণকে ফুটিয়ে তুলতে বসন্তের মুখে নিম্নলিখিত সংলাপ দিতে হয়েছে।

বসন্ত : দেখা দেবার সময় থাকবে না বলে মন্থর গাড়ী ছেড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসেছিল ভাই, জেনেও যেতে পারলে না জীবনভরে যে স্নেহ তুমি চেয়েছিলে তাই নিয়ে তোমার পার্বতী তোমার কাছে ছুটে এসেছে।

এইভাবে পার্বতীর 'অবৈধ' প্রেমকে সমাজের প্রচলিত ন্যায়-নীতির উর্ধ্বে স্থাপন করে দর্শকের চোখে নিষ্কলুষ রূপ ও মর্যাদা দান করেছেন নাট্যকার।

পার্বতী : দেবদা—চেয়ে দেখ দেবদা, তোমাকে সেবা করবার জন্য আমি আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি, সেবার অধিকার দাও দেবদা—দেবদা—দেবদা।

'স্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র' সহ পার্বতীকে মৃত দেবদাসের কাছে উপস্থিত করানোর মধ্যে সামাজিক ও নৈতিকতার প্রশ্নকে উহ্য রেখে নাট্যকার পার্বতী ও দেবদাসের অমর অমলিন প্রেমের বিজয় ঘোষণা করেছেন কেবল দর্শকরুচি ও 'ইমোশান'কে মনে রেখে।

'পথের দাবী' শচীন্দ্রনাথের আর একখানি নাট্যরূপ। শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসখানি 'দেবদাস'-এর চেয়ে অনেক বৃহৎ। অসংখ্য ঘটনা বিষয়ের ব্যাপ্তি এবং চরিত্রের ভিড়ে উপন্যাসখানি জটিলও বটে। শচীন্দ্রনাথ এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি সূত্রাকারে সাজিয়ে সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন। তিনি মূল উপন্যাসের ঘটনা পারম্পর্য রক্ষা করে এবং প্রয়োজনমত তাতে নতুন দৃশ্য ও সংলাপ সংযোজন করে নাটকীয় গতিবেগও দান করেছেন।

নাটকের ১ অঙ্কের ১ ও ৩ দৃশ্য, ২ অঙ্কের ৪ দৃশ্য, ৩ অঙ্কের ৩ দৃশ্য এবং ৪ অঙ্কের ২ দৃশ্য নাট্যকারের সৃষ্টি—এর সিচুয়েশন ও সংলাপও নাট্যকারের স্বরচিত। বলাবাহুল্য, এইসব দৃশ্য ও সিচুয়েশনের উপাদান অধিকাংশই উপন্যাসের বর্ণনার অংশগুলিতে রয়েছে। নাট্যকার তাকে সম্প্রসারিত করে মূল ভাবকে অবিকৃত রেখে তাতে সংলাপ যুক্ত করেছেন মাত্র। নাটকের শেষ দৃশ্যটিতেও নাট্যকার কিছু কাল্পনিক সিচুয়েশন ও সংলাপের সঙ্গে উপন্যাসের কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে নাটকের প্রয়োজনে এক সূত্রে মিলিত করে সব্যসাচীর বিদায়ের ক্ষণটিকে রূপায়িত করেছেন।

১ অঙ্কের ২ দৃশ্য এবং ২ অঙ্কের ৪ দৃশ্যে ভামোর একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচীর বিপ্লবী তৎপরতার একটা দিককে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন—'ভামোর যে পরিবারের ইঙ্গিতটুকু শুধু দিয়ে শরৎচন্দ্র বুঝিয়েছিলেন সব্যসাচী কেন বর্মাকে কর্মকেন্দ্র করেছিলেন সে পরিবারটিকে আমি নাটকে অনেকখানি স্থান দিয়েচি এবং কাহিনীটিকে ফুটিয়ে তুলেচি সেই পরিবারের কার্যকলাপের সঙ্গে সব্যসাচীকে বারবার জড়িয়ে রেখে। পরিবারের কর্তার ও মেয়ে জামাইদের নাম, সংলাপ এদের নিয়ে যে সব সিচুয়েশন সৃষ্টি করা হয়েছে, সবই আমার কল্পনা।' নাট্যকারের এই স্বীকৃতি থেকে জানা যায় তিনি উপন্যাসের নাট্যরূপদানে কি পরিমাণ স্বাধীন ছিলেন। তিনি নাট্যরূপ রচনায় যথেষ্ট সচেতন ও সতর্কও ছিলেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাবকে অবিকৃত রেখে কাল্পনিক দৃশ্য ও সংলাপ রচনায় তাঁর মৌলিক নাট্যবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—'নাটকের দাবী মেটাতে গল্প উপন্যাসের অংশ বিশেষের পরিবর্তন, বর্জন প্রতিফলন করায় মূল রচয়িতার অসম্মান নিশ্চিতই করা হয়না—যদি না কাহিনী, চরিত্র বা বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপে মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত রেখে নতুন চরিত্র ও সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছেন। শচীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করলেও সমসাময়িক কিছু নাট্যকার ও সমালোচকগণ অনুভব করেননি, সেই কারণে তাঁকে একদিন বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

১ অঙ্ক ১ দৃশ্যে নাট্যকার একটি বার্মিজ পরিবারের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীকে পল্লবিত করে নাট্যরূপ দিয়েছেন। পরিবারের কর্তা থেনমঙের চারটি কন্যা, তাদের স্বামীরা চার জাতের চারটি 'রত্ন-বিশেষ'। থেনমঙের মৃত্যুর পর [illegible] সম্পত্তির অংশ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বেষ ও রেষারেষির সীমা নেই। [illegible] স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করে তাদের ভগ্নী ও ভগ্নীপতিদের [illegible] আচরণ করছে। তাদের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত [illegible]। সব্যসাচীর বিপ্লবী কর্মধারার উপলক্ষ হিসাবে নাট্যকার তাঁকে এই [illegible] করেছেন। এই কাল্পনিক দৃশ্যটি উপন্যাস বহির্ভূত [illegible] সব্যসাচীর [illegible] কর্মতৎপরতাকে বিশ্বাসযোগ্য করা গেছে। [illegible] পরিবারের কর্তা থেনমঙ সব্যসাচীর বিপ্লবী আদর্শে বিপ্লবী বলেই তা

সম্ভব হয়েছে।

দৃশ্যটিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতের জামাইদের স্বার্থপরতা ঈর্ষাপরায়ণতা যেমন রূপায়ণের গুণে হাস্যরসান্বিত হয়েছে তেমনি থেনমঙের চরিত্রটি গাম্ভীর্যে দৃঢ়-তায় এবং উদারতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বল্প পরিসরে নাট্যকার থেনমঙ চরিত্রটির মহত্ত্ব ও মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। গোয়েন্দা-পুলিশ সব্যসাচীর খোঁজে থেনমঙকে চাপ সৃষ্টি করলে সে অনমনীয় ও অবিচল থাকে। ২ অঙ্কের ৪ দৃশ্যে ও ৩ অঙ্কের ৩ দৃশ্যে পুলিশ থেনমঙকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শাস্তির ভয় দেখিয়েও কোন স্বীকৃতি আদায় করতে পারে না।

নাট্যকার উপন্যাসের এই চরিত্রটিকে নতুন রূপে সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনে শচীন্দ্রনাথের আদর্শ 'পথের দাবী'র ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়েছে। বস্তুত, উপন্যাসের এই গৌণ চরিত্রটির বিস্তার ঘটিয়ে তিনি সব্যসাচী চরিত্রকে আরও পরিস্ফুট করেছেন। সব্যসাচীর প্রতি থেনমঙের অপরিসীম শ্রদ্ধা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তার উদারতা, বিপ্লবের জন্য অকৃপণ দান তাকে এক মহান দেশপ্রেমিক রূপে চিহ্নিত করেছে। ২ অঙ্কের ৪ দৃশ্যের শেষ সংলাপটিতে দেশের মুক্তি-সৈনিকদের জন্য তার প্রার্থনা মনে পড়িয়ে দেয় বিখ্যাত উপন্যাস ম্যাক্সিম গোর্কি'র মা উপন্যাসে যীশুর কাছে মায়ের প্রার্থনা।[১]

থেনমঙ : হে তথাগত। জরামৃত্যুর শোক থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে প্রব্রজ্যা নিয়ে তুমি একদিন দ্বারে দ্বারে অমৃত বহন করে ফিরেছিলে। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজকার অমানিশায় যারা দিকভ্রান্ত দিশেহারা মানুষকে পথের সন্ধান দেবার জন্য পথের দাবী নিয়ে পা দিয়েচে, তাদের তুমি রক্ষা কর, তাদের তুমি শক্তি দাও, তাদের প্রতি হও প্রসন্ন।'

১ অঙ্কের ৩ দৃশ্য ও ৪ অঙ্কের ২ দৃশ্যে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ বিপ্লবী সব্যসাচী চরিত্রের সাহসিকতার দিকটিকে আরো বিশদ করার উদ্দেশ্যে রোমাঞ্চকর দুটি দৃশ্য রচনা করেছেন, অবশ্য উপন্যাসের বর্ণিত অংশেই এর উপাদান নিহিত

---

১. 'আমাদের সন্তানরা বেরিয়েছে পৃথিবীতে, তারা চায় আনন্দ, ঘরে ঘরে আনন্দ। ওরা যীশুখ্রীষ্টের নামে সত্যের নামে পথে নেমেছে, রুখে মিথ্যাবাদী লোভীরা আমাদের যা দিয়ে বেঁধেছে, চেপে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে লড়ছে ওরা……'

('মা'—ম্যাক্সিম গোর্কী)

আছে। সিচুয়েশন সংলাপ ও কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র সৃষ্টি করে উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে তিনি নাটকীয় রূপ দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী উপন্যাসে সব্যসাচী মুক্ত মানবাত্মার প্রতীক, যার কাছে—'দেশ মানে…খানিকটা মস্ত বড় মাটি, নদনদী আর পাহাড় নয়।' যার বাইরের দিকটা দয়ামায়াশূন্য রাগদ্বেষহীন পাষাণ স্তূপ—'তার মধ্যে আছে শুধু একটি বস্তু—জননী জন্মভূমি। তার আদি নেই অন্ত নেই ক্ষয় নেই ব্যয় নেই—তার ভয়ানক চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না…'। এ হেন সব্যসাচী চরিত্রকে নাটকীয় করে তোলা দুরূহ, নাট্যকার সে চেষ্টাও করেননি। উপন্যাসে সব্যসাচীর যে দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের ইংগিত শরৎচন্দ্র দিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ কেবল সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে উপরোক্ত দুটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ দুটি নতুন সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছেন।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের তৎপরতায় যখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ উদ্দীপ্ত [illegible] । সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চে (প্রথম অভিনয় ১৯৩৯) সব্যসাচীর বিপ্লবী আবেদনকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে শচীন্দ্রনাথকে দুই-একটি রোমাঞ্চকর দৃশ্য রচনা করতে হয়েছে—যেখানে স্বয়ং সব্যসাচীর হাতে পিস্তল গর্জে ওঠে অথবা সিঙ্গাপুরের ঘাঁটির খবর জানার জন্য তাকে টেলিগ্রাফ অফিসে রিভলবার দেখিয়ে কার্য উদ্ধার করতে হয়।

উপন্যাসে সুমিত্রাকে অবৈধ মাদকদ্রব্যের স্মাগলারদের হাত থেকে রক্ষা করার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। শচীন্দ্রনাথ তাকে একটি স্বকল্পিত সিচুয়েশনে নাটকীয় রূপ দিয়েছেন। অবশ্য উপন্যাসের বর্ণনাকে তিনি হুবহু অনুসরণ করেননি। সেলিবিস দ্বীপের ম্যাকেসার শহরের ঘটনাটিকে নাটকে রেঙ্গুনেই ঘটিয়েছেন এবং ঘটনার একটু অদলবদল করে কল্পিত দৃশ্য চরিত্র ও সংলাপ রচনা করেও উপন্যাসের বক্তব্যকে অবিকৃত রাখতে পেরেছেন। নাটকের [illegible] কৈফিয়ৎ স্বরূপ নাট্যকার লিখেছেন—'এইসব প্রক্ষেপ অন্যায় বা [illegible] হয়েছে বলে আমি মনে করি না, কেননা এর কোথাও আমি শরৎচন্দ্রের [illegible] বিরুদ্ধ করিনি, [illegible] দিতে শেষ করেছেন [illegible] । প্রয়োজনে [illegible] । [illegible] ধারণা উপন্যাস বা গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করতে হলে এ [illegible] না নিলে নাটক করা যায় না।'

[illegible] উপন্যাসে [illegible] বিপ্লবের কথা বললেও [illegible] সেখানে

প্রধান হয়ে ওঠেনি। পরাধীনতার গ্লানি যেমন সব্যসাচীর অন্তরে সর্বদাই আগুন জ্বালিয়েছে তেমনি ধর্ম সমাজ ও বর্ণের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, সকল অসত্য অন্যায় ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন; পাশাপাশি মানুষের অন্তরের কোমল অনুভূতি দয়ামায়া স্নেহ ভালবাসাকে দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পুরাতনকে দূরে সরিয়ে নতুনকে করেছেন আহ্বান। উপন্যাসের এই সুগভীর ভাব ও ব্যাপ্ত ভাবনা নাটকের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। শচীন্দ্রনাথ সে চেষ্টাও করেননি। তিনি 'পথের দাবী'র বহিরঙ্গে বিপ্লবী তৎপরতাকেই কেবল তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনে শচীন্দ্রনাথের নৈপুণ্য বাংলার রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের মাপকাঠিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাট্যরূপায়ণে নাট্যকারের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি সমসাময়িক নাট্যকারদের চেয়ে বেশি স্থির-নিশ্চিত ছিলেন। বিরুদ্ধ-সমালোচনার ঝড় তাঁকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর আদর্শ। নাট্যরূপ গঠনে তিনি সচেতন প্রজ্ঞার দ্বারা চালিত ছিলেন—এটাই তাঁর নাট্যকার-বৈশিষ্ট্য।

পরিশিষ্ট

অন্যান্য রচনা

নাটক রচনায় মনোনিবেশ করার আগে ও পরে শচীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সাহিত্য সমাজ নাটক রঙ্গমঞ্চ এমনকি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপরও তাঁর গভীর মননশীল রচনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি একত্রিত করতে পারলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার নেবে। এইসব লেখায় তার সুচিন্তিত মত ও স্বাধীন চিন্তাভাবনায় পরিচয় ফুটে উঠেছে। সাধারণত তিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বশবর্তী ছিলেন না। সাংবাদিকের সত্যানুসন্ধান ও সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিচার করেছেন। অন্যের চোখে যেটা এড়িয়ে গেছে তিনি তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন; দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নাটক রচনা ছাড়া ভিন্ন বিষয়ের ওপরও কয়েকখানা গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। এ পর্যন্ত পাঁচ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—(১) প্রাণ প্রতিষ্ঠা (উপন্যাস, প্রকাশকাল ১৩৩০) (২) চিঠি (পত্র-উপন্যাস) (৩) মরণমহল (রহস্যোপন্যাস) (৪) অবিস্মরণীয় চীন (ভ্রমণ সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪) (৫) মানবতার সাগর সঙ্গমে (ভ্রমণ-সাহিত্য) (৫) বাংলা নাটক ও নাট্যশালা (সমালোচনা গ্রন্থ)। প্রতিটি গ্রন্থের বিষয়-বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলীতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

॥ প্রাণ প্রতিষ্ঠা ॥ রচনাকাল ২৬শে আশ্বিন ১৩৩০। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন 'বইখানা পাঁচবছর আগে লেখা হয়েছিল, তখন Village organisation-এর ধুয়ো ওঠে নাই, পল্লীগঠনের কথা এত শোনা যায় নাই—এখনকার মত কর্মীও বেরোয় নাই। কাজেই ভয় হয় আজ এ পুরনো কথা আর চলবে না।' উপন্যাসটি তৎকালীন শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত বিজলী কাগজে (সম্ভবত, [illegible] বিজলী'র সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং শচীন্দ্রনাথ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর জন্মস্থান সেনহাটি গ্রামের সেনহাটী কৃষ্ণচন্দ্র

মেয়েদের পল্লীসেবার কাজে এই বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান করেন। বইটিও তাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

লেখক জীবনের শুরু থেকেই শচীন্দ্রনাথ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলীর প্রভাব তাঁর বিভিন্ন রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শরৎচন্দ্রের বোহেমিয় জীবনের সংগেও শচীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের প্রচুর মিল লক্ষ্য করা যায়। বাঁধাধরা পথে কেউ অগ্রসর হননি, বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও ছিল তাঁদের। সম্ভবত, ব্যক্তিত্বে মানসিকতায় ও প্রকৃতিতেও তাঁরা সমধর্মী ছিলেন।

আলোচ্য উপন্যাসে শচীন্দ্রনাথের ভাষা ও রচনাভংগিতে শরৎচন্দ্রের অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায়। কিছু কিছু অংশের পাত্রপাত্রীর সংলাপ পড়ে মনে হয় শরৎ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের প্রতিধ্বনি। কেবল ভাষা ও রচনারীতিতে নয়, নর-নারীর চরিত্র ও প্রকৃতি চিত্রণেও শরৎচন্দ্রের প্রভাব অসামান্য। উপন্যাসটিতে পল্লী সমাজ উপন্যাসের ছায়া পড়েছে। তবে শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের বাস্তবতা যত সুন্দরভাবে আঁকতে পেরেছেন শচীন্দ্রনাথ ততটা সফল হননি। কৃত্রিমতাই সেখানে বড় বাধা। লেখক কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে কখনও স্থির থাকেননি, ফলে একাধিক উপকাহিনী যুক্ত হয়ে কখনও গ্রাম আবার কখনও শহরের পটভূমিতে উপন্যাসের গতি পরিক্রমা করেছে। চব্বিশটি পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। পল্লীগঠনের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসা কিছু নরনারীর পল্লীসেবা কর্মের নানা বাধাবিঘ্ন ঘটনা-আবর্তে চিত্রিত হয়েছে।

একটা সাধারণ পাড়াগাঁয়ের (মহেশপুর) ছেলে সতীশ উচ্চশিক্ষা লাভ করে গ্রামের নিপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকের দারিদ্র্য মুক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেছে। গ্রামের ধনী মহাজনদের সুদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করতে কৃষি-ফার্ম গড়ে তুলেছে। সতীশের ধনী পিতা পুত্রের মহান ব্রতের প্রধান সহায়ক। ভগিনী কমলও তার দাদার এই সমাজসেবাকে আন্তরিক সমর্থন করে। এইভাবে সতীশ গ্রামের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র অন্ত্যজ মানুষের প্রিয়জন হয়ে উঠল। কিন্তু হলধর মহিমদের মত কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোকও আছে পল্লীসমাজে। তারা সতীশের ক্রিয়াকলাপ ভাল চোখে দেখল না। গ্রামের যুবকেরা সতীশের সমর্থক হয়ে ওঠায় এবং দুঃস্থ কৃষকেরা মহাজনের সমস্ত টাকা পরিশোধ করার প্রস্তাব দেওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

মূলকাহিনীর পাশাপাশি আরও কয়েকটি উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে। সতীশের বোন কমল ও তার চরিত্রহীন স্বামী জমিদার হেমেন্দ্র পরবর্তীকালে সতীশের সমাজসেবা আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। আছেন ব্রাহ্ম আনন্দমোহন ও তার একমাত্র কন্যা গায়ত্রী যারা সতীশের এই কর্মযজ্ঞের সবচেয়ে বড় সমর্থক। গায়ত্রী সতীশকে গুরু রূপে বরণ করে পিতার মৃত্যুর পর দুঃস্থ পিতৃমাতৃহীন শিশুদের নিয়ে স্কুল গড়ে তুলেছে। সতীশের প্রতি তার নীরব প্রণয়ও গড়ে উঠেছে সকলের অজ্ঞাতে। গোবর্ধন ভৈরব ও তার কন্যা চাঁপার কাহিনীও এর সঙ্গে যুক্ত।

উপন্যাসটি মিলনান্তক। সব দুঃখ ও বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে মানুষের মঙ্গল কামনায় ভুলের সংশোধনে ও প্রেম-প্রীতির নব উদ্বোধনে। শরৎ উপন্যাসের কাহিনী বিষয় ও রচনাশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও এর কাহিনীবৃত্তের সংযম ও বাস্তব চিত্রণ শচীন্দ্র-উপন্যাসে একান্তই বিরল। আসলে শচীন্দ্রনাথের কথাতেই জানা যায়, সে-সময় বিদেশী চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল; এছাড়া ইংরেজী উপন্যাস গল্পও প্রচুর পাঠ করতেন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ শরৎ-চন্দ্রের মত বিদেশীসাহিত্যকে জাতীয় ভাবনায় সাঙ্গীকরণের ক্ষমতা তাঁর ছিল না বলেই মনে হয়। এই কারণে কেবল উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয় পরবর্তীকালে নাটক রচনার প্রথম পর্বে সামাজিক নাটকগুলির ক্ষেত্রেও বাস্তবতায় কৃত্রিমতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

।। **চিঠি** ।। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখকের কথাতেই জানা যায় ১৩২৮-২৯ সালে নারায়ণ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত) পত্রিকায় 'চিঠির গুচ্ছ' নাম দিয়ে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে এই 'চিঠিরগুচ্ছ'-র সঙ্গে আরো নতুন দু'চারখানি চিঠি যুক্ত হয়েছে। প্রাপ্ত জীর্ণ গ্রন্থে প্রকাশের তারিখ জানা যায় নি, সম্ভবত পাতাটি নষ্ট হয়ে গেছে। তবে আনুমানিক ইং [illegible]-২৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়।

এটি একটি অভিনব পত্র-উপন্যাস। সম্পূর্ণ চিঠির মাধ্যমে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর [illegible] ও অন্তঃরহস্য উন্মোচিত হয়েছে। তিনটি গুচ্ছে চিঠিগুলি [illegible]। শচীন্দ্রনাথের শিল্পসুষমামণ্ডিত সাহিত্যভাষা এবং ভাব প্রকাশের [illegible] অভিনব আঙ্গিকে রচিত দীর্ঘ উপন্যাসটিকে বিশেষ মূল্য দান [illegible]

নারীপুরুষের সম্পর্ক ব্যাখ্যায় তিনি তাঁর উপন্যাসে ও নাটকে সর্বত্র নারীর মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে শচীন্দ্রনাথ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনাদর্শের প্রায় কাছাকাছি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মোহিত তার ভাবী স্ত্রী সম্পর্কে বন্ধু নরেশকে লিখছে—'আমি শুধু দেখব সে যেন নিজেকে দাসী মনে করে সর্বদাই খাট হয়ে না থাকে, আর আমিও যেন স্বামীত্বের দাবী করে তার ভিতরের নারীত্বকে গলা টিপে মেরে একটা জীবনকে একেবারে ব্যর্থ করে না ফেলি।'

শরৎচন্দ্রের প্রভাব শচীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির মধ্যে সুপরিস্ফুট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নারায়ণ পত্রিকায় 'চিঠির গুচ্ছ' প্রকাশের চার বছর আগে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী গল্পটি (১৩২৪ সালের শ্রাবন ও ভাদ্র) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।[১] এই সময় শরৎ-গদ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রভাব শচীন্দ্রনাথের ওপর পড়া অস্বাভাবিক ছিল না; কেননা তিনিও পরবর্তীকালে 'নারায়ণে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। আর 'চিঠির গুচ্ছে' যেমন সমাজে নারীর মর্যাদা ও নারীত্ব নিয়ে আলোচিত হয়েছে, তেমনি এর তিন বছর আগে 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাণ প্রতিষ্ঠা (১৩২৫ সাল) উপন্যাসটিতে তিনি স্বদেশ ও সমাজসেবায় নারীর ভূমিকার কথাও তুলে ধরেছেন। বাঙালী গৃহবধূ ও বিভিন্ন নারী চরিত্র চিত্রণেও শরৎচন্দ্রের প্রভাব তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। বাঙালী গৃহের মমতাময়ী বউদিদিদের সোদরোপম দেওরের প্রতি স্নেহ ও প্রীতির যে রূপ দেখা যায় এই 'চিঠি' পত্র-উপন্যাসে তাও চিত্রিত হয়েছে—'বিদেশে কত কষ্টই পাচ্ছ। ঠাকুর চাকরের ওপর নির্ভর। মাইনে করা লোক দিয়ে কি সব কাজ চলে? তোমার দাদাটি কিন্তু মোটেই ভাল লোক নন। দুনিয়ার স্বার্থপর, আর বুদ্ধিতে যে একটু খাট, এতদিনে তাও আমি আবিষ্কার করে ফেলেচি!'

নারী জাতির বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে মোহিত ও নরেশের মধ্যে যেসব চিঠির আদানপ্রদান চলে তাতে শচীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। মোহিত অপর একটি চিঠিতে নরেশকে লিখছে—'মেয়েদের

১। দ্রঃ শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২—৩
দ্রঃ শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা—[illegible] দে সরকার, পৃঃ ৮—৯

বন্ধন-রজ্জু শিথিল করে দিতে বল্লেই আমরা বাসন মাজবার লোক পাব না আশঙ্কা করে চেঁচিয়ে উঠি। সংসারে সব চাইতে বড় কাজই হচ্ছে ওই বাসন-মাজা।...' নতুন ও পুরাতন সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ চিরদিন প্রগতিশীল দৃষ্টি-ভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। পূর্বোক্ত চিঠিতে মোহিতের মুখ দিয়ে আবার বলেছেন—'নতুন করে গড়তে হলে পুরাতনকে প্রয়োজন মত ভাঙতেই হবে। বৈদিক যুগ হতে সুরু করে ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়েই আমাদের এই জাতি গড়ে উঠেচে। আমাদের মাঝে যা কিছু অসত্য, যতরকম ভুলভ্রান্তি সব এমনি করেই বিদূরিত হয়েচে। সনাতন বলে যা কিছু আমরা পেয়েচি তা হচ্চে এই ভাঙ্গা-গড়ার ফলস্বরূপ। এ জাতি ভাঙ্গাগড়ায় যদি চিরদিনই ভয় পেয়ে আসত ; তা হলে কি দুনিয়ায় আজ টিঁকে থাকতে পারত ?

এই পত্র-উপন্যাসে লেখক নারী-স্বাধীনতা নারীত্ব, সমাজ ও দেশ গঠনে নারীর স্থান নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের মত শচীন্দ্রনাথও সারা জীবনের সাহিত্য সাধনায় নারীকে বিভিন্ন রূপে ও ভূমিকায় চিত্রিত করেছেন। নারীর মূল্য অনুসন্ধান করেছেন 'সতীত্বে'র মধ্যে নয়, নারীত্বের জাগরণে। তাঁর নাট্যসাধনার প্রথম ফসল রক্তকমল নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি ছিল ভ্রষ্টা নারী, কিন্তু নারীত্বের পূর্ণ রূপ তার মধ্যে ফুটে উঠতে দেখি।

দেশ ও জাতি গঠনে নারীর স্থান উপলব্ধি করেছিলেন শচীন্দ্রনাথ ; নারী মুক্তির পথ ও উপায় নিয়েও তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল। নরেশ তার একটি চিঠিতে মোহিতকে এ বিষয়ে লিখছে—'একটু ভেবে দেখলেই ত বেশ বুঝতে পারবে যে নারীকে বাদ দিয়ে যারা জাতি গড়তে চায় ; তারা যেমন ভ্রান্ত, তেমনি ভ্রান্ত তারা, যারা বলে পুরুষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে নারী তার আপনার গতি আপনিই নির্ণয় করে নেবে।'

নরেশ মোহিতকে জানিয়েছে, সে নারীদের স্বাধিকার অর্জনে সমাজের প্রতি কোন বলপ্রয়োগে পক্ষপাতী নয়। তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি—'তুমি চাও সমাজের সংস্কার সাধন করতে নির্মম শক্তি প্রয়োগে। তোমার এই বলপ্রয়োগে নারীর স্বাধিকারলাভে কতটা সহায়তা করবে তাই একবার দেখা যাক। তুমি আঘাত করে যাদের বুকে ব্যথা দেবে। কেমন করে প্রত্যাশা করতে পার যে তারা তোমার কাজের মর্যাদা করতে আগ্রহী হবে? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিচালিত করবে তারা স্বভাবতই ন্যায় অন্যায় বিচারে

প্রবৃত্ত না হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণই করবে।' নারীদের স্বাধিকার অর্জনে নারীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, পুরুষেরা তাদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনা—"বিজ্ঞেরা অনেক সময় বলে থাকেন নারীর উন্নতি করতে যারা চায়, তারা নারীর সত্যিকার আসন কোথায় হওয়া উচিৎ তা বোঝে না। সমাজে নারীর স্থান নির্ণয় করবার অধিকার পুরুষের নেই; নারী নিজেই তার আসন যথাস্থানে স্থাপন করবে নইলে সে সত্যিকার আসন হবে না।'

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবে নর নারীর সামাজিক সম্পর্কে নারীর অবস্থান মূল্যায়ন করে দেশ ও জাতি গঠনে তাদের অধিকার দানের আহ্বান জানানো হয়েছে। উপন্যাসটিতে কাহিনী অংশ খুব বেশি নেই, তথাপি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে এর রচনাগুণে ও মননশীল উপস্থাপনায়।

।। **মরণমহল** ।। প্রকাশের তারিখ ও রচনাকাল জানা যায় না। শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত সালতারিখহীন এই রহস্যোপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণের কপি (১৫৬ পৃষ্ঠার বই, মূল্য-দুই টাকা) দেখে এবং অন্যত্র তথ্য-সূত্র থেকে অনুমান করা যায় এটি শচীন্দ্রনাথের ১৯২৯ সালের সামান্য আগে বা তৎসময়ের রচনা।

একসময় অনুশীলন সমিতির সদস্য থাকাকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে তাঁকে ত্রিপুরা-আসামের পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকতে হয়। এই সময় তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা। 'মরণমহল'-এর পার্বত্য অঞ্চল সম্ভবত এই ত্রিপুরা-আসামেরই পার্বত্য অঞ্চল। রহস্যোপন্যাস লেখার পক্ষে এমন উপযুক্ত প্রাকৃতিক পটভূমি বাংলাদেশেও বেশি দেখা যায় না। গ্রন্থের কল্পিত কাহিনীটি নিম্ন রূপ ঃ

বিশাল নির্জন নিঃস্তব্ধ অরণ্য ছোটবড় টিলা আর পাহাড়। অদূরে খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদী। তার প্রশস্ত বুকের গভীরে লুকায়িত পাহাড়। এই ব্রহ্মপুত্রেরই বুকের ওপর ছোট্ট মায়ামহল দ্বীপ—লোকে বলে মরণমহল। বহুকাল ধরে জনশ্রুতি মায়ামহলের ধ্বংস আসন্ন। এক মহাপ্রলয়ে এই দ্বীপের অধিবাসীরা (সবশুদ্ধ উনত্রিশজন) সকলেই মৃত্যু বরণ করবে।

এই ধারণাকে কেন্দ্র করে রহস্যোপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র ডাঃ রাঘবেন্দ্র সামন্ত নামক এক কুটিল দুর্দান্ত প্রকৃতির চরিত্র। যে নারীকে দেখে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। ব্যভিচারের মধ্যে যার উল্লাস; তার অতীত

ইতিহাস উচ্ছৃংখলতায়।

একদা আসামের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে এক বিলাসী রাজা ছিল। একজন সুন্দরী নর্তকীর গর্ভে রাজার ঔরসে জন্ম নেয় রাঘবেন্দ্র। নর্তকী একদিন রাজার সঙ্গে নৌ-বিহারে গেলে সকলের অলক্ষ্যে রাজাকে ধাক্কা দিয়ে খরস্রোতা নদীতে ফেলে দেয়। তার আশা ছিল রাজার মৃত্যু ঘটলে তারই পুত্র রাঘব হবে রাজা। কিন্তু তা হলো না। রাজার মৃত্যুর পর সর্দাররা পরামর্শ করে নর্তকীকে তাড়িয়ে দেয়।

শিশুপুত্রকে নিয়ে নর্তকী মরণমহলে এসে এক পলাতক খাসিয়া সর্দারের আশ্রয় গ্রহণ করল। এই মরণমহলেই আছে বহুদিন ধরে রক্ষিত এক দৈব পাথর। জনশ্রুতি—পাথর যার করায়ত্ত হবে, সে হবে পৃথিবীর অধীশ্বর আর অনন্ত জীবনের অধিকারী। নর্তকীকে বশে রাখবার জন্য পলাতক সর্দারটি দিনের পর দিন তাকে বোঝায় যে তার পুত্র একদিন রাজা হবে ; দৈবপাথর অধিকার করে সে বিশ্ব জয় করবে। তাই, সেই বাল্যকাল থেকে রাঘবের মনেও রাজা হওয়ার বাসনা বদ্ধমূল হয়। নর্তকীর মৃত্যুর পর সর্দার রাঘবকে তাড়িয়ে দিলে খ্রীস্টান মিশনারীরা তাকে আশ্রয় দেয় এবং লেখাপড়া শেখায়। এরপর তার জীবনে ঘটে নানা ঘটনা। দুইটি বিবাহ, যুদ্ধে গমন ও পলায়ন ; সেইসঙ্গে ব্যভিচারী জীবনের প্রতি আসক্তি—নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাঘবেন্দ্র দীর্ঘ আত্মগোপনের পর মরণ মহলের জটিল কাহিনীর নায়ক রূপে দেখা যায়।

মাতঙ্গিনী ও শান্তা রাঘবের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী। অপরূপ সুন্দরী শান্তাকে বিয়ে করে রাঘব খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের উভয়েরই ছিল একটি করে পুত্র সন্তান। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পরোয়ানার ভয়ে সে মরণমহলে এসে হাজির হয়। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মাতঙ্গিনী ও তার পুত্র দুর্জয় এখানে তার সকল কুকর্মের সহায়ক। শান্তা স্বামীর উচ্ছৃংখলতাকে [illegible] ঘৃণা করত ; আর রাঘব তাকে চরম অত্যাচারে জর্জরিত করে [illegible] যুদ্ধে চলে গেলেও সুন্দরী স্ত্রীকে ভুলতে পারেনি। তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে রাঘব মরণমহলে এসে উঠলে শান্তাকে সে আবার পেতে [illegible] ছিল। মাতঙ্গিনীর নির্দেশিত সংকেতের সাহায্যে [illegible] পুত্রের খোঁজে মরণমহলে এসে উঠল। সে জানত, তার [illegible] করেছে। কিন্তু রাঘবের চক্রান্তে [illegible]

প্রথম স্ত্রী ও পুত্রের নৃশংস ষড়যন্ত্রে শান্তার পিতা এবং মায়ামহলের উনত্রিশ জন নরনারীর মৃত্যু হয়। এরপর রাঘবের শেষ শিকার শান্তা ও তার ছেলে অমিয়। পাশবিক কামনা চরিতার্থ করার জন্যও সে শান্তাকে পেতে চাইল। অন্যথায় তাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে এবং প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তাকে চতুর্থ ক্রুশবিদ্ধ নারীর স্থান নিতে হবে। শান্তা প্রত্যাখ্যান করল তার আবেদন। ফলে, শান্তা পুত্র অমিয় আর তার মাষ্টারমশায় প্রফেসর হালদারের ওপর পীড়ন শুরু হল। ইতিমধ্যে ডিটেকটিভ বিশ্বনাথের আবির্ভাব। বিশ্বনাথ ও তার সহকারীরা দৈব পাথরের রহস্যভেদ করে প্রচলিত ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। দৈব পাথরটি যে বহুমূল্যবান রেডিয়ম সমৃদ্ধ পাথর ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথাও জানা যায় বিশ্বনাথের মুখে। বিশ্বনাথের কৃতিত্বে শান্তা ও অমিয়ের উদ্ধারলাভ; রাঘবেন্দ্রকে মরণমহলে ক্রুশে বেঁধে রেখে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন। পরে সাগরেদদের হাতেই রাঘবেন্দ্র মৃত্যু বরণ করে পাপের প্রায়শ্চিত্য করে।

সতেরোটি পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। সাধু ও চলিত ভাষার স্বচ্ছন্দ সাবলীল ব্যবহার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষাকে মনে পড়িয়ে দেয়। পরবর্তীকালে শচীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষাও একে অনুসরণ করেছে। উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রই প্রাণবন্ত। মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি, নারীর কমনীয়তা বাৎসল্য প্রণয়াবেগ বর্ণনার গুণে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, শচীন্দ্রনাথের নাটকের অতি-আবেগ ও অতি-নাটকীয়তার লক্ষণ তাঁর উপন্যাসেও স্পষ্ট, যা অনেক সময় অবাস্তব বলে মনে হয়।

এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যে রহস্য ও অপরাধপ্রবণতা বর্তমান, পরবর্তীকালে শচীন্দ্রনাথের অনেকগুলি মঞ্চসফল সামাজিক নাটক—ঝড়ের রাতে, তটিনীর বিচার, জননী, নার্সিংহোম-এ এর প্রভাব পড়েছে। বস্তুত, তাঁর অধিকাংশ সামাজিক নাটকের কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টিতে রহস্য ও অপরাধ-প্রবণতা সক্রিয়।

॥ অবিস্মরণীয় চীন ॥ ১৯৫৪ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী শচীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ১৯৫৩ সালে সারা ভারত শান্তি সংসদ প্রেরিত প্রতিনিধি দলের নেতা রূপে তিনি চীনদেশ পরিভ্রমণ করেন। 'অবিস্মরণীয়

চীন' গ্রন্থে সেই ভ্রমণকে স্মরণীয় রাখার প্রচেষ্টা। সাংবাদিকের দৃষ্টিতে লেখা একটা দেশের সমাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যাযুক্ত হয়েছে এতে। এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় একদিকে যেমন মিশেছে সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসা তেমনি নবমুক্তিপ্রাপ্ত এক মহান জাতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ অনুভূতি ও তাদের দেশ গঠনের সাধনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর 'অন্তরঙ্গ চীন' গ্রন্থে শচীন্দ্রনাথের এই অনুভূতির কথা কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। ১৮: পৃষ্ঠার এই ভ্রমণ পুস্তকটি এগারোটি শিরোনামাযুক্ত পর্বে বিভক্ত।

প্রথম পর্বের নাম 'চিরস্মরণীয় দিন'। এখানে চীনের চেয়ারম্যান মাও-ৎসে-তুং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার মুহূর্তটিকে ধরে রেখেছেন। ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষের কাছে 'চেয়ারম্যান' চিরদিন অনুপ্রেরণার উৎস স্বরূপ। শচীন্দ্রনাথও সেদিন অভিভূত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে সামান্য সময়ের আলাপে। সেই অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন এইভাবে—'চেয়ারম্যান কবি; কবি বলেই দার্শনিক; দার্শনিক বলেই জাতির জীবনদর্শনে তিনি ভুল করেননি এবং কাব্য-প্রণোদিত দার্শনিক বলেই তাঁর দর্শন জীবনরাগরঞ্জিত মনের দর্শন। তাই তিনি স্রষ্টা, শিল্পীর সৃষ্টির মতো তাঁর সৃষ্টি, তিনি বর্তমান প্রাচ্যের সর্বোত্তম শিল্পী।'

চীনদেশের মানুষের অন্তরে অধিষ্ঠিত চেয়ারম্যান মাও-ৎসে-তুং সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে আবেগ প্রকাশিত হলেও, তা অযৌক্তিক ব্যাখ্যায় পর্যবসিত নয়। চীনের মত এক বিশাল দেশের সুদীর্ঘ পরবশতা থেকে মুক্তি লাভের পর এত দ্রুত পরিবর্তন সেখানে কেমন করে ঘটল তা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। আর যার নেতৃত্বে এই পরিবর্তনের পথে দেশ এগিয়ে চলেছে তাঁর প্রতি যে কারও গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে এতে সন্দেহ কি? চীনের বিপ্লব ও [illegible] দেশের উন্নয়নের রূপ দেখে মাও-ৎসে-তুঙ-এর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অসাধারণ ভূমিকার মূল্যায়ন করেছেন শচীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ [illegible]—"মাও-ৎসে-তুং আর তাঁর সহকর্মীরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদী-[illegible] তাড়িয়েছেন।" [illegible] প্রতিক্রিয়াশীল [illegible] অনাচার [illegible] বহিষ্কৃত করে। যে শক্তিকে কাজে [illegible] তাঁর সহকর্মীরা [illegible] সে ছিল কমিউনিস্ট

পার্টির শক্তি। সে পার্টির নায়কও তিনি। উপনায়করা তাঁরই অনুগামী সহকর্মীরা। কিন্তু ক্ষমতা আয়ত্ত্বে পেয়ে তিনি পার্টি শাসন প্রতিষ্ঠিত করলেন না, সমগ্র জাতিকে দিলেন আত্মশাসনের অধিকার, রাষ্ট্রকে হতে দিলেন লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র ; গবর্ণমেন্টকে করলেন জাতীয় গবর্ণমেন্ট। তাঁর পার্টিকে বোঝালেন 'সকল ফুল দলে দলে ফুটে উঠুক, তবেই না বাগান রচনা সার্থক হবে।' তাঁর পার্টিকে বল্লেন—'প্রাণপণে জন-সেবা কর। মানুষকে ফুলের মত ফুটে ওঠবার ব্যবস্থা করে দাও। শক্তির দম্ভ নিয়ে জোর করে তাকে ফোটাতে চেয়ো না। বিশ্বাস রাখ জমি ঠিক মতো পাট হলে, তাতে ঠিক মতো সার পড়লে, উপযুক্ত আবহাওয়ার সঞ্চার হলে, মানুষ পূর্ণ বিকশিত হবে।"

সাধারণত আতিথ্যে মুগ্ধ আমন্ত্রিত ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় আতিশয্য ও আবেগের প্রাবল্য থাকে, শচীন্দ্রনাথের লেখায় তার প্রতিফলন থাকলেও তাঁর সাংবাদিকমন ও সমালোচকের দৃষ্টি কখনই আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। তিনি সেখানকার রেলের কামরায় যথেষ্ট আরামের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যেসব অসুবিধা ভোগ করেছিলেন তা খোলাখুলি ব্যক্ত করেছেন। 'সমবেত নাচগান' শীর্ষক পর্বে তিনি চীনের কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের সংগে বাংলার কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের তুলনা-মূলক বিচার করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সমবেত নাচগানে কণ্ঠের ও যন্ত্রের অপ্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করে চীনের সফল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আবার চীন দেশের সংগীতের তুলনায় আমাদের বাংলা গানের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও বলেছেন—'রচনার দিক দিয়ে এবং সুরের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুলের গান চীনে শোনা সমবেত গানগুলির চেয়ে নিশ্চিতই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু যন্ত্র-সংগীতের সহায়তায় এবং গায়কদের সমবেত প্রয়াসের ফলে চীনের এই গান-গুলি বেশি উদ্দীপনা সঞ্চারে সক্ষম। আমাদের শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্র-নাথের নজরুলের এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের গান গেয়েছিলেন। শ্রোতারা খুশিও হয়েছিলেন। যদি চীনের পদ্ধতি অনুসারে ওই গানগুলি গাওয়া সম্ভব হোতো, তা'হলে তা বেশি ফলপ্রদ হোতো।'

'শান্তি কমিটি' শীর্ষক পর্বে প্রতিবেশী দেশগুলিতে পারস্পরিক শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে চীন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। নবমুক্তিপ্রাপ্ত চীনের সদ্য প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট প্রথমেই সারা চীন পিপলস্ পীস কমিটি নির্মাণ করেন। শচীন্দ্রনাথের ভাষায়—'দেশকে

শত্রু কবল থেকে মুক্ত করেই নয়াচীন শান্তির প্রতিষ্ঠাকেই সবচেয়ে কামনার বিষয় বলে মনে করে—যেমন বিশ্ব শান্তি, তেমন আভ্যন্তরীণ শান্তি। কেননা নয়াচীন উপলব্ধি করে যে ঘরে বাইরে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে নব সংগঠনের কোন প্রয়াস সার্থক হবে না।'

শান্তি কমিটি সম্পর্কে চীন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে শচীন্দ্রনাথ কিছু কথোপকথনের স্মৃতি চারণা করেছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের কাছে শান্তির ধারণা স্বতন্ত্র। তাদের কাছে শান্তি ও সংগ্রামের অবস্থান পাশাপাশি। সংগ্রাম ছাড়া শান্তি যেমন স্থায়ী হয়না, তেমনি সংগ্রাম কেবল শান্তির জন্যই, সাম্রাজ্য বিস্তার বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয়। শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে লিয়াজঁ অফিসর মিঃ উ-র কথোপকথনে শান্তি ভাবনা সম্পর্কে চীন-কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখকের প্রশ্ন—'…যুদ্ধের ভাষায় শান্তির কামনা প্রকাশ করেন কেন?'……আপনারা শান্তি 'পেতে' চান না। 'সংগ্রাম' করে 'জয় করে' নিতে চান। শান্তি কর্মীদেরকে আপনারা বলেন 'যোদ্ধা' তাদের সংঘবদ্ধ করাকে বলেন 'সমাবেশ' করা। শান্তির দাবীকে জোর দেবার তাগিদ উদ্দেশ্যে আপনারা হাঁক দেন 'অভিযান' করবার জন্য। সবই যুদ্ধের ভাষা। বলা কি যায় না যে আপনারা ভাবেন যুদ্ধ, বলেন শান্তি?'

লিয়াজঁ অফিসর লেখকের প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর দিয়ে সন্দেহ নিরসন করেন; একজন কমিউনিস্টের কাছে শান্তির সংজ্ঞা কি পাঠক সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হন—'শান্তির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই শান্তি হরণ করে নিয়েছে যুদ্ধবাজরা, তারা যদি বীজাণু-বোমা, নাপাম বোমা, এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ফেলতে থাকে, তাহলে আমাদের শত আবেদন নিবেদনের ফলেও শান্তি আসবেনা। তাইতো শান্তির কথা ভেবেই 'সংগ্রামে'র কথা ভাবতে হয়, 'সমাবেশ' করতে হয়, 'জয়' করবার প্রেরণা জোগাতে হয়। যুদ্ধবাজদেরকে পৃথিবীর শান্তি অটুট রাখতে বাধ্য করতে পারলেই পৃথিবীর শান্তি, নইলে নয়।'

চীন ভ্রমণ শচীন্দ্রনাথের প্রথম বিদেশভ্রমণ। ইতিমধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে এসেছেন। কমিউনিস্ট [illegible] সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর 'দেশ-উন্নয়ন সম্পর্কে'

তিনি যথেষ্ট পড়াশুনো করেছিলেন। অবিস্মরণীয় চীন গ্রন্থে তিনি কোন মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হননি। স্বাধীন সমালোচকের দৃষ্টিতে এই নব মুক্তি-প্রাপ্ত দেশের ছবি তুলে ধরেছেন ; আদর্শের রূপরেখাকে বিচার করেছেন সততা আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার কষ্টিপাথরে।

॥ **মানবতার সাগর সঙ্গমে** ॥ দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত শচীন্দ্র-নাথের এই গ্রন্থখানি ১৩৬৭ (শ্রাবণ) সালে প্রকাশিত হয়। বিশ্বশান্তি সংসদের আমন্ত্রণে সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি একাধিক সমাজতান্ত্রিক দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের অনগ্রসর শিক্ষা সমাজ অর্থ-নীতির সংগে বিপ্লবোত্তর দেশের উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনা করে বর্তমান পৃথিবীতে তিনি বিশ্বশান্তি ও মানবতা রক্ষার অন্যতম উপায় রূপে সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকার পূর্ব জীবনে নির্ভীক সাংবাদিকরূপে শচীন্দ্রনাথের খ্যাতি একসময় বাংলা পত্রপত্রিকার জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ভ্রমণ পুস্তকে সাংবাদিকের দৃষ্টিতে তিনি ১৯৫৮ সালে তাসকেন্ট উজবেকিস্তান সমরখন্দ রীগা মস্কো ও সুইডেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বর্ণনা করেছেন। এর আগে Modern Review ও অন্যত্র বিক্ষিপ্তভাবে দেশভ্রমণবিষয়ক যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানে সেগুলিও প্রসংগক্রমে স্থান পেয়েছে। তাঁর ১৯৫৩ সালের চীন ভ্রমণ, ১৯৫৭ সালের কলম্বো কনফারেন্সে যোগদান, ১৯৫৫ সালে হেলসিংকি সোভিয়েত রাশিয়া চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত। তথা-কথিত ভ্রমণকাহিনী এটা নয় ; ঐ সব দেশের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান আলোচনা এর সংগে যুক্ত হওয়ায় চিন্তাশীল পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বশান্তি সংসদের (ওয়ার্লড কাউন্সিল অব পিস) সদস্য ছিলেন। সদস্য ছিলেন দিল্লির সংগীত নাটক-আকাদেমীরও। শান্তি মিশনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের তিনি একাধিকবার নেতৃত্ব দিয়েছেন যোগ্যতার সংগে। বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশের সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সংগে পরিচিত হয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে নিজের স্বাধীন দেশের 'ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও অর্থনীতি'র

সঙ্গে ঐসব দেশের তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন নিরপেক্ষ সাংবাদিকের দৃষ্টিতে।

শচীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণী ক্ষমতা অসাধারণ। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও তিনি স্বাধীন ছিলেন, কোন মতবাদ ও আদর্শকে বিনাবিচারে গ্রহণ করেননি। কোন কিছুর মধ্যে ভাল ও মন্দকে সমানভাবে অকপটে প্রশংসা ও নিন্দা করেছেন। তাঁর মন্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে জেনেও উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে তিনি কোনদিন সঙ্কুচিত হননি।

গ্রন্থটির বিশেষত্ব, লেখক কেবল ভ্রমণের ছবিই আঁকেননি, তার সঙ্গে মিশেছে বিদগ্ধ সমালোচকের ব্যাখ্যা ও সুচিন্তিত মন্তব্য। এখানেই তথাকথিত ভ্রমণ পুস্তকের সঙ্গে এর প্রভেদ। গ্রন্থের শেষের দিকে ২৩ নং অধ্যায়টিতে লেখক সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, বিপ্লবোত্তর ও প্রাক্‌বিপ্লব রুশীয়দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সমাজতন্ত্র রূপায়ণে মার্ক্সের তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করতে লেনিন স্টালিন এবং ক্রুশ্চেভের ভিন্ন ভিন্ন মত সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে নতুনত্বের চমক সুস্পষ্ট।

এক যায়গায় তিনি বলছেন—'ভুল্লে চলবে না যে জারদের স্বৈরাচার সম্ভবপর হয়েছিল বলাৎকারের প্রতি রুশীদের কিছুটা শ্রদ্ধা ছিল বলেই। জারদের ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে যারা মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, তারা নিজেদের ডিক্টেটরশিপের সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে আশান্বিত, উৎফুল্ল এবং প্রমত্তও হয়েছিল। লেনিন তাদের আশা-লতার মূলে জলসিঞ্চন করেছেন, তাদের জয়নাদকে স্তব্ধ রাখতে চাননি, কিন্তু তাদের প্রমত্ততাকে প্রশ্রয় দেননি।'

লেখক রাশিয়ার বিপ্লব কেবলমাত্র কার্ল মার্ক্সের তত্ত্বের হুবহু প্রয়োগে উদ্ভূত বলে মানতে রাজী নন। মার্ক্সের তত্ত্বের উপযোগিতাকে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে গ্রহণ ও বর্জন করার মাধ্যমে লেনিন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি মনে করেন—'লেনিন মার্ক্স সংহিতা থেকে প্রেরণা নিয়ে বিপ্লবের মাঝে অবতীর্ণ হলেও...ধ্বংসের তাণ্ডবে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন না। তিনি ডক্‌ট্রেনিয়ার ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক উপলব্ধিও ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম এবং তাঁর মানবপ্রেম একেবারে হৃদয়বিহীন বিজ্ঞানগ্রাহ্য বস্তুমাত্র ছিল না।...মানুষের শক্তি ও দৌর্বল্য তিনি পদে পদে বিবেচনা করতেন। মার্ক্সের আপসবিহীন সংগ্রাম অপরিহার্য জেনেও

তিনি অনেকক্ষেত্রে তা পরিহার করেই চলতে চেয়েছেন এবং আপসও বড় অল্প করেননি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িক প্রয়োজন বোধে তিনি ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যবসা চালাবার অনুমতি দেন, বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেন। এর পরের বছর অনুরূপ চুক্তি করেন জার্মানীর সঙ্গে। তার তিনবছর আগে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেস্টলিটোভস্কে জার্মানীর সঙ্গে সন্ধির দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জার অধিকারভুক্ত ফিনল্যান্ড, এসথোনিয়া, লিভোনিয়া, কুরল্যান্ড, লিথুয়েনিয়া এবং রুশী দখলিকৃত পোল্যান্ড বিনাক্ষতিপূরণে জার্মানীর হাতে তুলে দেন। এর চেয়েও বড় কথা, যে বিখ্যাত ল্যান্ড-ডিক্রী-মারফৎ কৃষকদেরই জমির মালিক বলে ঘোষণা করেন; তাও পরবর্তী দিনে প্রয়োজনবোধে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ট্রটস্কি, জিনোবিভ প্রভৃতিকে বিশ্ববিপ্লব ঘটাবার অসহিষ্ণু প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত রাখেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে এই শান্তি কামনার, এই সংযমের, এই সাময়িক আপসের আবেদন ছিল না। কিন্তু লেনিন ওই ম্যানিফেস্টোর সংকল্প-ঘোষণার অংশটাকেই আসল বস্তু বলে মনে না করে ওর যে অংশটায় নব-সংগঠনের নির্দেশ ছিল তাকেই কার্যকর করলেন।......'

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোয় মার্ক্সের এবং অকটোবর বিপ্লবে লেনিনের অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশলকে পাশাপাশি রেখে শচীন্দ্রনাথ যে দৃঢ় স্বাধীন মত প্রকাশ করেছেন তাতে যুক্তির ধার স্পষ্ট। ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা ছিল সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আবেদন থেকে। কিন্তু জার শাসিত রাশিয়ার প্রচলিত সামাজিক অনাচার ও অবিচার থেকে উদ্ভূত যে বৈপ্লবিক শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল তার সামনে কোন বড় আদর্শ ছিল না—'তকে সফল করে তোলবার জন্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অবলম্বন করে যে অক্টোবর বিপ্লব অনুষ্ঠিত হোলো তা কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের মতো সব বিধ্বংসী হয়ে উঠল না। এমনকি ম্যানিফেস্টো যাদেরকে ধ্বংস করে দেবার আস্ফালন করেছিল সোবিয়েৎ শক্তি তাদেরকেও ধ্বংস করার জন্য ধৈর্যহারা হয়ে উঠলনা।......'

এই পরিচ্ছেদের শেষের দিকে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাহিত্য নিয়েও আলোচনা করেছেন। সাহিত্যে কঠোর বাস্তবের প্রতিফলন, দলীয় আদর্শের প্রচারকে আমাদের দেশের অনেকের চোখে শিল্প-বিরুদ্ধ বলে তিনি জানতেন।

বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের নামোল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন সেগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির, কারখানা শ্রমিকদের জীবনযাত্রা,

দেশ উন্নয়নের কথা থাকলেও তা সাহিত্য হয়ে উঠতে বাধা পায়নি। তিনি সমাজতান্ত্রিক দেশের এই সাহিত্যের ধারাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সার্থক মনে করেন এবং পাশাপাশি নিজের দেশের সাহিত্যিকদের ভূমিকাকেও কঠোর সমালোচনা করেন।[১] একজন শিল্পীর স্বপ্ন কিভাবে একটা সমগ্র জাতির উন্নয়ন চেতনাকে অধিকার করতে পারে, স্বদেশ তথা সারা বিশ্বের সমৃদ্ধিকে স্বপ্নের বিষয় করে তুলতে পারে, আজকের রুশীয় সাহিত্যের মধ্যে তা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Modern Review পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত 'My Pilgrimage to Helsinki, USSR & Czechoslovakia' নামক একটি নিবন্ধে শচীন্দ্রনাথ রাশিয়ার নবজাগ্রত চেতনার কথাই সর্বত্র বলেছেন—"Formarly artists were a fraternity of dreams, and arts were more like mere expression of dreams. I do not belittle dreams. There are dreams without which life seems to be hardly worth-living. Pushkin, Tolstoi, Chekhov, Turgenev and even Gorky, each of them, had dreams of dream. The difference that is noticed today is that the fraternity of dreamer-artists have been widened to include the entire Community within it and arts have been more than mere expressions of dreams that the entire Russian people dream to-day to make their land and the world wonderful to live in……(M. R. for Nov. 1956 ; P-396)

১. 'আমাদের সাহিত্যে আজ প্রয়োজন ছিল চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, টাটা, ভিলাইকে গৌরব দেওয়া, ভাকুরা-বাখ্‌রা-দামোদর কর্পোরেশনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলা, গ্রাম-পঞ্চায়েতকে, কো-অপারেটিভ ফার্মিংকে অসীম কল্যাণকর বোঝাবার চেষ্টা করা। কিন্তু একদল ভাবছেন তাতে করে সাহিত্য প্রচারণার দোষে দুষ্ট হবে। তারা তাই আজকার প্রয়োজন উপেক্ষা করে সাহিত্যকে ন্যাশানাল করতে চাইছেন ইংরেজ সংসারের গোড়ায় চিত্র ফলিয়ে ধরে। খুবই বিস্ময়ের কথা আমাদের রাষ্ট্রনায়করা দুঃখ প্রকাশ করছেন নব-সংগঠনের দেশব্যাপী উদ্দীপনায় পরিচয় পাচ্ছেন না বলে, আর সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার দিচ্ছেন সেই সব সৃষ্টির জন্য যার সঙ্গে জাতির জীবনের, অনুভূতির আদর্শের প্রত্যক্ষ যোগ নেই।' (মানবতার সাগর সঙ্গমে—পৃ ২৩৯)

ভ্রমণ কাহিনীর আঙ্গিকে লেখা গ্রন্থটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাংবাদিক সমালোচক ও সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথের গভীর রাজনীতি অর্থনীতি ও ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, রাশিয়া তথা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার আলোকেই বিচার করেছেন, সেখানে কোন কিছুর দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হতে চাননি। গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে লেখা 'ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব' এবং জহরলালের 'বেসিক অ্যাপ্রোচ' প্রবন্ধে কথিত 'বল প্রয়োগে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা'—এই দুই উক্তিরও যুক্তির সংগে বিরোধিতা করেছেন। নব্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমাদের স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মান তুলনামূলক দীর্ঘ আলোচনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি তাঁর স্বাধীন মত দৃঢ়তার সংগে প্রতিষ্ঠা করেছেন—'কে বিশ্বাস করত যে চাষী মজুরদের ঘরের ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সৃজনী শক্তির যে উৎস যুগে যুগে জমে ওঠা আবর্জনার স্তূপে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিভার প্লাবন সৃষ্টি করবে? প্রতিভার প্লাবন না এলে এমন বিরাট সৃষ্টি ত সম্ভব হোত না। সে প্রতিভাবানরা কি রবট, না ব্যক্তি স্বাধীনতাহারা দাস? চাবুক চালিয়ে কি প্রতিভা ম্যানুফাকচার করা যায়? যদি যেত তাহলে কোন রাষ্ট্রই 'আনডেভেলপড্' অথবা 'আন্ডার ডেভেলপড্' থাকত না।"

ভ্রমণকালে যেখানেই নতুন কিছু দেখেছেন তখনই তার পেছনে তিনি কারণ খুঁজেছেন, ব্যাখ্যাও দিয়েছেন; বলাবাহুল্য তা অপরের ভাবনা থেকে সংগৃহীত নয়, নিজের স্বাধীন চিন্তাভাবনারই ফসল।[১] মানবতার মহাসমুদ্রে মিলিত হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি, সেখানে ভ্রমণের সুযোগ লেখকের জীবনে আলোড়ন এনেছে বোঝা যায়। কিন্তু আবেগের অধীরতায় তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। তাই এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী নিছক প্রশস্তি মূলক না হয়ে কখনো কখনো সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছে। ভ্রমণ কাহিনী তাঁর হাতে হাল্কা, রম্য গদ্যের বর্ণনা সর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। অবশ্য

১. বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত গায়ক শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস তাঁর 'অন্তরঙ্গ চীন' গ্রন্থে শচীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসু মনের ছবিটি এক জায়গায় তুলে ধরেছেন। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে চীনদেশে প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের নেতা ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। (দ্রঃ 'অন্তরঙ্গ চীন'—পৃ:১২)

এই বিশেষ আঙ্গিকের পেছনে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর প্রভাবই কাজ করেছে।

॥ বাংলা নাটক ও নাট্যশালা ॥ প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪। এই গ্রন্থে শচীন্দ্রনাথ বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ওপর ক্রম-ইতিহাস রচনা করেননি। বরং এটিকে একটি সমালোচনা-সংকলন গ্রন্থ বলা যেতে পারে। কেননা গ্রন্থকার এক জায়গায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি ইতিহাস লিখতে বসেননি। সে কারণে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করার তাগিদ অনুভব করেননি। এই গ্রন্থ তাই বাংলা নাটক ও নাট্যশালার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলা যাবে না। লেখক নিবেদন অংশে লিখেছেন—'প্রায় ত্রিশ বছরকাল বাংলার নাট্যশালার নানা প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত থেকে, বাংলা নাট্যশালার জন্য নানা ধরনের নাটক লিখে, পৃথিবীর নানা নাট্য আন্দোলনের বহু নায়কের সঙ্গে আলাপ আলোচনার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে আমাদের নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা জন্মেছে, তাই আমি বোঝাতে চেয়েছি।

সকল বাংলা নাটক ও নাট্যশালা নিয়ে আমি আলোচনা করিনি, মূল ধারাটি ধরেই শুধু অগ্রসর হয়েছি।'

গ্রন্থের বিষয়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণও আছে। 'সংগ্রাম ও সংগঠন' পরিচ্ছেদে স্বদেশীযুগের ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনের ঐতিহাসিক নাটকের তুলনা করে এই দুই যুগের নাট্যকারদের 'দৃষ্টিকোণ'-এর পার্থক্য তুলে ধরেছেন। এই দুই যুগের নাট্যকারদের যে নাটকগুলি আলোচনা করেছেন তা' হল গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'ছত্রপতি শিবাজী' 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাশিম' 'প্রতাপাদিত্য' এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (লেখক) ও মন্মথ রায়ের 'গৈরিক পতাকা' 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাশিম' 'বাংলার প্রতাপ' 'কারাগার'। এই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' ও 'মেবার পতন' নাটকের উল্লেখও করেছেন।

'সংগ্রাম ও সমন্বয়' শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি সমসাময়িক নাট্যকারদের সামাজিক নাটকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা উপন্যাসের নাট্যরূপ ও বিদেশী নাটকের বাংলায় রূপান্তর প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করেছেন। নাটকের ভাব ও বিষয় জাতীয় সংস্কার ও দর্শকরুচির সমান্তরালে রেখে বিচার করেছেন এর মঞ্চসাফল্য ও অসাফল্য। 'নাটক ও দর্শক' শিরোনামেও

এই দর্শক মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখতে পাই।

'ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলাল ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' শীর্ষক আলোচনায় বাংলা রংগমঞ্চে তাঁদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসংগে লেখক দশের দাবী নাটকে শিশিরকুমারের অভিনয় ও তাঁর অনুভূতি বর্ণনা দিয়েছেন।

'আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির' শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর নিজের নাটক ও দর্শক-রুচির প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। 'নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারের পরবর্তীকাল' সম্পর্কে ১৯৪২ সালের আগে 'দ্বাদশ বছরে' বাংলা নাটক প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি সাজিয়েছেন এইভাবে—নাটক ও নাটকাভিনয়ে সময় সংক্ষেপ। ওয়াগান ও ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তনের ফলে নাটক মঞ্চ ও অভিনয় আঙ্গিকে আমূল পরিবর্তন—সতু সেনের অবদান। মুড লাইটের সার্থক ব্যবহার—সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য।

'যুগান্তরের সূচনা' অধ্যায়ে তিনি ১৯৪২ সালের পরবর্তী ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও প্রগতিশীল লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা, জবানবন্দী নবান্ন প্রভৃতি নাটকের জনপ্রিয়তা ও নাটকের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সূচনার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়ে শচীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও 'নব্য সংস্কৃতি' সম্পর্কে একটা নতুন ব্যাখ্যা পাই। শচীন্দ্রনাথের ভাষায়—'স্বাধীনতার আগে থেকেই গণ-জীবন গঠন যাঁরা প্রয়োজন বলে জেনে বুঝে ভারতব্যাপী কাজ শুরু করে দিয়ে-ছিলেন, যাঁরা বুঝেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে যে মোহ বিস্তার করে এসেছে, তা সংস্কৃতির আলো ঢেলে অপসারিত করতে হবে, তাঁরা সোস্যালিজমকে নব-সংস্কৃতি বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।......'

'আজকের সমস্যা' অধ্যায়ে তিনি তৎকালীন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনা করেছেন। যেমন 'ই আজাদী ঝুটা হ্যায়' স্লোগানের বিরুদ্ধতা করে শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'...এই আজাদী বা এই স্বাধীনতা সত্য নয় মিথ্যা এমন কথা বলবার হাজারো কারণ থাকলেও পরবশতা থেকে সদ্যমুক্ত একটা জাতিকে তা বোঝানো শক্ত। আর স্বাধীনতা যখন সত্য, তখন তাকে মিথ্যা বলে লোকে মানবেই বা কেন ? অভিযোগের অসংখ্য কারণ থাকলেই বা নবলব্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিথ্যে হয়ে যাবে কেন ? কোন স্বাধীন রাষ্ট্রই ত আজও পর্যন্ত আদর্শ স্বাধীনতাকে রূপায়িত করতে পারেনি...... ।'

কমিউনিস্ট মতাদর্শের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে থেকে শচীন্দ্রনাথের এই নির্ভীক সমালোচনা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনস্বিতাকে ফুটিয়ে তোলে। বর্তমান কালের দিকে তাকিয়ে ভারতের কম্যুনিস্ট দলগুলির স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে শচীন্দ্রনাথের এই ভাবনা ছিল কত নির্ভুল !

এই অধ্যায়ে নবান্ন দুঃখীরইমান ছেঁড়াতার বাস্তুভিটা তরঙ্গ ইহুদী দলিল প্রভৃতি নাটকের সমালোচনায় লেখক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। গণনাট্যসঙ্ঘ বহুরূপী লিট্‌লথিয়েটার থিয়েটারসেন্টার নাট্য গোষ্ঠীর নাট্য আন্দোলনকে নতুন নিরিখে বিচার করেছেন। এখনেও তাঁর বক্তব্য—এদের নাটকে 'যে ত্রুটি বিচ্যুতিই থাকুক না কেন, বাংলার ব্যথাকে, বাংলার চেতনাকে, বাংলার প্রয়াসকে যে রূপায়িত করেছে, সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ওর একখানাতে কমিউনিজম-এর প্রচারণা নেই, মানুষের কথাই বলা হয়েছে—যে মানুষদেরকে আগেকার বাংলা নাটকে দেখা যায়নি। সে মানুষও বিদ্রোহ করছে না, শুধু প্রকাশ করছে জীবন কী দুর্বিষহ হয়েছে তাই, চাইছে প্রতিকার। প্রতিকার চাইছে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের বহু কর্ণধার এই প্রতিকারের দাবী পছন্দ করছেন না।…'

শচীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা আজকের দিনে অনেকের কাছে প্রীতিপ্রদ না হতেও পারে, কেননা তাঁরা সমসাময়িক চেতনার শরিক নন। কিন্তু 'নবান্ন' নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যও ঐ মত পোষণ করতেন। তাঁর স্বীকারোক্তিতেই এর উল্লেখ আছে—'নবান্ন যখন প্রযোজিত হয়, তখন সে নাটক আমি দেশের কথা ভেবেই লিখেছিলাম, কোন দলীয় রাজনীতি বা বিশেষ মতবাদে প্রভাবিত হয়ে নয়।'

'আগামী কালের প্রস্তুতি' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রসারের জন্য একটি সুপরিকল্পিত দাবি সনদ দেশের সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে পেশ করেছেন—

"(১) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আইন বাতিল করা হোক।

(২) প্রি-সেন্সারশিপ্ রদ্ করা হোক।

(৩) ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত লাভের উদ্দেশ্য নেই, এমন সকল নাট্য-প্রতিষ্ঠানকে প্রমোদ-করের দুর্বহ বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

(৪) কোলকাতা শহরে আরো নাট্যগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হোক, যেখানে

ননকমার্সিয়াল নাটুকে দলগুলি অভিনয় করতে পারেন। রাষ্ট্র পরিচালকদের মনে রাখা উচিত যে, কোলকাতার ন্যায় জনসংখ্যা যে-শহরে আছে, কোন সভ্য দেশে সে-শহরের অধিবাসীরা মাত্র চারটি থিয়েটার নিয়ে সভ্যতার গরব করেনা।

(৫) কর্পোরেশন কয়েকটি বড় পার্কে ওপেন-এয়ার থিয়েটারের মঞ্চ তৈরি করে দিন, যেখানে নাচগান ও নাট্যাভিনয় মারফৎ সমাজকল্যাণের প্রেরণা দেওয়া হবে।

(৬) সরকার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর স্টেট-থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করুন এবং একটি অটোনমাস বডি তৈরি করে ওটি পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করুন। কমার্সিয়াল থিয়েটার ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠান। নাটক ও অভিনয় এবং নাট্য প্রযোজনার মানোন্নয়নের দায়িত্ব সেইসব থিয়েটারের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজও থাকুক, জাতির প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হোক্।

(৭) প্রত্যেক মিউনিসিপালিটিতে একটি করে নাট্যগৃহ তৈরি করা হোক। স্টেট-থিয়েটারের কোন কোন দলকে সেখানে অভিনয় করবার সুযোগ দেওয়া হোক এবং সেগুলিতে সৌখিন সম্প্রদায়গুলিকেও অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হোক।

(৮) প্রত্যেক বড় বড় হাটের কাছে একটি করে ওপেন-এয়ার থিয়েটারের মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হোক। সেখানে স্টেট-থিয়েটারের কোন কোন দলকে এবং সৌখিন দলগুলিকে হাটের দিনে দিনে অভিনয় করতে দেওয়া হোক।

(৯) লিখিত নাটক প্রকাশ করবার জন্য একটি কো-অপারেটিভ পাবলিশিং হাউস গড়ে তোলা হোক।

(১০) এমন কয়েকটা যাত্রাদল গড়ে তোলা হোক্ যারা যাত্রার ট্রাডিশানাল ফর্ম ফিরিয়ে আনবে, থিয়েটারের নকল করবে না।'

॥ **নরদেবতা** ॥ বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নরদেবতা নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় সম্ভবত ছাপার অক্ষরে নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু, নাট্যকারকে বুঝতে হলে নাটকটি'র গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাজ্য সরকারের লেখ্যাগারে রক্ষিত তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশের নথি থেকে এর সামান্য কিছু উদ্ধার করে দেওয়া হল।

১৯৩৫ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে নাট্যনিকেতন-এর অধ্যক্ষ প্রবোধবন্ধু

গুহ বাংলা সরকারের 'প্রেস অফিসর'-এর কাছে লিখিত এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নিষিদ্ধ রাজনৈতিক নাটক 'নরনারায়ণ' সম্পর্কে সম্ভবত সেটাই প্রথম নথিভুক্ত হয়। নথি নং ১০৬২।৩৫। এরপর নাটকখানি নিয়ে তৎকালীন বাংলার ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক নাটকের অভিনয় দেখে এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। বর্তমান পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা শাখার পুরনো নথিতে এই নাটক সম্পর্কে তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা ও মন্তব্য পাওয়া গেছে। তারা নোটে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ও আপত্তিজনক অংশের ইংরেজি অনুবাদ তুলে সমালোচনা করেছেন। কেবলমাত্র এ থেকেই এই অপ্রকাশিত নাটকের বিষয় ও রচনাভঙ্গির পরিচয় যতটুকু পাওয়া যায় তা প্রণিধানযোগ্য।

নাটকটি নাট্যনিকেতনে শুক্রবার শনিবার ও রবিবারে অভিনয়ের জন্য পুলিশের অনুমতি প্রার্থনা করে থিয়েটার মালিক প্রবোধ গুহ আবেদন জানান। তার আগেই ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫ তারিখে নাট্যনিকেতনে ঐ নাটকের অভিনয় দেখে গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক আধিকারিক একটি সুদীর্ঘ রিপোর্টে কঠোর মন্তব্য করেন। নাট্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে শেষের দিকে তিনি লিখেছেন '...To my mind the Performance of the drama is highly objectionable from police point of view...'

গোয়েন্দা বিভাগের আর একজন সাব-ইনস্পেকটর নাটকটির আপত্তিকর দৃশ্য ও সংলাপ-অংশগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে সেগুলি তাঁর নোটে উল্লেখ করেছেন। নোটের শুরুতেই সমগ্র নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'The drama itself appears to be objectionable. The formation of a secret society of revolutionists for murdering the king, high government officials and other prominent persons is highly objectionable. Although king Jashobordhan discovered the secret society yet he did not punish members of the secret society. This is also objectionable. The following passages in the drama may be deleted if the drama be allowed to be staged.

এর পরেই আপত্তিকর সংলাপ ও দৃশ্যগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। মূল বাংলা সংলাপগুলি ইংরেজিতে অনূদিত থাকায় পুনরায় বঙ্গানুবাদ করে দেওয়া

হল। পাশাপাশি গোয়েন্দা পুলিশের ইংরেজি অনুবাদ অংশও হুবহু তুলে দেওয়া হল এ থেকে নাটকের সংলাপ ও আঙ্গিক অনুধাবন করায় বিশেষ বাধা নেই বলেই মনে হয়।

Page 19

Agnibesh : We have not started this Ashram (Secret Society) out of excitement for nothing. we could not tolerate injustice. So we have taken up this task to put a remedy to the injustice.

Saswati : Whose injustice Agnibesh ?

Agnibesh : Injustice of king Jashobardhan.

(অগ্নিবেশ ঃ অকারণে কোন উত্তেজনা বশে আমরা এই আশ্রম তৈরি করিনি। আমরা কোনরকম অবিচার সহ্য করব না। তাই এই অন্যায় অবিচার দূর করার ব্রত গ্রহণ করেছি।

শাশ্বতী ঃ কার অবিচার অগ্নিবেশ ?

অগ্নিবেশ ঃ যশোবর্ধনের।)

Page 21

Agnibesh : Satyakama brings the rules and regulations and forms of vow (of the Secret Society of Revolutionists).

Vow : I am taking vow that from to-day I shall devote my body and mind in the work of the Ashram (Secret Society of the Revolutionists). I shall never disobey the orders of leaders.

(অগ্নিবেশ ঃ সত্যকাম আশ্রমের নিয়মকানুন ও শপথ পদ্ধতি প্রচলন করেছেন। শপথ হল—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আশ্রমের কাজে আমার শরীর ও আত্মা উৎসর্গ করব। আমি নেতাদের আদেশ কখনই অবহেলা করব না।)

Page 50

Bajrapani : My child ! you need not be sorry. I shall uproot the family of king Jashovardhan. Then the slavery of

of your husband will also be removed.

(বজ্রপাণি : কন্যা। দুঃখ কর না। যশোবর্ধনের বংশ নির্মূল করব। তখন তোমার স্বামীর দাসত্ব দূর হবে।)

Bajrapani : ...Oh Nilima ! There will be chaotic disorder which will crush down king Jashovardhan and Prince Amitava.

(বজ্রপাণি :......ওহ্ নীলিমা। যে নৈরাজ্য আসছে তাতেই রাজা যশোবর্ধন ও রাজকুমার অমিতাভের পতন হবে।)

Page 55

Mahacharya : I have sent messages to my disciples at every monastery to spread hatred in the garb of preaching religion. People of Ceylon should learn that king Jashovardhan is a renegade and is a man of loose moral character.

(মহাচার্য : প্রতিটি আশ্রমে আমার শিষ্যদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছি ধর্ম-গুরুর পোশাক পরিধান করে তারা ঘৃণা ছড়িয়ে দেবে। সিংহলের জনগণ জানবে রাজা যশোবর্ধন স্বধর্মত্যাগী ও নীতিভ্রষ্ট।)

Page 55

Kutbajra : I am also taking no steps to suppress the activities of the conspirators at Rudrachakra. Let them become strong. There will be no necesscity of staking our lives if they can dethrone king Jashovardan.

(কূটবজ্র : রুদ্রচক্রে ষড়যন্ত্রীদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার কোন ব্যবস্থাও আমি নিচ্ছি না। তারা শক্তিশালী হোক। যশোবর্ধনকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারলে আমাদের জীবন বিপন্ন করার প্রয়োজন হবে না।)

Ratan Sett : I have made a pact with traders in India that we shall help each other if revolution takes place in Ceylon.

(রতন শেঠ : ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমি একটা চুক্তি করেছি যে সিংহলে বিপ্লব শুরু হলে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব।)

Page 56

Kutbajra : Oh ! Mahacharya, I am not sitting idle. I have engaged my men to excite them (Members of the Secret Society) for taking the life of king Jashovardhan. Not only the king will be killed but even the demarcation line of Ashram Rudra-chakra (Secret Society) will disappear if they do so.

(কুটবজ্র ঃ ওহ্ মহাচার্য, আমি চুপচাপ বসে নেই। যশোবর্ধনকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের উত্তেজিত করার জন্য আমি আমার লোক নিযুক্ত করেছি। তারা ঠিক ঠিক করলে কেবল রাজাই নিহত হবে না, আশ্রম-রুদ্রচক্রের সীমারেখাও বিলুপ্ত হবে।)

Page 68

Nilima : When the God of the power of the masses becomes awakened no king understands what demand He will put up. Some of them have to offer their heads while others are compelled to abdicate their thrones.......

(নীলিমা ঃ গণশক্তির দেবতা যখন জাগ্রত হয় তখন কোন রাজাই বুঝতে পারেনা সে কোন দাবি নিয়ে উপস্থিত হবে। তাদের কেউ কেউ শির উপহার দেয় তখন অন্যরা তাদের সিংহাসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।...)

Page 71

First devotee : We shall punish this audacity of the king.

Second devotee : We shall plunge throne of Ceylon to the ocean of blood.

Third devotee : We Shall make the members of the Royal family paupers.

(প্রথম সন্ন্যাসী ঃ আমরা রাজার এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেব।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী ঃ রক্তসমুদ্রে সিংহলের সিংহাসনকে ডুবিয়ে দেব।

তৃতীয় সন্ন্যাসী ঃ আমরা রাজ পরিবারের লোকদেরকে ভিখারী করব।)

Agnibesh : This should not end in mere Promise.

All : Certainly not.

Agnibesh : you should stake your lives to fulfil your promise.

All : We shall stake our lives to fulfil our promise.

(অগ্নিবেশ ঃ শুধুমাত্র প্রতিজ্ঞাতেই এসব শেষ হয়না যেন।

সকলে ঃ অবশ্যই নয়।

অগ্নিবেশ ঃ প্রতিজ্ঞা সফল করার জন্য তোমাদের জীবন বিপন্ন করতে হবে।

সকলে ঃ জীবন বিপন্ন হলেও আমরা প্রতিজ্ঞা সফল করব।)

Page 72

Agnibesh : Does not Saswati know what a horrible massacre can take place in this Kingdom at her instigation. The throne of the king of Ceylon can be drifted in the current of blood within few days.

(অগ্নিবেশ ঃ শাশ্বতী জানে না তার প্ররোচনার ফলে এই সাম্রাজ্যে কি ভয়ংকর গণহত্যা সংঘটিত হতে পারে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সিংহলরাজের সিংহাসন রক্তস্রোতে ভেসে যেতে পারে।)

Agnibesh : Our mission of life will be fulfilled by destruction.

(অগ্নিবেশ ঃ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে।)

Page 73

Bajrapani : Oh ! Agnibesh ! Please kindle fire. There is no time to lose. The oppresion of king Jashovardhan has reached its climex.

(বজ্রপাণি ঃ ওহ্‌! অগ্নিবেশ! আগুন জ্বালো। এখন নষ্ট করার সময় নেই। যশোবর্ধনের অত্যাচার সহ্য সীমা অতিক্রম করেছে।)

Page 74

Satyakam : Have not our females got any prestige ? How long shall we tolerate these insults ? Shall we silently tolerate the oppressions made by king Jashovardhan, prince Amitava,

minister Kutbajra and merchant Ratan Sett ?

(সত্যকাম ঃ আমাদের স্ত্রীলোকদের কি কোন সম্মান নেই ? আর কতদিন এই অপমান সহ্য করব ? রাজা যশোবর্ধন, রাজকুমার অমিতাভ, মন্ত্রী কুটবজ্র ও ব্যবসায়ী রতন শেঠদের এই অত্যাচার কি আমরা মুখ বুজে সহ্য করব ?

Page 95

Basumitra ঃ When they will enquire who excited you, you should say that you intended to murder the king hearing the speech of Agnibesh. Saswati took you there on the date of occurrance. But at the last moment she obstructed you as she thought that members of her party will be put into trouble.

(বসুমিত্র ঃ তোমাকে কে উত্তেজিত করেছে—একথা যখন তারা জিজ্ঞাসা করবে, তুমি বলবে অগ্নিবেশের বক্তৃতা শুনে রাজাকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ঐ ঘটনার দিন শাশ্বতী তোমাকে সেখানে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে তোমাকে বাধা দেয় কারণ সে ভেবেছিল এর ফলে তার দলের লোকেরা অসুবিধেয় পড়বে।)

Page 98

Mahacharya ঃ Oh ! minister ! The oppression of the king has reached its climex. My favourite disciple and main worker Acharya Basumitra has been imprisoned. Oh ! minister put a remedy to this.

(মহাচার্য ঃ মন্ত্রী ! রাজার অত্যাচার চরমে উঠেছে। আমার প্রিয়তম শিষ্য ও প্রধান কর্মী কারারুদ্ধ হয়েছে। ওহ্ ! মন্ত্রী এর একটা প্রতিকার কর।)

Page 99

Kutbajra ঃ Oh ! merchant ! I have started the factory of industries to fulfil our object. We shall have to maintain our organisation with the money which will be received from the royal treasury for meeting the expenses of the factory. But we should see that suspicion arises in the mind of the king.

(কুটবজ্র : ওহে ব্যবসায়ী। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি শিল্প কারখানা খুলেছি। কারখানার ব্যয় মেটাবার জন্য রাজকোষ থেকে যে অর্থ আমরা সংগ্রহ করব তা দিয়ে আমাদের এই সংগঠনকে চালু রাখতে হবে। কিন্তু রাজার মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।)

Page 102

Kutbajsa : Kirtiprakash ! we are also not weak. We have got the right to protect our personal freedom from the oppression of the king. We shall have to take the help of our sentries if you try to apply force.

(কুটবজ্র : শুনুন কীর্তিপ্রকাশ। আমরা দুর্বলও নই। রাজার নিপীড়ন থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার আমাদের আছে। আমরা প্রহরীদের সাহায্য নিতে বাধ্য হব যদি আপনি শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করেন।)

Page 108

Satyakam : We do not want to hear any thing in favour of king, Jashovardhan.

King : The question put up by Sarbananda is not atall wise. I know that the king is guilty and he deserves punishment.

Agnibesh : All of you should take vow. Here are some leaves of palmtree equal to your number. Names of four guilty persons have been written on four pieces of palm leaves. You shall have to punish guilty persons according to the leaves containing names which will fall to your respective lot.

1st Number : My leaf contains no names.

Agnibesh : The work of punishing Kutabajra has fallen to Kabi.

Darshanik : The work of punishing Ratan Sett has fallen to my lot.

Shilpi : The work of punishing Mahacharya has fallen to my lot.

Agnibesh : Who has got the work of punishing king Jashovardhan ?

King : It has fallen to my lot.

সত্যকাম ঃ আমরা যশোবর্ধনের সমর্থনে কোন কথা শুনতে চাই না।

রাজা ঃ সর্বানন্দের প্রশ্ন তোলাটা বুদ্ধিমানের মত কাজ হয়নি। আমি জানি, রাজা দোষী, তার শাস্তি প্রাপ্য।

অগ্নিবেশ ঃ তোমাদের সবাইকে শপথ নিতে হবে। যতজন এখানে আছ ঠিক ততগুলোই তালপাতা এখানে আছে। এর মধ্যে চারটি পাতায় চারজন দোষীর নাম লেখা হয়েছে। যার ভাগে যে পাতাটি পড়বে তাকে সেই পাতার উল্লিখিত দোষীকে শাস্তি দিতে হবে

প্রথমজন ঃ আমার পাতায় কোন নাম নেই।

অগ্নিবেশ ঃ কুটবজ্রকে শাস্তির দায়িত্ব পড়েছে কবির ওপর।

দার্শনিক ঃ রতন শেঠকে শাস্তি দেওয়ার ভার আমার ওপর পড়েছে।

শিল্পী ঃ মহাচার্যকে শাস্তি দিতে হবে আমাকে।

অগ্নিবেশ ঃ যশোবর্ধনের শাস্তির দায়িত্ব কে পেয়েছে ?

রাজা ঃ এই দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে।

Page 111

Agnibesh : You are a traitor.

King : Agnibesh, I am not a traitor. I am your friend. I am awaiting to carry out your order.

Agnibesh : What your companions will do ?

King : They will also carry out your orders.

Agnibesh : Will you not imprison us ?

King : No.

Agnibesh : Will you not punish us for conspiring against you ?

King : No.

Agnibesh : Why ?

King : Because you have not done any harm to me.

অগ্নিবেশ ঃ তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক।

রাজা ঃ অগ্নিবেশ, আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমি তোমার বন্ধু। আমি তোমার আদেশ পালনের অপেক্ষায় আছি।

অগ্নিবেশ ঃ তোমার সঙ্গীরা কি করবে?

রাজা ঃ তারাও তোমার আদেশ পালন করবে।

অগ্নিবেশ ঃ তোমার সৈন্যদের কাজ কি?

রাজা ঃ এরা তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত।

অগ্নিবেশ ঃ তুমি আমাদের কারারুদ্ধ করবে না?

রাজা ঃ না।

অগ্নিবেশ ঃ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য আমাদের শাস্তি দেবে না?

রাজা ঃ না।

অগ্নিবেশ ঃ কেন?

রাজা ঃ কারণ তোমরা আমার কোন ক্ষতি করোনি।

নাটকের আপত্তিকর দৃশ্য ও সংলাপ-অংশের উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হল। ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগের দৃঢ় ধারণা ছিল নাটকটি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টির সহায়ক। সুতরাং নাট্যনিকেতনে কয়েকরাত্রি অভিনয়ের পর গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে নাটকটির অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। প্রবোধ গুহ অবশ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে নাটকের অংশ-বিশেষ তাদের মনোমত পরিবর্তন ঘটাতে রাজী আছেন ; কেননা নাটকটির প্রস্তুতি অভিনয় ও প্রযোজনার পেছনে তখন অনেক অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে। কিন্তু, গোয়েন্দা বিভাগ নাটকের পরিবর্তন ঘটাবার জন্য নাট্যকার ও প্রযোজককে যে নির্দেশগুলি দেন তাতে বর্তমান নাটকের মূল ভাব কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকেনা।

নাট্যকারের প্রকৃতি অনুসরণ করে বলা যায় এই আমূল পরিবর্তনে হয়ত তাঁর সম্মতি পাওয়া যায়নি। যদিও একসময় প্রযোজকের আর্থিক ক্ষতির দিকে তাকিয়ে রাজী হয়েছিলেন বলে এখানে জানা যাচ্ছে। কিন্তু নাটকের ব্যাপারে অপরের নির্দেশ তিনি কোনদিনই বরদাস্ত করেননি, এ ধরনের ঘটনা তাঁর নাট্যকার-জীবনে নতুন নয়। সুতরাং পেশাদারী মঞ্চে নরদেবতা নাটকাভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। পরে, 'রাজা' নাম দিয়ে পুলিশের অজ্ঞাতে নাটকটির শেষ অভিনয় হয় বর্ধমানে।

পরিশিষ্ট

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক অন্যান্য রচনাবলী ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

* জন্ম-ইং ১৮৯৩। বাং—১২৯৯, ৪ শ্রাবণ। খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রাম।
* ছাত্রদের স্বদেশী সভায় যোগদান নিষিদ্ধ করে সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ স্কুল ত্যাগ—ইং ১৯০৫।
* মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য কলকাতায় আগমন—ইং ১৯০৯।
* নাট্যকার-পূর্ব জীবনে তিনি দুইখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন—চিঠি (১৩২৮-২৯ সালে নারায়ণ পত্রিকায় 'চিঠির গুচ্ছ' নামে ও পরে পুস্তকাকারে 'চিঠি' নামে প্রকাশিত) ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১৩৩০ সালে সাপ্তাহিক বিজলী কাগজে প্রকাশিত)
* 'মরণ মহল' (অভিনব রহস্যোপন্যাস)। শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ (তারিখ অজ্ঞাত)। সম্ভবত পরবর্তীকালে রচিত।
* প্রথম সোয়া দু'ঘন্টার পূর্ণ দৈর্ঘ্য নাটক 'রক্ত কমল'—ইং ১৯২৯, বাং ১৩৩৬, ১৮ জ্যৈষ্ঠ (মনোমোহন)। নাটকটি শচীন্দ্রনাথের স্বসম্পাদিত সাপ্তাহিক 'নটরাজ' (১৩৩৩) পত্রিকায় 'রক্তের ঢেউ' নামে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত নাটক অভিনয়ের সময় নাম পরিবর্তন করা হয়।
* 'গৈরিক পতাকা'—ইং ১৯৩০, ১০ জুলাই। বাং ১৩৩৭ (মনোমোহন)। 'গৈরিক পতাকা' নাটকের পঞ্চাশৎ রজনী অভিনয়—বাং ১৩৩৭, ৫ আশ্বিন (মনোমোহন) একই নাটকের সপ্তাহে চারদিন অভিনয়ের প্রথম গৌরব বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 'গৈরিক পতাকার'ই প্রাপ্য।
* 'ঝড়ের রাতে'—ইং ১৯৩১, ১৪ নভেম্বর। বাং ১৩৩৮, ২৮ কার্তিক (নাট্য-নিকেতন)। 'ঝড়ের রাতে' নাটকে সতু সেনের আলোক ও মঞ্চ কৌশল বিস্ময় সৃষ্টি করে।
* 'সতীতীর্থ'—ইং ১৯৩২, ২০ জুন (নাট্যনিকেতন)। রোম্যান্টিক নাটক। নামকরণ করেছিলেন প্রবোধ গুহ। নাট্যকারের প্রদত্ত নাম ছিল 'কামনার আগুন'।

* 'জননী'—ইং ১৯৩৩, ২২ জুলাই। বাং ১৩৪০, ৬ শ্রাবণ (নাট্যনিকেতন)। নাট্যকার ও প্রবোধ গুহ'র মিলিত প্রচেষ্টায় মঞ্চে প্রথম ওয়াগান স্টেজ প্রবর্তন।

* 'দশের দাবী'—ইং ১৯৩৪। (নবনাট্য মন্দির, বর্তমানে স্টার থিয়েটার)। সমসাময়িক রাজনীতির উপর রচিত বাংলা নাটক। শিশিরকুমার অভিনীত ও প্রযোজিত একমাত্র রাজনৈতিক নাটক।

* 'আবুল হাসান'—ইং ১৯৩৫, ৩০ নভেম্বর (চীৎপুরের 'রূপমহল' মঞ্চ)। পরিচালক—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* 'বাংলার দুলাল' ইং ১৯৩৫ (রূপমহল মঞ্চ) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে অবলম্বন করে নাটকখানি রচিত হয়।

* 'নরদেবতা'—ইং ১৯৩৫, ১৪ ডিসেম্বর (নাট্যনিকেতন)। বই আকারে অপ্রকাশিত। দেশাত্মবোধক নাটক। ইংরেজ লেখিকা মেরী করোলির টেম্পোরাল উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'নরদেবতা' নাটকের উপর বৃটিশ শাসকের কোপ-দৃষ্টি পড়ে। ২০টি অভিনয়ের পরে ইং ১৯৩৬ সালে ৪ জানুয়ারি শেষ অভিনয়ের পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে 'রাজা' নামকরণ করে বর্ধমানে নাটকখানির শেষ অভিনয়।

* 'স্বামী স্ত্রী'—ইং ১৯৩৭, ২৪ ডিসেম্বর (রঙমহল)। বিয়র্সনের 'এ নিউলি ম্যারেড ক্যাপুল' নাটকের ভাব অবলম্বনে রচিত।

* 'প্রলয়'—ইং ১৩৩৭, ৬ জুলাই (রঙমহল) মঞ্চাভিনয়ের ৬ মাস আগে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় বেতারে। বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত হয়।

* 'কালের দাবী'—ইং ১৯৩৮, ১২ মার্চ (স্টার)। বই আকারে অপ্রকাশিত।

* 'সার্বজনীন বিবাহোৎসব' চলচ্চিত্র—ইং ১৯৩৮, ২৬ এপ্রিল (উত্তরা) কালী ফিল্মস প্রযোজিত ও সতু সেন পরিচালিত।

* 'সিরাজদ্দৌলা'—ইং ১৯৩৮, ২৮ জুন (নাট্যনিকেতন)।

* 'তটিনীর বিচার'—ইং ১৯৩৮, ২৪ ডিসেম্বর (রঙমহল)। 'তটিনীর বিচার' নাটকের শততম রজনী উদ্‌যাপন—ইং ১৯৩৯, ১১ এপ্রিল (রঙমহল)।

'সংগ্রাম ও শান্তি'—১৯৩৯, ২৪ ডিসেম্বর (নাট্যভারতী)। নাটকখানি বেতারেও অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চের

অংশ গ্রহণ করেন।

* 'পথের দাবী' উপন্যাসের নাট্যরূপ—ইং ১৯৩৯, ১৩ মে (নাট্যনিকেতন)। কয়েক রাত্রী অভিনীত হবার পর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
* 'তটিনীর বিচার' চিত্ররূপ—ইং ১৯৪০, ৪ মে (রূপবাণী) : ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড প্রযোজিত ও সুশীল মজুমদার পরিচালিত।
* 'নার্সিংহোম'—ইং ১৯৪০, ১৩ জুন (নাট্যভারতী)।
* 'হরপার্বতী'—ইং ১৯৪০, ২৪ অগাস্ট (মিনার্ভা)।
* 'ভারতবর্ষ'—ইং ১৯৪১, ৯ এপ্রিল (নাট্যনিকেতন)। প্রথম বেতার অভিনয়—ইং ১৯৪১, ৬ জুন।
* বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাট্যরূপ—ইং ১৯৪১—(মিনার্ভা)।
* 'সুপ্রিয়ার কীর্তি'—ইং ১৯৪২, ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার মিনার্ভা।
* 'কাঁটা ও কমল'—ইং ১৯৪২, ১৪ নভেম্বর (মিনার্ভা)। মোঁপাসার 'ইউজ্‌লেস বিউটি'র ভাব অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত নিজেই ছিলেন এর পরিচালক। 'কাঁটা ও কমল' দুর্গাদাস অভিনীত শেষ নাটক (মৃত্যু : ২২ জুন, ১৯৫৩)।
* শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' নাট্যরূপ—ইং ১৯৪৩, ৩ জুলাই (নাট্যভারতী, বর্তমানে গ্রেস সিনেমা)। একশত রাত্রী অভিনয়।
* 'পরশমণি'র চিত্রনাট্যরূপ—ইং ১৯৩৯। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রযোজিত। কাহিনী—যামিনী মিত্র। পরিচালনা—প্রফুল্ল রায়।
* 'স্বামী স্ত্রী' চলচ্চিত্ররূপ—ইং ১৯৪০, ২১ মার্চ (উত্তরা)। কমলা টকীজ প্রযোজিত। সতু সেন পরিচালিত।
* 'অবতার'-এর চিত্রনাট্যরূপ—ইং ১৯৪১, ১৬ অগাস্ট (শ্রী, পূরবী)। শ্রীভারত-লক্ষ্মী পিকচার্স প্রযোজিত। কাহিনী—জলধর চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।
* 'মাটির মায়া'—১৯৪৩, ২ জানুয়ারি (মিনার্ভা), শচীন সেনগুপ্ত নিজেই নাটকের পরিচালক।
* 'ধাত্রী পান্না'—ইং ১৯৪৩, ১৮ নভেম্বর (মিনার্ভা) : সতু সেনের আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থা। পরে হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত কলরব পত্রিকায় ছোটদের নাটক 'সিংহাসন' (ইং ১৯৪৬) নামে প্রকাশিত।
* 'দেবদাস' উপন্যাসের নাট্যরূপ—পুনরাভিনয়—ইং ১৯৪৪, ১১ মার্চ (মিনার্ভা)।

'নাট্যভারতী'র অভিনয়কে ম্লান করে দেয়। দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। শততম রজনী অতিক্রম করে।

* 'রাষ্ট্রবিপ্লব'—ইং ১৯৪৬ (নিউ এম্পায়ার) সতু সেনের আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থা।
* 'কালোটাকা' ইং ১৯৪৬, বড়দিন, জানুয়ারি (রঙমহল)।
* 'বাঙলার প্রতাপ'—ইং ১৯৪৭, ১৪ অগাস্ট (রঙমহল)।
* 'স্বাধীনতার সাধনা'—১৯৪৭, ১১ অক্টোবর (কালিকা, বর্তমানে কালিকা সিনেমা)।
* 'মৃত্যুহীন প্রাণ' (ছোটদের নাটিকা) আশ্বিন (১৩৫৪)—হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত ছোটদের 'দেশের মাটি' পত্রিকায় প্রকাশিত (ইং ১৯৪৭)।
* 'এই স্বাধীনতা'—১৯৪৭, ২৪ ডিসেম্বর (রঙমহল)। বঙ্গবিভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের ভারতে আগমন এবং উদ্ভূত সমস্যাবলী নিয়ে নাটকের কাহিনী রচিত। নাটকখানি যখন ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন এ নাটকের নাম ছিল 'পনেরই আগস্ট'।
* বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের নাট্যরূপ—ইং ১৯৪৯, ২৯ জুলাই (রঙমহল)। বই আকারে অপ্রকাশিত।
* বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নাট্যরূপ। অভিনয় তারিখ অজ্ঞাত। বই আকারে অপ্রকাশিত।
* 'তুষারকণা' ইং ১৯৫১, ৭ অক্টোবর (মিনার্ভা)। নাটকটি ইংরেজি 'স্নো হোয়াইট'-এর ভাবানুবাদ।
* শচীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়—ইং ১৯৫০, ২০ এপ্রিল। গৈরিক পতাকা নাট্যানুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ ৫৫৫১৲ টাকার একটি তোড়া ২২ এপ্রিল সকালের এক অনুষ্ঠানে নাট্যকারকে উপহার দেওয়া হয়।
* রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' নাট্যরূপ—ইং ১৯৫১-৫৩ (বেতারে অভিনীত)।
* 'অসুরবিজয়' (ছোটদের নাটিকা) হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত ছোটদের পত্রিকা 'তপোবন'-এ প্রকাশিত (বাং ১৩৫৯)।
* 'মাটির উপর মানুষ সত্য'—ইং ১৯৫৬, বাং ১৩৬৩। বই আকারে প্রথম প্রকাশ। নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়নি। বেতারে অভিনীত হয়।

'অন্তরাগ' একাঙ্ক নাটক—বাং ১৩৫৭। প্রথম প্রকাশ 'শারদীয়া রূপমঞ্চ'। নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়নি।

* 'রাজধানীর রাস্তায়'—একাংক নাটক অভিনীত হয়নি। তারিখ অজ্ঞাত।
* 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ—ইং ১৯৬০ (রঙমহল)।
* 'আর্তনাদ ও জয়নাদ'—ইং ১৯৬১। প্রথমে শারদীয় (১৩৬৭) 'গল্প ভারতী'তে প্রকাশিত। নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়নি। আসামে বাঙালী বিতাড়ন দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত।
* রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের নাট্যরূপ, অভিনয় তারিখ অজ্ঞাত।
* শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ (বেতারে একাধিকবার, অভিনীত), পুস্তক আকারে অপ্রকাশিত।
* নিখিল ভারত শান্তি সংসদের সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের নেতারূপে চীন ভ্রমণ—ইং ১৯৫৩।
* 'অবিস্মরণীয় চীন'—ইং ১৯৫৪, চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।
* 'মানবতার সাগর সঙ্গমে'—ইং ১৯৬০, (বাং ১৩৬৭) ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনী।
* 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা—বাং ১৩৬৪ (নাট্যআলোচনা গ্রন্থ)
* হেলসেঙ্কি ভ্রমণ (হেলসেঙ্কি বিশ্বশান্তি কংগ্রেস)। হেলসেঙ্কি থেকে ট্রেনে সোবিয়েত। লেনিনগ্রাদে ডেলিগেশনের নেতা—ইং ১৯৫৫।
* কলম্বো কনফারেন্সে পঞ্চশীল নীতির বক্তারূপে গমন—ইং ১৯৫৮।
* রুমানিয়া ভ্রমণ। স্টকহোল্মে বিশ্বশান্তি কংগ্রেস উদ্বোধনে যোগদান—ইং ১৯৫৮।

পত্রিকা সম্পাদনা : সম্পাদক রূপে—হিতবাদী (সাপ্তাহিক), বিজলী (সাপ্তাহিক), বৈকালী, আত্মশক্তি (সাপ্তাহিক), নবশক্তি। প্রধান সহযোগী সম্পাদক রূপে—ঘরে বাইরে, নটরাজ (১৩৩৩), কৃষক (দৈনিক), ভারত (দৈনিক)। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে : বঙ্গবাণী, বাতায়ন, বাঙালী, ভগ্নদূত, রূপমঞ্চ, স্বদেশ, গল্পভারতী, মঞ্চকথা, আন্তর্জাতিক, পরিচয়, আনন্দ-বাজার, যুগান্তর, বসুমতী, স্বাধীনতা, ইউনিটি, মডার্ন রিভিয়ু, ছোটদের পত্রিকা-কলরব, দেশের মাটি এবং আরো নানা পত্র-পত্রিকায়।

৫ মার্চ রবিবার, ১৯৬১, বাং ২২ ফাল্গুন, ১৩৬৭ বেলা ২টায় তাঁর ২৮/এ ভূপেন বোস এভেনিউস্থিত বাসাবাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

॥ যেসব পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি ॥

বাংলা নাটক ও নাট্যশালা	ঃ	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
মানবতার সাগর সঙ্গমে	ঃ	,,
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকাবলী (যেগুলি পাওয়া গেছে)		
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অপ্রকাশিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী।	ঃ	পাণ্ডুলিপি আকারে নাট্যকারের পুত্রদের কাছে সংরক্ষিত।
বাংলা নাটকের ইতিহাস	ঃ	ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
নাটকের কথা	ঃ	,,
নাট্যতত্ত্ব পরিচয়	ঃ	,,
বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)	ঃ	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
পুরাতন বাংলা নাটক	ঃ	সম্পাদনা—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শতবর্ষে নাট্যশালা	ঃ	সম্পাদনা—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (১ম ও ২য় খণ্ড)	ঃ	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
গিরিশচন্দ্র (গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা)	ঃ	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৩৮)
পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়)	ঃ	বিপিনবিহারী গুপ্ত
রঙ্গালয়ে ত্রিশবছর	ঃ	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা	ঃ	বিভাস রায়চৌধুরী (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৫৩)

দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য : ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র (রামানন্দ বক্তৃতা : ১৯৪৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৬ : শ্রী মাখনলাল সেন
সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত) : ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার : ,,
একাঙ্ক সঞ্চয়ন : সম্পাদনা— ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
বাংলা ঐতিহাসিক নাটক : শক্তি ভট্টাচার্য
বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা : সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
ব্রেশট ও তাঁর নাটক : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
একশ বছরের বাংলা থিয়েটার : শিশির বসু
ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক : ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়
বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা : ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
সাজঘর : ইন্দ্র মিত্র
রবিবাসর (প্রফুল্লকুমার স্মৃতিগ্রন্থ-১) : সম্পাদনা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাষণাবলী (নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ৩৭তম অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতি ও উদ্বোধকদের ভাষণ)
বাংলা নাটকের টেকনিক : ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা
অভিনয় শিক্ষা : ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ
নিজেরে হারায়ে খুঁজি (১ম ও ২য় পর্ব) : অহীন্দ্র চৌধুরী
এ ও তা : প্রভু গুহঠাকুরতা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মধু স্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
কাজীনজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা : মুজফ্ফর আহমেদ
সাম্যবাদী নজরুল : প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

কল্লোল যুগ	ঃ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	ঃ	সত্য সেন / সম্পাদনা—অমিতাভ দাশগুপ্ত
শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা	ঃ	পুলকেশ দে সরকার
শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন	ঃ	শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়
লেখকের কথা	ঃ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্তরঙ্গ চীন	ঃ	দেবব্রত বিশ্বাস
সংস্কৃতির প্রগতি	ঃ	সুধী প্রধান
বাংলা সাহিত্যে গদ্য	ঃ	শ্রী সুকুমার সেন
বিপ্লবের সন্ধানে	ঃ	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সখারাম গণেশ দেউস্কর ও ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ	ঃ	বাসুদেব মোশেল
গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী		
দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাবলী		
শরৎ রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ)		
রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩ খণ্ড) জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ		
রজনী	ঃ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যখন তারা কথা বলবে (চলন্তিকা গ্রন্থমালা)	ঃ	শিবরাম চক্রবর্তী
নবান্ন (ভূমিকা)	ঃ	বিজন ভট্টাচার্য (৪র্থ সংস্করণ, মার্চ ১৯৬২)
নতুন প্রভাত	ঃ	মনোজ বসু
সোভিয়েত নাট্যমঞ্চ (শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ভূমিকা)	ঃ	কালীশ মুখোপাধ্যায়
মা	ঃ	ম্যাকসিম গোর্কী
Lighting the stage	ঃ	P. Corry
Indian stage, Vol-VI	ঃ	Hemendranath Dasgupta
The Art of Bengali Show	ঃ	S. C. Sengupta

Shakespearian Comedy	:	H. B. Charlton
Mrs. Warren's profession (Apology)	:	Bernard Show
History of classical Sanskrit literature	:	M. Krishnamachari
Notes of a Soviet actor	:	N. Cherkasov.
Theory of stage	:	Arther Symons.
Bengali Theatre	:	Kironmoy Raha
স্বাধীনতা (দৈনিক)	:	২২ জুলাই (১৯৬২)
দৈনিক বসুমতী	:	ফাল্গুন (১৩৬৭), ১০ মার্চ (১৯৬১)
আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক)	:	৪, ৯, ২৫ জানুয়ারি (১৯৪৮) : ৬ জানুয়ারি (১৯৫০) ১৯, ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ; ১০, ৭ মার্চ (১৯৬১)
শারদীয় যুগান্তর	:	১৩৬৬
যুগান্তর (দৈনিক)	:	১৩ ও ২০ অগাস্ট (১৯৭৮)
রূপমঞ্চ	:	শ্রাবণ, ভাদ্র (১৩৮৫) সম্পাদক—কালীশ মুখোপাধ্যায়
„	:	শারদীয়া (১৩৮৫)
„	:	অষ্টাদশবর্ষ (৭ম-৮ম সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিক)
„	:	শারদীয়া (১৯৫৪)
„	:	শারদীয়া (১৩৭১)
„	:	১৬ বর্ষ (১৯৬৩)
নটরাজ (সাপ্তাহিক)	:	সম্পাদক—শচীন সেনগুপ্ত, ১ম বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা (১৩৩৩)
ধূমকেতু	:	১৯ অগ্রহায়ণ ৯ম সংখ্যা (১৩৩৮)
বঙ্গবানী	:	৫ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা

খেয়ালী	ঃ	৫ম বর্ষ ৪৯ সংখ্যা
অমৃত (সাপ্তাহিক)	ঃ	১২ নভেম্বর (১৯৭৩)
নবকল্লোল	ঃ	শ্রাবণ (১৩৮০)
শৌভনিক নাট্যোৎসব স্মারক সংখ্যা	ঃ	১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ (সাপ্তাহিক)	ঃ	নজরুল সংখ্যা (১৯৭৮)
নাট্যভারতী	ঃ	বৈশাখ (১৩৫২) এপ্রিল (১৯৪৫)
বহুরূপী	ঃ	(জয়ন্তী সংখ্যা) মে (১৯৭২)
মঞ্চকথা	ঃ	শারদীয়া (১৩৬৪)
আন্তর্জাতিক	ঃ	শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা (১৩৬৭)
Unity	ঃ	April 2-6, (1955)
Modern Review	ঃ	October ; November 1956 Editor : Kedarnath Chatterjee
তপোবন (ছোটদের পত্রিকা)	ঃ	সম্পাদক—হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৩৫৯)
কলরব (ছোটদের পত্রিকা)	ঃ	,,
দেশের মাটি (ছোটদের পত্রিকা)	ঃ	,, (১৩৫৪)
এক্ষণ	ঃ	শারদীয় সংখ্যা (১৩৭৮)
উল্টোরথ	ঃ	নভেম্বর-ডিসেম্বর (১৯৭৫)
গল্পভারতী	ঃ	শারদীয় (১৩৬৭)
সচিত্র শিশির (মাসিক)	ঃ	আষাঢ় (১৩৬৩), ১ম সংখ্যা, ৩৬শ বর্ষ, সম্পাদক—শ্রী শিশিরকুমার মিত্র, বি, এ